সাম্প্রদায়িকতা : বিধ্বস্ত স্বাধীনতা

সাম্প্রদায়িকতা : বিধ্বস্ত স্বাধীনতা

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক
অনুপকুমাব মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস
কম্পোজিট
৩৪/২, বাজেশিবপুব রোড
শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০২

মুদ্রাকর
অজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন,

অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত
শ্রদ্ধাভাজনেষু

সূচী

........রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা—'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন—

—রবীন্দ্রনাথ
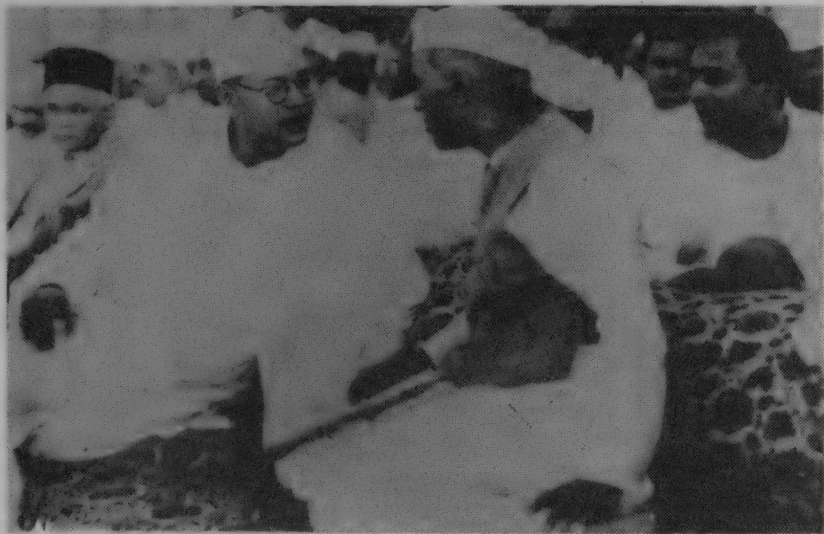
সম্মেলনের এক বিশেষ মুহূর্তে সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল নেহরু (১৯৩৯)

মিঃ জিন্না এবং গান্ধীজী (১৯৪৪)

মিঃ জিন্না এবং জহরলাল নেহরু (সিমলা, ১৯৪৬)

'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-এর শিকার (আগষ্ট, ১৯৪৬)

গান্ধীজী, জওহরলাল নেহরু (জুলাই, ১৯৪৬)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের জন্য শান্তি মিছিল (কলকাতা, ১৯৪৬)

অশান্ত পাঞ্জাব (১৯৪৭)

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঐতিহাসিক 'কনফারেন্স'-এ উপস্থিত
(বাঁ দিক থেকে) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, লর্ড ইজমে, লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, মিঃ জিন্না
(৭ই জুন, ১৯৪৭)

ভারত ভাগের আনুষ্ঠানিক সম্মতি 'মাউন্টব্যাটেনের প্ল্যান' পাশ হলো
(১৫ই জুন, ১৯৪৭)

স্বদেশী থেকে খিলাফত : সম্প্রীতির আহ্বান

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়, পরবর্তীতে ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মুনরোর কাছে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলো। সহজভাবে বলা চলে বাংলায় ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠা হলো। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার 'দেওয়ানী' লাভ করে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব দেয়ার শর্তে। এই 'দেওয়ানী'-লাভ থেকেই তাদের দৃষ্টি যায় একচেটিয়া বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় এবং তারা সে বিষয়ে সার্থক হন। কিন্তু ভারতের বৃহত্তম অংশ যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির করতলে, পলাশীর যুদ্ধের এক শতাব্দী পরে ১৮৫৭-তে এই বাংলায়-ই প্রথম ইংরেজের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বাংলার ব্যারাকপুরের সেনানিবাসে ২১শে মার্চে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী তাঁর ঊর্ধ্বতম ইংরেজ সেনাপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তাকে হত্যা করার অপরাধে ২৯শে মার্চ মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়। বিদ্রোহের সূচনা এখানে হলেও প্রকাশ্যভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ১০ই মে (১৮৫৭) মীরাটে সিপাহীরা ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে হত্যা করে দণ্ডিত সহকর্মীদের কারাগার থেকে মুক্ত করে আনে এবং এই বিদ্রোহী বাহিনী ১১ই মে দিল্লি পৌঁছায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিলেও নানা কারণে বিদ্রোহ সফল হতে পারেনি। এই বিদ্রোহকে অনেকেই ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ বলে অভিহিত করেন, কেউ কেউ মহাবিদ্রোহ হিসেবেও একে চিহ্নিত করেন, যদিও ব্রিটিশের কাছে—প্রশাসনের কাছে এটা নিছক 'সিপাহী বিদ্রোহ' ছিলো।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'ভারত সভা' (Indian Association))। বস্তুত, জনস্বার্থে আন্দোলন গড়া এবং এর মাধ্যমেই তিনি রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। এর অব্যবহিত পরেই ১৮৮৫-তে (২৭শে ডিসেম্বর) বোম্বাইতে (মুম্বাই) গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজের এক সভায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলো নানাবিধ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। ক্রমশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ উচ্চকিত হতে থাকলে এবং বাংলা এই পর্বে প্রাধান্য লাভ করলে ব্রিটিশ প্রশাসকরা চিন্তিত হয়ে ওঠেন; বাংলায় যে বিপ্লবী কার্য-কলাপও দেখা দিয়েছে। লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করতে উদ্যত হলেন, এখান থেকে যাতে কোনো সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ ভবিষ্যৎ ভারতকে আলোড়িত---আলোকিত না করে। উল্লেখ্য, এ সময়ে ভারতের রাজধানী বাংলাতে-ই, কলকাতায় ছিলো।

১৯০৫ শতাব্দে বঙ্গদেশের সমাজজীবন উথাল-পাথাল। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবী, সাধারণ মানুষ চায় ভৌগোলিক সীমারেখা নতুন করে টেনে বঙ্গদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন করা চলবে না। অভিজাতদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ ব্রিটিশের এই বঙ্গ-বিভাজনকে ধর্মীয় সংকীর্ণতায় স্বাগত জানাল, বিশেষ ঘটনা হলো ১৮৫৭-তে

যে হিন্দু-মুসলিম মিলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রক্ত দিয়েছিল তার একটি অংশ থাকলো নিশ্চুপ, মৌন। কিন্তু সৌভাগ্য হলো 'হিন্দু-মুসলমান'-এর উর্ধ্বে উঠে অধিকাংশ মানুষই এই বিশ্বাসে এগিয়ে এলেন, বঙ্গদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি কখনো বিভাজ্য হতে পারে না। ব্রিটিশ শাসকবর্গ এদেশে নতুন করে ইন্ধন জোগালো, হিন্দুত্বের নামাবলীতে এগিয়ে এলো কিছু কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি মুসলমান প্রধান ঢাকার উন্নতির কথা বলে ব্রিটিশের দলে ভিড়লেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ আমলারা সুতোর অদৃশ্য টানে নাচিয়ে তুললো বঙ্গবাসীদের একাংশ। আশ্চর্য, তারা নাচলো গাইলো, কেউ অধিকার রক্ষায়, কেউ-বা নিজ সম্প্রদায়ের অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে। কিন্তু সেদিনের ঘটনার ইতিবৃত্ত আজ প্রকাশিত।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকারের প্রথম পদক্ষেপ নয়, ১৮৫৩-তে স্যার চার্লস্ গ্রান্ট অনুরূপ প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটালেও সেটা প্রচেষ্টা মাত্র ছিলো, বাস্তব কোনো উদ্যোগ তিনি নিতে পারেননি। ১৯০৫-এ লর্ড কার্জন উদ্যোগ নিলেন এবং বাস্তব রূপ দিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই দুই খলনায়ক, স্যার চার্লস্ গ্রান্ট ও লর্ড কার্জনের—বিশেষত লর্ড কার্জনের বড়লাট হিসেবে ভারতে অবস্থানের সময় আলোচনা করলে আমাদের সামনে কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, অবশ্য এই প্রশ্নগুলির উত্তর লাভ আজ আর কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

স্যার চার্লস গ্রান্টের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার প্রধানতম কারণ ছিলো জনগণের সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন, কেন না সিপাহী বিদ্রোহ তথা ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য তিনি পূর্বেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন এই বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটবে বঙ্গদেশ থেকেই, কেননা বাংলা-বিহার-ওড়িশার শাসন ক্ষমতা যে দীর্ঘদিন ধরেই বঙ্গদেশ থেকে পরিচালিত হতো। অতএব, বঙ্গদেশকে ভেঙ্গে শক্তিকে বহুধা-বিভক্ত করাই ছিল তাঁর পরিকল্পনা, কিন্তু এই পরিকল্পনাকে তিনি বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি। লর্ড কার্জনের কর্মপদ্ধতির মুখ্য বিষয় নিহিত ছিলো উপনিবেশের উপরে ব্রিটিশ সরকারের কর্তৃত্ব আরো দৃঢ় করা, স্থায়ী রূপ দেয়া। লর্ড কার্জন তাঁর ভাবনাগুলোকে বাস্তবসম্মত রূপ দিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বেছে নিলেন এদেশের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতিকে। তিনি বঙ্গ -বিভাজনের কারণ হিসাবে প্রকাশ্যে যা-ই বলুন না কেন, বঙ্গ-বিভাজনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সামনে তুলে আনেন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, সমাজে এই দুই সম্প্রদায়ের অবস্থানকে। হিন্দু-মুসলমানের সহ-অবস্থান মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সমাজজীবন-আর্থ সামাজিক অবস্থার উপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) পূর্ব পর্যন্ত মোঘল আমলের মতোই বাংলা-বিহার-ওড়িশা একটি প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতো, অসমও একসময়ে এই প্রদেশের অন্তর্গত ছিলো, ১৮৭৪-এ অসমকে বাংলা থেকে পৃথক করা হয়। অবশ্য এর পূর্বেই ১৮৬২-তে বঙ্গদেশে আইনসভা গঠন করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকাতে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে মিঃ লিঙ্কন ক্রীতদাসদের মুক্তি দেন এবং গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, চেতনার বিকাশ সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য উপস্থিত করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হয় (১৮৬৬)। উল্লেখ্য, মিঃ লিঙ্কনের বক্তব্য এবং 'ডাস ক্যাপিটালের' প্রভাব তৎকালীন ছাত্র-যুবাদের মধ্যে কম-বেশী প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ছাত্র-যুবারা এসময়ে দেশ ও সমাজ

সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই সময় পৃথিবীর দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উপেক্ষা করতে, ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্তির আশায় যেসব আন্দোলন ক্রমবর্ধমান ছিলো তার সংবাদ ভারতে পৌঁছতে লাগলো ; এখানের ছাত্র-যুবারা উৎসাহিত হয়ে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে গঠন করলো, 'স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন'। এই সংগঠনের পুরোভাগে থাকেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ লক্ষণীয়। স্বাধিকার ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলো।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম (সিপাহী বিদ্রোহ নামে খ্যাত) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে মুসলিম সম্প্রদায়ের আশু কর্তব্য কি, ব্যক্তি কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করতে কি করণীয় সেই বিষয়ে নবাব আব্দুল লতিফ ভাবেন। তিনি শিক্ষা প্রসারে পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, বিশেষত অনগ্রসর মুসলমানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কেন না ইতিমধ্যে মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ, বিশেষত হিন্দু (বর্ণহিন্দু) ধর্মাবলম্বীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। নবাব আব্দুল লতিফের মতোই স্যার সৈয়দ আহমদ খান অনুভব করেন যে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু সম্প্রদায়, বিশেষত বর্ণহিন্দুরা চাকুরীর ক্ষেত্রে, ব্যবসায় ব্রিটিশ শাসকবর্গের বেশী সান্নিধ্য লাভ করেছে। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে আলিগড়ে এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন, পরবর্তীকালে এই কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর উদ্যোগেই 'ইউনাইটেড পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। অবশ্য ইতিপূর্বেই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে নিজস্ব মতামত এই বলে ব্যক্ত করেন যে, বর্তমানে কংগ্রেসে তাদের যোগদান উচিত হবে না যতক্ষণ না পাশ্চাত্য শিক্ষায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সমকক্ষতা লাভ না ঘটে ; তাঁর এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাকে অনেকেই 'আলিগড় আন্দোলন' নামে অভিহিত করে থাকেন। বস্তুত ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর উদ্দেশ্যও ছিলো পাশ্চাত্য শিক্ষায় মুসলমানদের উন্নীত করা এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের চিন্তা-চেতনাকে আমরা এভাবে দেখতে পাই :

> ঊনবিংশ শতাব্দী সম্পর্কে অধ্যাপক রাজ্জাকের একটা অভিমত এই যে, ১৮৫৭-এর পরে ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে তাদের সমস্ত ক্ষেত্র দিয়ে বাদ দিয়ে দিল আর সে কারণেই মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ল, একথা ঠিক নয়। তাঁর মতে গত শতকের গোড়াতে, এমন কি শেষের দিকেও ইংরেজ কোম্পানি ও সরকারের দপ্তরে মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল না। এই অভিমতের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ১৮১৪ সালে কোলকাতার উকিলদের যে তালিকা আমরা দেখি তাতে দেখা যায় ১৬ জন উকিলের মধ্যে ১৪ জন মুসলমান। ১৮৬৫ সালেও ৫০ শতাংশ উকিল মুসলমান। কিন্তু তারপর থেকে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া শুরু হলো। এর প্রধান কারণ, ইংরেজী শিক্ষার

দিকে এই শিক্ষিত মুসলমানবা একেবারেই ঝুকলো না। ......কেন এই শিক্ষিতদের বংশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি শিক্ষায় এল না। একটা কারণ বলা যায়, শিক্ষা খুব খরচের ব্যাপার ছিল, দ্যাট এডুকেশন ওয়াজ কষ্টলি। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না।[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শেষ দশক পর্যন্ত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ের পিছিয়ে পড়ার নানা কারণের মধ্যে শিক্ষার ব্যয়ভার অন্যতম প্রধান কারণ হলেও পাশাপাশি ফারসী ভাষার ক্রমাগত বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বর্ণহিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে যখন অগ্রণীর ভূমিকায় তখনও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মুখ্য অংশ আরবি ও ফারসীর মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। ফলশ্রুতি, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বাস্তবমুখী গুণে প্রভেদ প্রকট হয়ে ওঠে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে থাকে মুসলিম সম্প্রদায়। মুসলিম ছাত্র যদি-বা ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, কিন্তু সেখানে অসম প্রতিযোগিতায় খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রই শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর পরে এটোয়ার মহসীন উল্ মূল্‌ক নওয়াব সৈয়দ মেহেদী আলী আলিগড় আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বিচক্ষণ ব্যক্তি অচিরেই বুঝতে পারেন শিক্ষিত মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেয়া বন্ধ করা যাবে না, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করেন। কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে তিনি মহমেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে যোগ দিতে আহ্বান জানান; তাঁর এই বুদ্ধিমত্তা ফলপ্রসূ হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব বদরুদ্দীন তায়েবজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের সভাপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ কবেন এবং তায়েবজীকে সম্মত করান। এর ফলেই কংগ্রেসের অনেক মুসলমান নেতৃত্ব কনফারেন্সে আসেন, কনফারেন্স ও কংগ্রেসের দূরত্ব দূর হতে থাকে।

এই সময়ে বঙ্গদেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ গোপনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে উৎসাহ দেন এবং অলক্ষ্যে থেকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শাখা-কেন্দ্র তৈরী করতে সাহায্য করেন। অবশ্য শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্রকে বঙ্গদেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বিপ্লবী চেতনার পথিকৃৎ বলে অভিহিত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বঙ্গদেশ জুড়ে কোথাও দলবদ্ধ কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে এই আন্দোলনেব সূচনা ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

অধ্যাপক জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে একটি নিবন্ধে[২] ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দকে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, ১৯০৫কে তিনি আলোচনায় এনেও গুরুত্ব দিতে চাননি। ভারতীয় অনেক ঐতিহাসিক ও সমালোচক ১৯০৫ সালটি বঙ্গদেশের রাজনীতিতে নতুনত্ব, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে স্বাধীনতার উন্মেষ-প্রয়াস বছর হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন; কোন প্রকারেই তাঁদের সে চিন্তা-ভাবনাকে অযৌক্তিক বলা চলে না।

বিংশ শতাব্দীব শুরু ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বঙ্গদেশে তখনও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ভাল, তারা সাম্প্রদায়িক বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলছে। গত দু'তিন দশকে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশে যে-ধরনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সংঘর্ষ একাধিকবার ঘটেছে তাব তুলনামূলক বিচারে বঙ্গদেশ ছিল সাম্প্রদায়িক

সৌজন্যের বাতাবরণ। কিন্তু ১৯০৩-এ বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ঘোষণায় সেই সাম্প্রদায়িক সৌহার্দে চির ধরে।

ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব ১৯০৩-এ ঘোষণা করলে বঙ্গদেশের বুদ্ধিজীবী মহলের একটা বৃহত্তর অংশ-বিশেষভাবে হিন্দুরা এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণী, বিশেষত উচ্চবর্ণ এবং জমিদার শ্রেণীর মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। এই আন্দোলনের সূচনাপর্বে কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় অংশ না নিলেও অল্প দিনের মধ্যে চাতুর্যের সঙ্গে তারা আসরে নামে। লর্ড কার্জনের প্রস্তাবটিতে ছিলো পূর্ব বাংলা এবং অসমকে নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন এবং এই নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী ঢাকাতে হওয়ার কথা। লর্ড কার্জন প্রস্তাবটি ঘোষণা করেই বুঝতে পারেন খুব সহজেই এ-দেশীয় সম্ভ্রান্ত এবং জমিদার শ্রেণী এটাকে মেনে নিতে চাইবে না। ১৯০৪ [illegible] সেখানে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি উপস্থিত করে বক্তব্য রাখেন। তিনি ব্রিটিশ শাসন বা উপনিবেশে ব্রিটিশের কর্তৃত্ব বা সর্দারি দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে সচতুরভাবে যে পরিকল্পনা এবং প্রক্রিয়া শুরু করলেন তাব ফলেই ঢাকা তথা বঙ্গদেশের জনজীবনে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্বমূলক সহবস্থানে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সূত্রপাত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনের আশায় লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের প্রথম দিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে সরকাবী ভ্রমণে যান, প্রতিটি স্থানেই তিনি মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে প্রকাশ্যে এগিয়ে আসতে বলেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়েব অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারেব আহ্বান থাকে, ঢাকা মোঘল আমলের ঐতিহ্য ফিরে পাবে এ আশাও তিনি ব্যক্ত করেন। লর্ড কার্জনের ঢাকা সফর এবং সেখানে মুসলিম নেতৃত্বের কাছে ঢাকাব অতীত গৌরবের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা, ঢাকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উক্তি একটা বিষয়কে স্পষ্টই প্রমাণ করে যে, বঙ্গদেশের বুদ্ধিজীবী, জমিদার শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিশেষ করে বর্ণহিন্দুরা বঙ্গভঙ্গকে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেবে না সে বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন। অতএব, লর্ড কার্জনের কাছে বিচার্য বিষয় ছিল জনসংখ্যার আনুপাতিক হার, সংখ্যাগুরুর অনুমোদনের প্রত্যাশা, তাই তাঁর সফর এবং প্রতিশ্রুতি প্রকৃতপক্ষে অতি সূক্ষ্মভাবে ইংরেজি শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমানদের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। এবং নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে তিনি হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক চেতনাকে উসকে দিয়ে বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমানের বিপ্লবী যৌথ আন্দোলনকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে আন্দোলনকে পঙ্গু করা এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে দীর্ঘস্থায়ী করার পরিকল্পনা করেন। এ বিষয়ে ঢাকাতে তাঁর প্রধান সহায় হয়ে ওঠেন নবাব সলিমুল্লাহ্।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেব ১৬ই অক্টোবর থেকে 'পূর্ব বাংলা ও অসম' নিয়ে সরকারী ঘোষণাতে নতুন প্রদেশ গঠিত হলে ঢাকা হয় নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী। ভারত সবকারের তরফ থেকে দায়িত্বে আসেন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর স্যার ব্যামফুল্ড ফুলার। তিনি ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হন ; হিন্দু-মুসলিমেব মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করাব লক্ষ্যে মুসলিম জমিদার শ্রেণীকে তোষণ করতে শুরু করেন।

লর্ড কার্জন এবং স্যার ফুলার সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিব ক্ষেত্রে যদিও পূর্ববঙ্গে প্রচেষ্টা চালান, তবে তা সর্বত্র সমভাবে সার্থক হয়ে ওঠেনি ; এমন কি ঢাকাতে সমভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করেনি। এলিট মুসলমানদের একটি অংশ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন। বঙ্গভঙ্গের প্রথম বার্ষিকীতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের ঢাকার সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নবাব সলিমুল্লাহ্‌র আত্মীয় খাজা মুহাম্মদ আরজু। উল্লেখ্য, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র ভাই নবাব আতিকুল্লাহ্‌ কলকাতা কংগ্রেসে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, অনেকে অবশ্য নবাব পরিবারের পারিবারিক কলহকে নবাব আতিকুল্লাহ্‌র এই ভূমিকার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, নবাব সলিমুল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত প্রভাবে বঙ্গদেশের ঢাকাতে মুসলমানদের আশরাফ শ্রেণী, উচ্চবিত্ত জমিদার শ্রেণী বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা চালান। কার্যত, পূর্ব বাংলাতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের তুলনায় বঙ্গভঙ্গের পক্ষে জোরদার প্রচারাভিযান চলে।

যদিও বঙ্গভঙ্গের নেপথ্যে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী বাজনীতি খুব সূক্ষ্মভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে বঙ্গদেশে উপহার দিয়েছিল যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশের সরকারী নীতি ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে আমরা দেখতে পাই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কী ফল ফলবে তা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা এক স্বচ্ছ ধারণা নিয়ে পরিকল্পিতভাবেই সরকারী কর্মপদ্ধতিতে এভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে। তারা আন্দোলনমুখী কংগ্রেসে মুসলমানেরা যাতে অংশগ্রহণ না করে তার জন্য পূর্ববাংলাকে একটি ভৌগোলিক অবস্থানে বেঁধে রাখতে নতুন প্রদেশ এবং রাজধানীর স্বীকৃতি দিলেও কংগ্রেসে মুসলমানদের সদস্যপদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যদিও মুসলমানদের কংগ্রেসে অংশগ্রহণ বিষয়ে ১৯০৬-এর অক্টোবরে স্যার থিওডোর মরিসন (১৯০৫ পর্যন্ত আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ), স্যার ডেনজিল ইবেটসন (পাঞ্জাবের লেঃ গভর্ণর) এবং লর্ড ল্যামিংটন (বোম্বের গভর্ণর) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ লর্ড মিন্টোকে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে কংগ্রেসে হিন্দুর প্রাধান্য এবং সেখানে মুসলমানদের ব্যাপক অংশগ্রহণ হলে ভবিষ্যতে প্রশাসনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের একটি বাস্তব দিক ছিলো। একজন লেঃ গভর্ণরের অধীনে বাংলা, বিহার, ওড়িশা একটি প্রদেশ হিসেবে শাসনে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়; বিশেষত এই প্রদেশের আয়তন যখন ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল। বঙ্গভঙ্গের ফলে যে নুতন প্রদেশ গঠিত হলো তার আয়তন ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩ কোটি ২০ লক্ষ হলেও মুসলমানদের সংখ্যার হার ৪০%। ঢাকা রাজধানী হলে বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসমের উৎপন্ন দ্রব্য কলকাতা না এনে স্বল্প সময়ে এবং ব্যয়ে ঢাকা, চট্টগ্রামকে ব্যবহার করা সম্ভব। সরকারী বক্তব্যের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য; কিন্তু লর্ড কার্জন সিদ্ধান্তকে যে কোনো অবস্থায়ই প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন বলে বঙ্গদেশের অভিজাত শ্রেণীর বৃহত্তর অংশের প্রতিরোধ-আন্দোলনের মুখে পড়েন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই যাঁরা প্রথমে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক পরে তাঁরা ব্রিটিশ শাসকবর্গের কর্মসূচীর ফলে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, পক্ষান্তরে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধবাদীরা—

> বাঙ্গালী জাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, আচার ও প্রথা—এসবের দোহাই দিয়ে তাবা যে আবেদন করল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালী

জনসাধারণের কাছে তার প্রচণ্ড প্রভাব শুধুমাত্র যে হিন্দু সম্প্রদায়কেই অভিভূত করল তা নয়, মুসলমানদেরও সহানুভূতি লাভ করল।[১]

মুসলমানদের জন্য গঠিত 'ইউনাইটেড পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' এবং 'মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটি' মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা—পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা চালালেও ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মনে হয়েছিল যে, আলিগড়ের কলেজই যথেষ্ট নয়, মুসলমান জনসংখ্যার তুলনায় এ খুবই সামান্য আয়োজন। স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মৃত্যুর সময় (১৮৯৮) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহ এবং অযোধ্যার প্রশাসক ছিলেন স্যার এ্যান্টনী ম্যাকডনেল; তিনি হিন্দুদের দাবী মেনে নিয়ে সরকারী কাজে উর্দুর পাশেই স্থান দেন হিন্দী ভাষাকে। লক্ষ্ণৌ এবং আলিগড়ে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ধনীক শ্রেণীর মুসলমানেরা, কিন্তু স্যার ম্যাকডনেলের হুমকির কাছে তাদের নীরব হতে হয় বাধ্য হয়েই। অবশ্য এই শ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যাও কম ছিল, কেন না আলিগড় কলেজ তো ছিল চাহিদার তুলনায় খুবই ছোট প্রতিষ্ঠান। বস্তুত মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকার্য হয়ে ওঠে যে শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিত, কেন না মাদ্রাসা, মক্তব বর্তমানের দাবী পূরণ করতে সক্ষম হবে না। এই সময়ে :

> হিন্দু বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ধ্যান ধারণায় অনুপ্রাণিত ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে সমানাধিকার এবং প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে মুখর হতে থাকেন। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বীজ বপন করে তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করার জন্য বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানতঃ বাঙ্গালী হিন্দু এবং প্রথম দিকে কিছু মুসলমান নেতাও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।[১]

কিন্তু মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর এক্ষেত্রে অবস্থান দৃঢ় হতে পারে না, সরকারী আচরণের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের পেশাগত বৈষম্য আরো বেআব্রু হয়ে দেখা দেয়।

> বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের নিয়োগের সরকারী প্রচেষ্টা আরো জোরদার হচ্ছিল। ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ফুলার নতুন প্রশাসনিক পদগুলির জন্য যোগ্য প্রার্থী খুঁজে বের করার জন্য স্থানীয় মুসলমান সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করতে সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরা যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান প্রার্থী সংগ্রহে ব্যর্থ হলে তিনি মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কোটা নির্ধারণের এবং সেই কোটা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শূন্য পদগুলি মুসলমানদের দ্বারা পূরণের জন্য সুপারিশ করেন। . . .. কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায়ের বক্তব্য ছিল, এই সুপারিশ কার্যকরী হলে তারা শত শত আকাঙ্খিত চাকুরি হারাবে এবং বেকারত্বের অভিশাপে ভুগবে।[২]

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। তাই বঙ্গভঙ্গকে উত্তপ্ত করেছিল যে অসহযোগ আন্দোলন সেখানেও দেখা যায় পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব, মুসলমান সম্প্রদায়ের খুব সামান্যই এখানে অংশ-গ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন, বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পরে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কমন্স সভাতে এ দেশের প্রতিটি প্রদেশ থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়; যে প্রতিনিধিবৃন্দ অবশ্যই স্ব স্ব প্রদেশ থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এতদ্ব্যতীত

বড়লাটের শাসন পরিষদে এদেশীয় শাসন ব্যবস্থার সংস্কার হিসেবে ভারতবাসীর অংশগ্রহণের দাবী ওঠে। ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ এই দাবীকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি, যদিও তাদের নিজেদের মধ্যে এই প্রতিনিধি নির্বাচন ও পদ্ধতি নিয়ে দ্বিমত ছিলো। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা করে স্বাধিকারের প্রশ্নে ভারতবাসীর দাবী-দাওয়া চাপা দিতে ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু এই শেষ নয়, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকলে ব্রিটিশ সরকারকে অবশ্যই স্বাধিকারের প্রশ্নে আপস মীমাংসায় আসতে হতো এবং কমন্স সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধির স্থান দিতে হতো। এই দুটি দাবী কোনটিই সহজভাবে গ্রহণ করা লর্ড কার্জনের পক্ষে সম্ভব ছিলো না; শেষোক্ত দাবীটি যদি-বা গ্রহণ করা যেতো কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জয়ী প্রতিনিধি কমন্স সভার সদস্য হলে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ শাসনের হালচাল খোদ ব্রিটিশ জনগণই জেনে যেতো ; যা লর্ড কার্জন সহ অন্যান্য শাসকবর্গেব অভিপ্রেত ছিলো না। কিন্তু দেশ শাসনে তাদের প্রয়োজন ছিলো মুসলমানদের সহযোগিতা, যা সহজভাবে পাওয়ার কোন পন্থা তাদের জানা ছিলো না। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বিদেশীরা উপনিবেশ স্থাপন করে শাসন ও শোষণ রেখেছিলো অব্যাহত। আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কোতে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতোই একটার পর একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে এবং বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়েছে ঔপনিবেশবাদের হিংস্রতার কাছে। সিরিয়া, লেবানন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে লীগ অব নেশন্স থেকে অছি লাভ করে, অটোমান সাম্রাজ্যের পতনে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা আরো দৃঢ় হয়—অধিক পরিমাণে সুযোগ গ্রহণে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ১৮৮২তে মিশর ব্রিটেনের করতলে, সুদানের উপর কর্তৃত্ব দৃঢ় করতে প্রত্যয়ী হযে ওঠে তারা, ১৯১১ পর্যন্ত ইতালি লিবিয়ার উপর যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ চালায় তা মুসলিম বিশ্বকে ক্ষমতাহীন প্রতিবাদী করে তোলে। ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ দিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের মান ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়; এই সময় যদিও মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষায় এবং সরকারের অনুগ্রহে অনেক ক্ষেত্রেই তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দ্বারে পৌঁছায়—দুঃখের হলেও সত্য, সেই শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। মুসলিমবিশ্ব যখন ঔপনিবেশবাদের শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট তখন বঙ্গদেশে তথা ভারতে লর্ড কার্জনেরা বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বন্ধুত্বের আলখেল্লা পরে!

> মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতি তদানীন্তন পীঠস্থল আলিগড় কলেজের সম্পাদক নবাব মহসীন-উল-মুল্ককে কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড ভারত সরকারের গ্রীষ্মাবাস সিমলায় গভর্ণর জেনারেলের একান্ত সচিব কর্ণেল ডানলপ স্মিথ ও আরও কয়েকজন বড়লাটের পার্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট একটি চিঠি লেখেন। সে পত্রে এই পরামর্শ দেওয়া হয় যে তিনি যেন অবিলম্বে বড়লাটেব কাছে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিমণ্ডল পাঠাবার ব্যবস্থা করেন যাঁরা তাঁকে একটি স্মারকপত্র দেবেন। কেমন ভাষা ভঙ্গীতে আবেদন পত্র লিখতে হবে এবং তার বক্তব্য কি হবে সে সবই আর্চবোল্ড ছকে দিয়েছিলেন ও এও জানিয়েছিলেন যে যবনিকাব অন্তবাল থেকে তিনি এ ব্যাপারে সব রকমের সাহায্য কবতে প্রস্তুত। তদনুসারে নবাব মহসীন-উল-মুল্কেব উদ্যোগে ও আগা

> খাঁর নেতৃত্বে ৭০ জনের একটি প্রতিনিধি দল ১লা অক্টোবর বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন। কীভাবে ঐদিন সেই প্রতিনিধিমণ্ডলের দ্বারা মুসলমানের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিমূলক স্বায়ত্তশাসনের বদলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে মনোনীত প্রতিনিধিদের স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বড়লাট মিন্টো : 'কংগ্রেসী আন্দোলনকারীদের প্রভাব থেকে ৬ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমানদের পৃথক করে দেন এবং ব্যাপারটি যে লেডি মিন্টোর মতে 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা', এ কথা তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[৬]

সঙ্গত কারণেই একটি প্রশ্ন ওঠে, আলিগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড নবাব মহসীন-উল-মুল্ককে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা কেবলমাত্র আর্চবোল্ডেরই চিন্তা-প্রসূত কি? হঠাৎ করেই বা আর্চবোল্ড এই ধরনের চিঠি লিখতে গেলেন কেন? নাকি এর পিছনে ভারত সবকারের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিলো? ভারতের গভর্ণর জেনারেল পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন কি? আগা খাঁ-এর নেতৃত্বে যে ৭০ জন মুসলিম নেতৃত্ব আর্চবোল্ডের পরিকল্পিত দাবী-দাওয়া সংবলিত স্মারকপত্র লর্ড মিন্টোর কাছে দেন ঐ দাবী-দাওয়ার মৌখিক স্বীকৃতি তাঁরা সেখানেই প্রাথমিক অবস্থায় পান, পরে লিখিতরূপে আসে। প্রতিনিধি দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেননি যে ভারত সরকার অনায়াসেই এই সমস্ত দাবীসনদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন এবং দাবীনামা পূরণে তৎপর হবেন।

একদিকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গের বিরোধীদের সমর্থনে ও ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নীতির প্রতিবাদে অসহযোগ-স্বদেশী আন্দোলন, অন্যদিকে মুসলমান নেতৃত্ব লর্ড মিন্টোর থেকে দাবী পূরণের অঙ্গীকারে নতুন করে উজ্জীবিত। সাময়িকভাবে হলেও রোমান সাম্রাজ্যবাদীদের 'ভেদনীতি'কে আশ্রয় করে ভারতে ইংরেজ শাসকেরা সর্বপ্রকার আন্দোলনকে গতিহীন করার প্রয়াসে সফল হয়েছিলেন।

লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই মুসলিম নেতৃত্ব নিজেদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন এবং উপলব্ধি করেন জাতীয় কংগ্রেসের মতোই মুসলিমদের নিজস্ব একটি রাজনৈতিক সংগঠন থাকা আবশ্যিক। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব সলিমুল্লাহ্ সহকর্মীদের সঙ্গে একমত হন যে মুসলমান জনগণের শিক্ষা, চাকুরি, সর্বোপরি অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন গড়া আশু প্রয়োজন। অবশ্য একথা স্বীকার্য, ভারতবর্ষে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান একান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো বর্ণ-হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে তারা বঙ্গভঙ্গ ও অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলাতে স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ রদের কর্মিবৃন্দ ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের নেতৃবৃন্দ হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। রফিকুল ইসলাম তাঁর 'বাংলাদেশেব স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে বলেন :

> ১৯০৬ সালে কোলকাতায় 'শিবাজী উৎসব'-এর আয়োজন করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই উৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল 'ভবানী পূজা'। শিবাজী উৎসব ও ভবানী পূজা উপলক্ষে মহারাষ্ট্র থেকে তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জেকে কোলকাতায় আনা হয়। লোকমান্য তিলক এই উৎসবের উদ্বোধন কবেন। তিলক একদিন ত্রিশ হাজার লোক নিয়ে গঙ্গাস্নানে যান, সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিল একখানি ভারত-মাতার ছবি। বস্তুত এই আন্দোলনের নেতা

তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধবদের জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক হিন্দুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই পথ বঙ্কিম প্রদর্শিত ও অনুপ্রাণিত, অরবিন্দ ও তাব দলের জাতীয়তার মূলে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভাবনাই ছিল প্রধান। তাই 'বঙ্গভঙ্গ' ও 'স্বদেশী আন্দোলন', 'শিবাজী উৎসব' বা 'ভবানী পূজার' রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এই কারণেই বাংলার মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন রূপে গ্রহণ করতে পারেনি, এই আন্দোলন ধর্ম নিরপেক্ষ থাকলে এ দেশের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতে পাবত।'

রফিকুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিকতা হিসাবে যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার প্রাধান্য আছে, তবে অনেকগুলি কারণের সে একটিমাত্র। বস্তুত সাধারণ মুসলমানেরা বঙ্গ-ভঙ্গের পক্ষে বা বিপক্ষে কোথাও সক্রিয়ভাবে যোগদান করেনি, মুসলিম লীগের সঙ্গে ধর্মীয় সম্পর্ক এবং স্বাজাত্যবোধই তাদের অংশগ্রহণের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবরে বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে মুসলিম নেতৃবৃন্দের সার্থক সাক্ষাতে যথারীতি নেতৃবৃন্দ উল্লসিত হন, এর ফলশ্রুতি হিসেবে জোটবদ্ধ মুসলিম নেতৃত্ব ডিসেম্বরের ৩০-৩১ মুসলমানদের এক সর্বভারতীয় সভা আহ্বান করে। ঐ সভাতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাবাহী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। স্মর্তব্য এই বছরই হিন্দু মহাসভার সৃষ্টি। অর্থাৎ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভিত্তিতে একই বছরে হিন্দু-মুসলমানের দু'টি পৃথক সংগঠন গঠিত হলো। পরবর্তীকালে, পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাসে এই সংগঠন দুটির গুরুত্ব ও ভূমিকা আমরা দেখতে পাবো। বঙ্গভঙ্গ এবং মুসলিম লীগের সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে বলতে হয়, বঙ্গদেশের সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্য কংগ্রেস, স্বদেশী আন্দোলনকারীরা ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে নিজেদের আলোকিত করার প্রয়াসে তৎপর ছিলেন, কিন্তু দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনতান্ত্রিক স্থায়িত্বের কারণে তাদের রাজনৈতিক কূট-কৌশল বিশ্লেষণ শেষে দেশের সার্বিক কল্যাণে কেউ-ই এগিয়ে আসতে পারেননি। সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উর্ধ্বে যদি-বা রবীন্দ্রনাথের মতো দু'একজন উঠে এলেন কিন্তু তাঁরা কি ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভাঙ্গতে পারলেন? অনেক ক্ষেত্রে এই কয়েকজনের মধ্যে সে স্ব-বিরোধিতা ছিলো না তা নয়, তবে তৎকালীন সমাজে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা, স্থানীয় সামন্তপ্রভুদের ধনীক গোষ্ঠীর নেতৃত্ব ও শোষণের প্রশ্নে শ্রেণী চেতনার কোনো স্বচ্ছ বক্তব্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হননি ; অংশগ্রহণকাবীরা প্রত্যেকেই তাঁদেব প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন জাতীয়তাবোধ (যা কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে) ও আবেগ।

বঙ্গদেশ তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দ নানা কারণেই গুরুত্ব বহন করে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন একই অর্থবহ হয়ে বঙ্গদেশে প্রচারিত হতে থাকলে নবগঠিত মুসলিম লীগ পূর্ববঙ্গে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে নিজ পরিচয়, প্রতিষ্ঠালাভে তৎপর হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগের পক্ষে নবাব সলিমুল্লাহ্ এবং তাঁর সঙ্গীদের এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক ; অবশ্য পবিত্র কর্তব্য , বঙ্গ বিভাজনের বিরোধীরাও অখণ্ড বঙ্গের দাবীতে তৎপর। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের সরকার মুসলিম লীগকে পেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়ীত্ব হেতু হিন্দু-মুসলিমের এই পরস্পর বিরুদ্ধ মনোভাবকে ব্যবহার করতে উদ্‌গ্রীব হয়। মিঃ ফুলার মৌলবাদকে চাঙ্গা করে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ঘটিয়ে

নিজেদের স্বার্থের মহৎ কর্মটি সম্পন্ন করেন এবং মুসলমান জনগণের মধ্যে এই বিশ্বাস গড়ে তোলায় সচেষ্ট হন যে, নবগঠিত প্রদেশে ব্রিটিশ শাসকবর্গ মুসলমানদের পক্ষে, প্রাদেশিক গভর্ণব থেকে ভাইসরয় মিন্টো পর্যন্ত নবাব সলিমুল্লাহ্‌র সঙ্গে। স্বদেশী আন্দোলনকারীরাও এই সময়ে প্রাক্তন প্রাদেশিক গভর্ণর স্যার ফুলারের মুসলিম সৌজন্য ও পক্ষপাতদুষ্ট প্ররোচনামূলক বক্তব্যকে সামনে এনে বঙ্গ বিভাজনের সব দোষ মুসলিম নেতৃত্বেব উপব চাপায়। মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, এবং স্বদেশী আন্দোলনকারীদের কর্মপদ্ধতি থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী একটি প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর কলকাতার ছাত্ররা 'এন্টি সার্কুলার সোসাইটি' গঠন করে যা ঊর্ধ্বমুখী সাম্প্রদায়িক সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে অ-সাম্প্রদায়িক সমাজ বিন্যাসের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে ছাত্র-যুবকদের আহ্বান জানায়।[৮]

'এন্টি সার্কুলার সোসাইটি'-এর কর্মপ্রয়াস ছিল সত্যি বিস্ময়কর। কিন্তু সে বৃহত্তর পটভূমি গঠন করতে পারেনি যাতে 'যুযুধান দুই ধর্মাবলম্বী'দের মধ্যে সেতু বন্ধনের মহান কর্মটি সমাধা করতে পারে। কয়েকটি পত্রিকাও দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে পক্ষাবলম্বনে পরিবেশকে অধিকতর কালিমালিপ্ত করে তোলে ; 'ছোলতান', 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকাদ্বয়ের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯০৬-এর ঢাকা সম্মেলনে 'লাল ইশ্‌তেহার' নামে একটি পুস্তিকা উগ্র সাম্প্রদায়িক বক্তব্যে হিন্দুদের আক্রমণ করে। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের বরিশালে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনেও এই পুস্তিকাখানি প্রচারিত হয়, যদিও সরকারী রিপোর্ট অনুসারে বরিশালে এই পুস্তিকাটি প্রচারিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে জন. আর. ম্যাকলেন বলেন :

> যদিও একজন সরকারি কর্মকর্তা দাবী করেছিলেন যে, ময়মনসিংহে ১৯০৭ সালের ভয়ঙ্কর দাঙ্গার আগে এই পুস্তিকা বিতরণ করা হয়নি, তথাপি এর বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। এই পুস্তিকার লেখক ইব্রাহিম খান ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অধিবাসী।[৯]

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহরে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। জনসংখ্যার বিচারে হিন্দুদের থেকে সামান্য বেশী ছিলো মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। স্থানীয় কংগ্রেসপন্থী 'ত্রিপুরা পিপল্‌স এসোসিয়েশন' এবং তার শাখাগুলি বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন না করে বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে কুমিল্লার গ্রামগুলিতে পুলিসী নির্যাতন বৃদ্ধি পায়, এই পুলিসী নির্যাতন বন্ধের প্রচেষ্টায় সেখানে ছোট ছোট বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ২৩শে ফেব্রুয়ারি কলকাতার ব্যারিস্টার আব্দুল রসুলের 'ত্রিপুরা জেলা সম্মেলনে' সভাপতিত্ব করার সিদ্ধান্ত হলে সাধারণ মুসলমান ও মুসলিম লীগ কর্মিগণ এটাকে সহজভাবে নিতে পারেননি; সম্মেলন শেষ হওয়ার অনতিবিলম্বে নবাব সলিমুল্লাহ্‌, নবাব নওয়াব চৌধুরী প্রমুখ কুমিল্লা শহরে পৌঁছান ; উদ্দেশ্য মুসলিম লীগের জেলা শাখা স্থাপন। একটি 'ঢিল' মারার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, গ্রামাঞ্চলে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে হিংস্রাশ্রয়ী দাঙ্গা চলতে থাকলেও প্রশাসন শম্বুক গতিতে পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে কিন্তু প্রতিরোধের জন্য তেমন কোনই ভূমিকা গ্রহণ করে না। মিঃ ম্যাকলেন বলেন :

> এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমায় যে সব ব্যাপক আনুক্রমিক

> দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল, সেগুলির জের হিসেবে অন্যান্য স্থানেও দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। ময়মনসিংহে দাঙ্গাগুলি কেবল অধিকতর সহিংসই ছিল না, বরং এই দাঙ্গা দেখে বোঝা যায় কিভাবে স্থানীয় এবং বহিরাগত রাজনৈতিক প্রভাব, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সামাজিক বিভক্তি এবং প্রশাসনিক ভূমিকা একত্রে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে।[১০]

১৯০৫-এর বঙ্গ বিভাজনের দিন থেকেই জামালপুরে দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে, ১৯০৭-এ তা দাবাগ্নির রূপ নেয়। মুসলিম অধ্যুষিত জামালপুরের ঘটনা—ক্ষমতা প্রদর্শনের মহড়া থেকে যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। ইত্যবসরে পূর্ব বাংলার অন্যান্য জেলায়ও সাম্প্রদায়িক গোলযোগ দেখা দেয়, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাতে দুরারোগ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালো বীজ বপন করা হয়। তবে জামালপুরের ঘটনা পূর্ববাংলাকে প্রথম হিংস্রতা ও পৈশাচিকতায় কলঙ্কিত করে, প্রশাসন সক্রিয় হলে শহরাঞ্চলে অন্তত এই বীভৎস সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করা যেত এবং শহরে বন্ধ হলে গ্রামগুলিও শান্ত হয়ে যেত। তবে প্রশাসন যন্ত্রই যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভেদপন্থাকে প্রশ্রয় দেয় এবং হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতা ও অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতন না হয় তবে জামালপুরের গ্রামজীবনে এই সাম্প্রদায়িক হিংস্রতা, মৃত্যু ও ধর্ষণে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সময়ের ব্যবধানে আজ যে কথা বলা সহজ, সেদিন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে তা বলা কি সম্ভব ছিল? ১৯৯২-এ ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতে প্রায় ৬ শত বৎসরে প্রাচীন নিদর্শন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হতে বেশ কয়েক ঘন্টা সময় লাগলেও প্রশাসনের প্রহরীরা ছিল দণ্ডায়মান, কিন্তু তারা ছিল তখন অথর্ব, নিশ্চল, নিশ্চুপ ; স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী দূরদর্শনে তখন কী দেখছিলেন? এই বর্বরতার কোনো আবরণ দেয়া যায় কি? বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করেই অসংখ্য মা, বোনদের ইজ্জতের বিনিময়ে লাভ করা স্বাধীন বাংলাদেশের পটুয়াখালিতে মুসলিম মৌলবাদীরা অগণিত নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করে, ধর্ষণে কলঙ্কিত করে *মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের চিন্তা-চেতনা-আত্মত্যাগকে। তাই অতীতের কুমিল্লা-জামালপুরের ইতিহাস আজ আর লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত না করাই ভাল নয় কি? মিঃ জন, আর, ম্যাকলেনের* একটি উক্তি দিয়েই সাম্প্রদায়িকতার উৎস অনুসন্ধান করে এই পর্বের আলোচনা সাঙ্গ করা প্রয়োজন বোধ করছি :

> হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের মন্তব্যসমূহের গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই ফল আকস্মিক কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত উপজাত কোনটিই ছিল না। বরং সরকারী নীতির একটি উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। পূর্ব বাংলা এবং আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ সৃষ্টির অর্থ ছিলো মুসলমানদের উচ্চাকাঙ্খাকে একটি ভৌগোলিক অভিব্যক্তি প্রদান করা। অন্যদিকে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী রাজনীতিতে মুসলমানদের অংশগ্রহণকে একটি ধর্মীয় ভিত্তি প্রদান করেছিল। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের একটি পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী এবং একটি ভৌগোলিক স্বীকৃতি প্রদানেব মাধ্যমে কংগ্রেসী আন্দোলনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সরকারী কর্মকর্তারা এই সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।[১১]

বঙ্গদেশের জনজীবন কখনো নিস্তরঙ্গ নয়, প্রতিনিয়ত ঝঞ্ঝা এসে আছড়ে পড়ে এর

সমাজ-জীবনে;তাই বাংলা আর বাঙ্গালী বিদ্রোহী। বিপ্লবীদের 'যুগান্তর' সৃষ্টির পরবর্তীতে ঢাকাতে সৃষ্টি হলো 'অনুশীলন সমিতি'। ১৯০৬ সালে বরোদা থেকে বাংলায় ছুটে এলেন বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ, নিত্য দিনের কর্মকাণ্ডে গ্রথিত হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ। ঐ বছরেই বিপ্লবীদের পত্রিকা 'যুগান্তর' প্রকাশ পেলো। 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন'কে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ভারতের মুক্তির জন্যে অসংখ্য তরুণ-যুবা অগ্নিমন্ত্রে শপথ নিয়ে এগিয়ে এলো।

১৯০৭-এ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফুল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা বিফল হয়, অন্য এক ব্যর্থতায় রক্ষা পেলেন লেঃ গভর্ণর স্যার ফ্রেজার। কিন্তু বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের পরীক্ষায় প্রথমেই নাম ওঠে প্রফুল্ল চাকীর; ১৯০৮-এর ৩০শে এপ্রিল প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা মারে, প্রফুল্ল চাকী পুলিসের জনৈক সাব-ইনেসপেক্টার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঠকারিতায় ধরা পড়তেই নিজের পিস্তলের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম পুলিসের জালে ধরা পড়ে, মিঃ কর্ণডফের আদালতের বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয়; হাইকোর্টে আপিল হলেও এই আদেশ বহাল থাকে। ১১ই আগস্ট মোজাফ্ফরপুরের জেলে বীর বালক ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দেয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশবাদী সরকার বিপ্লবীদের প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করায়, বিচার বিভাগে ব্রিটিশ বিচারকগণের একপেশে রায়ের ফলে বিপ্লবীদের প্রতি অতিরিক্ত নির্যাতন শুরু হলেও পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলনের ধারা ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। বরিশালেব 'বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী-সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ ও সাধন' সমিতি-র মতোই খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, রাজশাহী, রংপুরে অসংখ্য ছোট ছোট বিপ্লবী সংস্থা বা সমিতি গঠিত হয়। *বিপ্লবীরা ধৃত হয়, শূন্যস্থান নতুন বিপ্লবীরা এসে পূরণ করে, এমতাবস্থায় ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় একই সঙ্গে ১৫ জন বিপ্লবীর শাস্তি হলে আপাতত ঢাকার বিপ্লবী* কর্মকাণ্ডে গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে আসে। অনেকের মতে বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে বলেই তাদের পক্ষে নতুন কোনো বৃহত্তর ঘটনা ঘটানো সম্ভব হয়নি। বিপ্লবীদের সাহস ও আত্মত্যাগ, স্বাধিকার-স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিকতা দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। বিপ্লববাদীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছিলো—শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীল, কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি; তাঁদের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র হলে বঙ্গদেশ তথা ভারতের ইতিহাস হয়তো আমরা অন্যরূপে দেখতে পেতাম, স্বাধীনতার জন্য ১৯৪৭ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না!

বাংলা দেশে গুপ্ত হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ইংরেজ সিভিলিয়নরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন, প্রশাসন তাদের বাংলা থেকে অন্যান্য প্রদেশে পাঠায় যাতে করে বিপ্লবীদের বুলেট থেকে তারা রক্ষা পান। কিন্তু প্রশাসনের এই প্রচেষ্টা বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

লর্ড মিন্টো, লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঔদ্ধত্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে

ওঠে, তাঁদের পরিকল্পনা আংশিক সফল হলেও বঙ্গদেশের এলিট ছাত্র-যুবারা বিরোধী হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে ; মৃত্যুকে যাঁরা ভয় পায় না প্রশাসন তাঁদের নতুন করে কোন্ শাস্তি দেবে? চণ্ডনীতির মাধ্যমে দেশের যুব সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়, মুক্তিকামী বিপ্লববাদীরাও ক্রমশ সংক্রামক হয়ে ওঠে। মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বকে সর্ববিধ সাহায্য সহযোগিতা সত্ত্বেও লর্ড কার্জন, স্যার ফুলার চক্র এগোতে পারছিলেন না, কেন না নবাব সলিমুল্লাহ্‌র ইচ্ছে ছিলো, মানসিকতা ছিলো, কিন্তু ছিলো না তুলনামূলক উন্নত কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে পিছিয়ে পড়া একটা সম্প্রদায়কে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত নেতৃত্বের ক্ষমতা;যা পরবর্তীতে মিঃ মোহাম্মদ আলি জিন্না প্রমাণ করেছিলেন। লর্ড কার্জন এ সত্য বুঝলেন, কিন্তু ততক্ষণে বাংলা অগ্নিগর্ভ, বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডের ছোঁয়া লেগেছে ভারতের প্রায় সবগুলি প্রদেশেই ; স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক পড়েছে সর্বত্র। ম্যানচেষ্টার-লিভারপুলের ধনকুবের মিল-মালিকেবা চিন্তান্বিত দ্বিধাগ্রস্ত, ভারতবর্ষের বৃহত্তর বাজারে ভবিষ্যতে কোন্ দেশীয় পণ্য স্থান পাবে—নাকি স্বদেশীদের তৈরী পণ্য—কারখানায় উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাত হবে ; 'এটা তারা ভারত সচিবের কাছে প্রশ্ন আকারে রাখেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক ক্রমাবনতিকে ঠেকিয়ে রাখার একটাই পথ থাকে সরকারের তা হলো বঙ্গ-বিভাজনকে রদ করা। রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী ভারত আগমন উপলক্ষে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে রাজা পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ বাতিল বলে ঘোষণা করেন। স্বদেশী আন্দোলনকারীরা এবং সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এটাকে তাদের জয় বলে অভিহিত করলেন। তবে বঙ্গ-বিভাজনের শুরুতে মুসলমানদের কোনো মতামত নেয়নি ভারতে ব্রিটিশ সরকার, বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সময়ও তাদের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা হয়নি। মধ্যবর্তী কয়েকটি বছরে বঙ্গদেশে সৃষ্টি হলো পারস্পরিক অবিশ্বাস—হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দপূর্ণ সহবস্থান রূপ নিলো সাম্প্রদায়িকতার অমানবিক আচরণে। বড়লাট হার্ডিঞ্জের নেতৃত্বে বঙ্গ-বিভাজন বাতিল হলো বটে কিন্তু কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হলো, অর্থাৎ বঙ্গদেশের বিপ্লবীদের সরাসরি আক্রমণের নিরাপদ দূরত্বে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা নিজেদের রাখতে চাইলেন। বস্তুত এর ফলে বাংলার গুরুত্ব সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হ্রাস পেলো।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে মহামান্য আগা খাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলিম প্রতিনিধি দলকে বড়লাট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পালিত হতে চললো, মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের নামে সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, সীতারামাইয়া বলেন :

> প্রথম প্রস্তাবে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার ব্যাপারে (কংগ্রেস) আপত্তি জ্ঞাপন করল। নিম্নোক্ত ধারার জন্যও কংগ্রেস অসন্তোষ ব্যক্ত করল : (ক) এক বিশেষ ধর্মমতে অনুগামীদের একান্তভাবে অনুচিত মাত্রাতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়া; (খ) নির্বাচকমণ্ডলী এবং ভোটার ও প্রার্থীদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে মহামান্য সম্রাটের প্রজাদের মধ্যে অন্যায় ও অপমানজনকভাবে মুসলমান ও অমুসলমানের পার্থক্য করা।[১২]

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে যখন মুসলমানরা

উল্লসিত তখন ডিসেম্বর মাসে (২৬-২৯) কংগ্রেসের ২৫তম অধিবেশনে মিঃ জিন্না ঐ শাসন-সংস্কারের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যদিও তৎকালীন মুসলিম সমাজের কাছে মিঃ জিন্নার এই প্রস্তাব ছিল অনভিপ্রেত। কিন্তু ১৯১২-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর নির্বাচন স্বীকৃতি পেলে ৩১শে ডিসেম্বরে বাঁকিপুরে মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে আমন্ত্রিত হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন। বস্তুত মিঃ জিন্নার রাজনৈতিক জীবনের উত্থান কংগ্রেসের মাধ্যমেই শুরু হয়, পরবর্তীতে দেখব যে, পরিণত বয়সে রাজনীতিতে তিনি মুসলিম লীগের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন। এবং পাকিস্তান আন্দোলনের সর্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন তিনি।

১৯১১-তে বঙ্গ-বিভাজন রদ হলে পূর্ব বাংলা তথা ভারতের মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যে হতাশা দেখা দেয়, তারা যেভাবে ব্রিটিশ সরকার ও হিন্দুদের কারো সঙ্গেই সহজ হতে পারেনি—মানিয়ে নিতে পারেনি তাতে সামগ্রিকভাবেই সংগঠনের দিক দিয়ে মুসলিম লীগের ক্ষতি হচ্ছিলো। এমনি এক পরিস্থিতিকে সঙ্গী করেই আগা খাঁ মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি হলে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, জমিদার শ্রেণী ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পুনরায় একটা প্রত্যয় ভাব জাগে। ঠিক এর পরেই মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের নামে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার কথা ঘোষিত হলে উপমহাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় একটি জাতীয়তাবোধের (?) উন্মেষ ঘটে, যার প্রধান অবলম্বন ঐস্লামিক সাযুজ্য। তুরস্ক ও ইরানের জাতীয়তাবাদ—ইসলামের ধর্মীয় বন্ধনে এদেশের মুসলমানেরা অনুপ্রাণিত হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নিজের 'আল হেলাল' উর্দু পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম জাতীয়তাবাদের পক্ষে, মৌলানা মহম্মদ আলীও নিজের 'কমরেড' ও 'হমদর্দ' পত্রিকা দুটিতে মুসলমানদের জাতীয়তাবোধের চেতনা গঠনে কাজ করেন।

স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে ১৯১৩-এর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুসলিম লীগ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সপক্ষে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে 'স্বায়ত্তশাসন' দাবী করে, এবং 'স্বায়ত্তশাসন' অর্জনের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের অঙ্গীকার করে। জনসেবাকে সামনে রেখে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলে। মার্চ মাসের এই অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে এসেছিলেন শ্রীমতী নাইডু, মিঃ জিন্না। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবরে মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের সদস্য হন : অবশ্য এই সময় একই ব্যক্তি কংগ্রেস, লীগ বা অন্যান্য সংগঠনে পৃথকভাবেই নিজের সদস্যপদ রাখতে পারতেন। মুসলিম লীগে যোগ দেবার পরে মিঃ জিন্না লীগ এবং কংগ্রেস উভয়ের কর্মসূচীতে জাতীয়তাবোধকে স্থান দেয়ার প্রয়াস চালান, যার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্ব ফিরে পায়। মিঃ জিন্নার এই প্রয়াসকে কংগ্রেস অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে করে ; এই প্রসঙ্গে গোখলের মন্তব্য স্মর্তব্য :

> তাঁর ভিতরে সাচ্চা বস্তু আছে আর আছে তাবৎ সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত ও গোড়ামী থেকে মুক্ত সেই মানসিকতা যার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত হতে পারেন।[১৫]

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে করাচী কংগ্রেসে মিঃ জিন্নার উদ্যোগেই সিদ্ধান্ত হলো ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের কংগ্রেস ও লীগ উভয়েরই বাৎসরিক অধিবেশন হবে বম্বেতে, অর্থাৎ এ সময়ই

মিঃ জিন্না সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নিজেকে দক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। ঠিক এ বছরেই ১৯১১তে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঞ্জাবের সাহসী যুবক হরদয়াল ভারতে ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী যে প্রচার ও আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার ফলশ্রুতি হিসেবে, হরদয়ালের নেতৃত্বেই 'গদ্দার' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ পায় ; পরবর্তীতে সেখানে 'গদর' পার্টির সৃষ্টি হলে অধ্যাপক বরকতউল্লাহ্, সোহন সিং উক্ত পার্টিতে যোগ দেন। মিঃ জিন্নাকে যে কারণে গোখলে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত' বলে অভিহিত করেছেন, তেমনিভাবে বঙ্গদেশের ঢাকাতে মৌঃ মহম্মদ ওয়াজেদ সাহেবের পুত্র এ. কে. ফজলুল হক স্বদেশী যুগের বিপ্লবী নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের স্নেহধন্য হয়ে ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্রে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলেন, তিনি বাঙ্গালীর উন্নতি ও সার্বিক মঙ্গলের জন্য কাজ করবেন। নির্বাচনী যুদ্ধে নির্বাচকমণ্ডলীকে তিনি বাগ্মিতায় প্রভাবিত করতে সক্ষম হন, এর ফলেই প্রতিদ্বন্দ্বী রায়বাহাদুর কুমার মহেন্দ্রনাথ মিত্র তরুণ ফজলুল হকের নিকট পরাজিত হন। মিঃ জিন্না যখন রাজনীতিতে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত, ফজলুল হকের তখন হাতেখড়ি শুরু হলেও অচিরেই তিনি বঙ্গদেশ তথা ভারতের রাজনীতিতে স্থান করে নেন। উল্লেখ্য, ফজলুল হকই প্রথম মুসলমান ব্যক্তি যিনি নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দেন এবং বাংলা ও বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীকালের ইতিহাসে বাংলা-পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশকে আমরা দেখতে পাবো 'বাঙালী' পরিচয়ের উত্থান-পতনের আনন্দ-বিষাদে, সংগ্রামে-প্রতিজ্ঞায় বিরল দৃষ্টান্তের অধিকারী হতে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মিঃ জিন্নার মুসলিম লীগের সদস্যপদ গ্রহণ (১৯১৩) এবং রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদ মোচনের প্রচেষ্টার কিছুদিনের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনবাদীদের দ্বারা সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)। এই বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধ-শোষণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রপ্রিয় স্বাধীনতাকামী জনতার মুক্তি প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সাধারণ জনমানসেও প্রতিফলিত হয় ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা, গড়ে ওঠে নানাবিধ সংগঠন; মুক্তি ও সংহতির প্রশ্নে, আপসহীন সংগ্রামে বিপ্লবীরা দেশ থেকে বিদেশে ছড়িয়ে যান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবাসে পাঞ্জাবী হরদয়াল, অধ্যাপক বরকতউল্লাহ, সোহন সিং প্রমুখের 'গদ্দার' পার্টি অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য ও সমর্থন লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হরদয়ালকে গ্রেফতার করে এবং পরে জামিনে মুক্তি দিলে হরদয়াল ইউরোপ চলে যান। আমেরিকা প্রবাসী শিখগণ তাদের দাবীর প্রতি ভারত সরকারের কোনো সমর্থন বা সহানুভূতি না পেয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে তারা আরো জোরদার করে। গুরদিৎ সিং-এর নেতৃত্বে তারা 'ইমিগ্রেশন আইন' ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে 'কোমাগাটামারু' নামক একখানা বড়ো স্টীমার ভাড়া করে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কানাডার পথে যাত্রা করে। জাহাজখানি ভ্যানকুভার বন্দরে পৌঁছয় ২৩শে মে, কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নানাপ্রকার ভয়-ভীতি দেখালে, জাহাজ থেকে নামতে না দিলে তারা ২৭শে সেপ্টেম্বর কলকাতার নিকটবর্তী বজবজে এসে পৌঁছায়। স্বদেশেও জাহাজে অবস্থানকারীদের সঙ্গে পুলিসের ধস্তাধস্তি হয়, পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৮ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এই ঘটনাটিকে

কেন্দ্র করে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর শিখদের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেয়, শিখ সেনারা ধর্মীয় ও স্বাজাত্যবোধে ব্রিটিশ সরকারের এই অত্যাচারকে মেনে নিতে পারেনি ; কিন্তু প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে এর প্রতিকার করার মতো অবস্থানে তারা ছিলো না। রাসবিহারী বসু বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিয়ে শিখদের এই অসন্তোষকে কাজে লাগাতে এগিয়ে এলেন, স্থানীয় বিপ্লবীদের ধারণা ছিলো ব্রিটিশ সরকারের বা তাদের প্রশাসনের উপর আঘাত হানার এটাই উপযুক্ত সময়। কর্তার সিং নামক জনৈক বিপ্লবী অভূতপূর্ব সাহসিকতা নিয়ে সেনা ব্যারাকে শিখ সেনাদের মধ্যে এক অভ্যুত্থানের প্রেরণা দেন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করা হয়। বিপ্লবীদের আয়োজন ও প্রস্তুতি পূর্ণ রূপ পাওয়ার পূর্বেই কৃপাল সিং নামক ব্রিটিশের এক গুপ্তচরের মারফত খবর পেয়ে সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান দমন করতে সক্ষম হয়। এই মামলার বিচারে কর্তার সিং, বিষ্ণু পিংলে সহ সাতজনের ফাঁসির আদেশ হয় এবং ১৭ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ঘটে। এমতাবস্থায় পুলিস ও প্রশাসনের কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়েও রাসবিহারী বসু বিপ্লবী আন্দোলনের ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রাখেন; কিন্তু বুঝতে পারেন বিদেশী সাহায্য লাভ ব্যতীত ভারতে এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেয়া দুরূহ। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে তিনি একখানি জাপানী জাহাজে পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে ভারত ত্যাগ করেন কিন্তু জাপানে গিয়েই অচিরে তিনি বুঝতে পারেন এতোদিন এশিয়ার মুক্তিসূর্য হিসেবে জাপানকে ভাবলেও প্রকৃতপক্ষে জাপান অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশের মতোই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তিতে যোগ দেয়ায় জাপান সরকার ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে রাসবিহারী বসুকে জাপান থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেয়; কিন্তু বসু দশটি বছর জাপানেই আত্মগোপন করে থাকেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব থেকেই অনেক ভারতীয় শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য বিভিন্ন কারণে জার্মানি ও জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলে বসবাস করতেন;কিন্তু ভারতের স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন (সন্ত্রাসবাসী) সম্পর্কে তারা ওযাকিবহাল ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কতিপয় বিপ্লবী জার্মানি যান, সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়দের—জার্মানদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভে তাঁরা সক্ষম হন। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে স্বদেশ থেকে ব্রিটিশ তাড়নের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় তারা জার্মানি সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা চান;অনুরূপভাবে জার্মানি সরকারেরও ইচ্ছে ছিলো ভারত থেকে ব্রিটিশ উচ্ছেদ ঘটলে ব্রিটেন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়বে, অতএব ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ও বিপ্লববাদী কাজকর্ম অব্যাহত থাকুক। ব্রিটিশ-বিরোধী বা ব্রিটিশ তাড়নকে উদ্দেশ্য নিয়ে বার্লিনে ডঃ তারক দাস, অধ্যাপক বরকতউল্লাহ, হরদয়াল, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবীগণ একটি সমিতি গঠন করেন। তুরস্ক ব্রিটিশের বিরোধী শিবিরে যোগ দিলে অধ্যাপক বরকতউল্লাহ কাবুলে এসে পৌছান, ইতিমধ্যে সেখানে এসে পৌছে যান ওবায়েদউল্লাহ সিন্ধি, ফাতেহ মোহাম্মদ, মোহাম্মদ আলি, মিয়া মাহমুদ আনসারী, আবদুল্লা প্রমুখ, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। এঁদের প্রচেষ্টায় কাবুলে ভারতের জন্য একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়; এই সরকারের প্রধান কাজ হলো জার্মানি থেকে অস্ত্র ভারত প্রেরণ করা, যাতে দেশের ভেতরকার বিপ্লবীরা সন্ত্রাসমূলক কাজে আরো অধিকতর সুযোগ লাভ করে।

কিন্তু মক্কার শেরিফ হোসেন এই প্রবাসী সরকারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেও বিশ্বাসঘাতকতা করেন, এর ফলে ইংরেজরা বিপ্লবীদের একাংশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় এবং স্বাধীনতাকামীদের এই প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়। এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েও ভারতের ব্রিটিশ রাজত্ব খতমের প্রচেষ্টা চলে শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক ও ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী বাটাভিয়ায় দুটি বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরী করার মাধ্যমে। চীন, জাপানের স্বাধীনতাকামীরা (বিপ্লবীরা মূলত), আমেরিকার 'গদ্দার' বিপ্লবীরা যোগাযোগ রেখে চলতো ব্যাঙ্ককের সঙ্গে এবং বঙ্গদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতো বাটাভিয়া; ব্যাঙ্কক ও বাটাভিয়ার মধ্যেও পারস্পরিক যোগযোগ রক্ষিত হতো। বঙ্গদেশে বিপ্লবকে এগিয়ে নিতে বিপ্লবীদের দূত ও নেতৃত্বের দাবী নিয়ে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তীতে এম. এন. রায় নামে বিখ্যাত) বাটাভিয়াতে এসে জার্মানদের তরফে থিওডোর হেলফারিক নামের অফিসারের কাছে জানেন, 'মেভারিক' জাহাজের ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ, অর্থ বঙ্গদেশে যাবে, কিন্তু 'মেভারিক' যাত্রা করলেও নানা কারণে ভারতের বঙ্গদেশে এসে পৌঁছায়নি। থিওডোর হেলফারিক প্রথম উদ্যোগে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে পরপর তিনখানি জাহাজ অস্ত্র ও রসদ বোঝাই করে বঙ্গদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন; কথা হয় সন্দীপ, হাতিয়া, রায়মঙ্গল (খুলনা জেলার সুন্দরবনাঞ্চলে) ও বালেশ্বরের বুড়িবালামের কোথায় কোথায় মাল খালাস পাবে। এই উদ্দেশ্যে অস্ত্র বোঝাই শেষ জাহাজটি 'হেনরি'ও পূর্বের দুটির ন্যায় পথিমধ্যে ধৃত হয়। ১৯১৬-তে বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল সুন্দরবন থেকে টেকনাফ পর্যন্ত নৌ-বিশেষজ্ঞ দিয়ে নৌ-ঘাটি সৃষ্টির মাধ্যমে বিদেশী অস্ত্র ভারতে আসা বন্ধ করতে প্রয়াসী হন। বিপ্লবীদের কার্যক্রমও এখানে বদলাতে হয়, তাঁরা বুঝতে পারেন এভাবে বিদেশী অস্ত্র ও সাহায্য লাভ সম্ভব নয়। রাসবিহারী বসু ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়) নানাবিধ চেষ্টা করেও যখন বঙ্গদেশে অস্ত্র পাঠাতে ব্যর্থ হলেন তখন বাংলার বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে বিদেশী অস্ত্রের উপর নির্ভর না করেই বিপ্লবী কাজকর্ম চালিযে যেতে হবে। কিন্তু রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, চিত্তপ্রিয়, নীরেন্দ্র প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীগণ বঙ্গদেশে না থাকায় ১৯১৮ পর্যন্ত বঙ্গদেশের বিপ্লবী কর্মতৎপরতা বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় (১৯১৪-১৯১৮) ভারত এবং ভারতের বাইরে বিপ্লবী অস্ত্রের মাধ্যমে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচেষ্টা চালালেও একথা স্বীকার্য যে তাঁদের সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতাই বেশী; যতো বিপ্লবীদের ফাঁসি, দ্বীপান্তর, জেল হয়েছে তুলনামূলকভাবে তাঁদের কাজ এগিয়েছে কম। অথচ এই সময়টা ছিলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের, ভারতের বৃহত্তর দুটি রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে যৌথভাবে আঘাত হানতে পারলে ভারতে ব্রিটিশ অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু তা হলো না, কংগ্রেস আপসের রাজনীতি নিয়েই জন্মেছিল—যৌবনের উদ্দাম কর্মকাণ্ড তখনও তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিলো, 'মিত্রশক্তি'র বিরুদ্ধে তুরস্কের অবস্থান হলেও ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশের সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়—যুদ্ধে যায়, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্রিটিশের সাহায্যকারী-সহযোগী হিসেবে তারা এগিয়ে আসে। মুসলিম লীগ ভারতের রাজনীতিতে

নিজেদের প্রতিষ্ঠা নিয়েই ব্যস্ত, যদিও এসময় মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ সদস্য ব্রিটিশের পাশে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের মতোই অনুগ্রহ লাভে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠাকামী ছিলেন, তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন ১৯১১-এর ডিসেম্বরে লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ক্রিউক মিলে বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলমানদের মতামতের কোনই গুরুত্ব দেয়নি। তবু একথা বলতেই হয়, উভয় রাজনৈতিক দলেই বাম-চেতনাসম্পন্ন কর্মী-নেতৃত্বের একটা অংশ ছিলো, কিন্তু তারা সংখ্যাল্পতার জন্য এবং নরমপন্থীদের ভিড়ে নিজেদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি। উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেস ব্রিটিশের পক্ষে সমর্থন জানায় বলেই কংগ্রেসকে মর্যাদা দান-হেতু ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গভর্ণর লর্ড পেন্টল্যাণ্ড যোগ দেন, ১৯১৫-তে বোম্বের গভর্ণর লর্ড উইলিংডন উপস্থিত ছিলেন এবং ১৯১৬-তে লক্ষ্ণৌতে এসেছিলেন যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যার জেমস্ মেস্টন।

১৯১৬-তে দেশে নানা ধরনের আন্দোলন হয়েছে, হাজার হাজার লোককে বিনা বিচারে আটক করা হয় ; অবশ্য এই বিনা বিচারে বন্দী করার বিরুদ্ধেও আন্দোলনের ফলে জনমত তৈরী হয়েছিলো। কিন্তু এ সময়ের 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' জনমানসে সবচেয়ে বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করে।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে বোম্বের লীগ অধিবেশনে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, কংগ্রেস সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শাসন সংস্কারের পরিকল্পনার জন্য পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা এবং হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সমস্যা দূরীকরণে মিঃ জিন্নার প্রস্তাবে হজরত সোহানী ও অন্যান্য কট্টরপন্থী মুসলিম লীগের সদস্যদের আপত্তি থাকেলও প্রকাশ্যে সমর্থন করে প্রশংসা করেন ঐ অধিবেশনের সভাপতি মজহারুল হক। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ভেদরেখা দূর করে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অধিকার আদায়ে মিঃ জিন্নার ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ; এ ক্ষেত্রে লোকমান্য তিলক, শ্রীমতী বেসান্তের নামও উচ্চারণ করা উচিত। ১৯১৯-এর শেষ দিকে কংগ্রেস ও লীগের যৌথ কমিটি বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের আইন সভার সদস্যদের সংখ্যাজনিত ভাগবাটোয়ারায় একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয় ; এ বৎসরে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশনেই আসন ভাগাভাগির সমস্যার সমাধান সূচিত হয়। লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশনে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে আইন সভায় আসন বন্টন সম্প্রদায় ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য এভাবে স্থির হয় :

> পাঞ্জাবে নির্বাচিত সদস্যদের অর্ধেক, সংযুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩০ ভাগ, বাংলায় শতকরা ৪০ ভাগ, বিহারে শতকরা ২৫ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে শতকরা ১৫ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ১৫ ভাগ, এবং বোম্বাই প্রদেশে তিন ভাগের এক ভাগ, ইম্পিরিয়াল অথবা প্রাদেশিক কোন নির্বাচনেই তাঁরা এই বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের কোটার বহির্ভূত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। এই ব্যবস্থাও রইল যে,.....'এক অথবা অপর সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিল নিয়ে কেবল তখনই আলোচনা হবে যদি সংশ্লিষ্ট আইনসভার সেই সম্প্রদায়ের সদস্যদের অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ সেই বিলের বিরোধিতা না করেন'। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের— নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান। তাঁরা নির্বাচিত হবেন মুসলমানদের পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীর দ্বারা যার অনুপাত হবে ......যে হারে তাঁরা পৃথক

মুসলমান ভোটারদেব দ্বারা প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত।[১৮]

ডিসেম্বরের ৩০-৩১শে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মিঃ জিন্না এই চুক্তিকে অনুমোদন করিয়ে নেন। উল্লেখ্য, বঙ্গপ্রদেশে মুসলমানদের জনসংখ্যা অধিক হলেও শতকরা ৪০টি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত হলো, যার সংখ্যা আরো অধিক হওয়াই সঙ্গত ছিলো। এই অধিবেশনে মিঃ জিন্নার বক্তব্য ভারতে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী ছিলো :

> হিন্দুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হবে শুভেচ্ছা এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন। আমাদের চালক নীতি হবে দেশের স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা। দুই ভ্রাতৃপ্রতিম মহৎ সম্প্রদায়ের ভিতর যথার্থ বোঝাপড়া এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল ভারতবর্ষের যথার্থ প্রগতি সম্ভবপর হবে।[১৯]

এই চুক্তির প্রস্তুতিপর্বে ও ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে শ্রীঅম্বিকাচরণ মজুমদার, মিঃ জিন্না, স্যার ওয়াজির হাসান, শ্রীবিজয়রাঘব আচারিয়া প্রমুখের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় কেন না দেশ-বিদেশের বিপ্লববাদীরা যখন হতাশা-ব্যর্থতায় হতোদ্যম তখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সহমর্মিতার মাধ্যমেই দাবী আদায় ছিল একমাত্র পথ। যদিও ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রত্যাশা ছিলো সাম্প্রদায়িক বিভেদকে সামনে রেখে ভারতীয়দের আইন সভার অংশগ্রহণকে বিলম্বিত করার। কিন্তু ভারতবর্ষের জন্য এই ধরনের একটি সমঝোতামূলক ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে, ভারতের গণআন্দোলনের জন্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমে গণ-মনে আলোড়ন সৃষ্টি করা সম্ভব। বস্তুত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য গড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সাম্প্রদায়িক হিংসাকে পরিহার করে দেশ যখন এক মিলনের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ সেই সময় ডঃ এ্যানি বেসান্ত হোমরুলের জন্য দাবী উত্থাপন করেন। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট'-কে সামনে রেখে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ আপস মীমাংসায় এলো কতকগুলি দাবীকে কেন্দ্র করে, কেননা এই দাবীগুলি পূরণে বিলম্ব হলে ভারতের ক্ষতি ; তাই সমঝোতা হলো কংগ্রেস ও লীগে—মুখ্যত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধির সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনির্ধিদের ; ভূস্বামীদের অস্তিত্ব রক্ষায় পরস্পর দুই সম্প্রদায়ের ভূস্বামীদের। সত্যিকারের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধের নিশ্চিত অবসানের মানসে এই সমঝোতা এভাবে সম্ভব ছিলো না। শ্রেণীচেতনা ভিত্তিক কার্যকলাপে সাম্প্রদায়িকতার শেকড় ছেঁড়া এই চুক্তির লক্ষ্য ছিলো না, যেহেতু ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এই নেতৃত্ব সাধারণের কাছে আসতে পারেনি, তাই শ্রেণীস্বার্থের নিজস্ব লক্ষ্যকে অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে রাশিয়াতে এক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জার ক্ষমতা হারালে ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠে ; ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কংগ্রেস-মুসলিম লীগের যৌথ আন্দোলনকে নানা প্রকার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে নখ-দন্তহীন অবস্থায় দাঁড় করাতে তৎপর হয়। এই সময় ভারতে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্রভূত প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, যাব অধিকাংশই পালিত হবে না সে কথা তারা নিজেরাও জানতো, কংগ্রেসের নরমপন্থীরা প্রথম দিকটাতে প্রতিশ্রুতি পেয়েই শান্ত থাকে, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারাও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণব থেকে ভাইসরয়, ভারত

সচিবের প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। স্বাভাবিক কারণেই রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে এদেশেও গণতান্ত্রিক চেতনা প্রসারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন এগিয়ে আসতে পারে, তাই ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতকে অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ শাসন ক্ষমতা দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ১৯১৭-তে নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় কৃষক-শ্রমিকের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার সর্বহারার বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে ব্যাপারটি ঠিক 'গোদের উপর বিষফোঁড়া' হয়ে ওঠে, রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পর্কে ভারতীয়দের নিয়ে তারা দুশ্চিন্তায় ছিল, এবারে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারা ভারতের সংবাদপত্রগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে—যাতে রাশিয়ার সংবাদ ছাপা না হয় এবং বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালাতে থাকে যাতে ভারতের সাধারণ মেহনতী মানুষ রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিকের সর্বহারা বিপ্লব সম্পর্কে অবহিত হতে না পারে। কিন্তু ঘটনা ঘটলো উলটো, ব্রিটিশের প্রচার এবং সংবাদপত্রের উপর বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে সাধারণ মানুষ—মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষের মধ্যে রাশিয়া সম্পর্কে কৌতূহল বেড়ে যায়; সেন্সর করা সংবাদের মধ্য থেকেও অনেক সময়ই বাস্তব ঘটনার বহিঃপ্রকাশ দেখা যেতো। ভারতীয় বিপ্লবীগণ, গুপ্ত সমিতিগুলি এ সময় রাশিয়ার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের অভ্যুত্থানে আশান্বিত হয়ে কর্ম-পদ্ধতিতে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিণ করে; যদিও লেনিন এবং সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার নিরন্তর কুৎসা প্রচার করছিলো। সম্ভবত আমাদের দেশে বিশেষ করে মজুরদের ভেতর ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে এ কারণেই চঞ্চলতা দেখা দেয়, বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতে দারুণ আর্থিক মন্দার মধ্যেই ভারতীয় মজুররা সংঘবদ্ধভাবে আর্থিক দাবী-দাওয়ার প্রেক্ষিতে অনেকগুলি ধর্মঘট পালন করে। এ সময় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, বিশেষ করে কংগ্রেসের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক, লাজপৎ রায় প্রমুখের উপস্থিতিতে দলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নতুন রূপ—সংগ্রামী চেহারা নিতে থাকে, কেন না এঁরা কংগ্রেসে এলেও তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিলো—উদ্দেশ্য ছিলো ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।

মিঃ জিন্নার কর্মবহুল উত্থানময় জীবনে ১৯১৭ সাল এক উজ্জ্বল অধ্যায়, তাঁর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের বক্তব্যে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে ভারতীয়দের অফিসার পদে অধিক সংখ্যক নিয়োগ, আই. সি. এস.-দের অর্ধেক পদ ভারতীয়দের দেয়া, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, ভারতবাসী ও ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সমতা প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি দাবী হিসাবে উত্থাপিত হয়ে গুরুত্ব লাভ করে। ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে কেন্দ্র করেই তিনি হোমরুল লীগে যোগ দেন। হোমরুল লীগকে কেন্দ্র করে তখন জনমত সৃষ্টি হতে চলেছে, কিন্তু এ্যানি বেসান্ত, একগুন্তে প্রমুখ নেতা অন্তরীণ, আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও মৌলানা আজাদ বন্দী; প্রাদেশিক কংগ্রেস ও লীগ কমিটিগুলি বন্দীমুক্তি নিয়ে প্রতিরোধের কথা চিন্তা করছে। ক্রমশ জনসাধারণ উদ্দাম হয়ে উঠছে কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গ তবুও নিশ্চল, নিশ্চুপ। এ বছরেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গান্ধী ফিরে এসে রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সবরমতী আশ্রম স্থাপন করেন।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট পাস হয়েছিলো। এই আইনটি বলবৎ থাকার সময়সীমা ছিলো যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় মাস পর পর্যন্ত। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ভারতের

রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলো যে, যুদ্ধ শেষে ভারতের জন্য আরো কোনো কঠিন নিবর্তনমূলক আইনের প্রয়োজন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ভারত সরকার পাঁচজন সদস্য নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এবং এই কমিটির নাম হয় 'সিডিশন কমিটি', যদিও এই কমিটির সভাপতি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত আইনজীবী মিঃ রওলাট, তাই এই কমিটি খ্যাতি লাভ করে রওলাট কমিটি নামে।

রওলাট কমিটির সদস্যবৃন্দ

1. Mr. Justice S.A.T. Rowlatt, King's Bench Division of His Majesty's High Court of Justice.
2. Sir Basil Scott, Chief Justice of Bombay.
3. Diwan Bahadur C. V. Kumaraswami Sastri, Judge, High Court of Madras.
4. Sir Verney Lovett, Member, Board of Revenue, United Provinces.
5. Mister Prabhas Chandra Mitra, Vakil of Calcutta High Court.

গান্ধীজী ভারতে ফিরে এসে ভারতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অনুধাবন ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের দু'একটি বিষয়ের প্রতিবাদ করে জনগণের সঙ্গে নতুন করে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি চম্পারণ ও খেড়া কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বংশ-পরম্পরায় শোষিত এবং কয়েক শতাব্দীর নির্যাতিত কৃষকদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করে ব্রিটিশ সরকারের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। আহমেদাবাদের শ্রমিক বিরোধ মীমাংসায় তিনি অগ্রণীর ভূমিকা অবলম্বন করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতে এই বিরোধের মীমাংসা ঘটে। অবশ্য ভারতীয় রাজনীতিতে এই সময় মিঃ জিন্নার বিতর্কিত নেতৃত্ব লক্ষণীয়।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব থেকেই মিঃ জিন্না ভারতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হচ্ছিলেন, স্বাদেশিকতার প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসকবর্গকে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের গৃহীত কার্যাবলীকে গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। ১০ই জুন তারিখের 'যুদ্ধ সম্মেলনে' যোগ দিয়ে বোম্বের সভাতে হোমরুলের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে যে বক্তব্য রাখেন তা বিতর্কিত হলেও একজন ভারতীয়ের পক্ষে ছিলো দুঃসাহসের এবং গৌরবদীপ্ত। হোমরুলের প্রতি আস্থাজ্ঞাপক এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই ছোটলাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি বিষয় ছিলো ভারতীয় রাজনীতিতে সঠিক এবং দৃঢ় পদক্ষেপের। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের প্রস্তাব প্রকাশিত হলে (জুন, ১৯১৮) দেখা গেল সেখানে আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার প্রস্তাব থাকলেও গণতান্ত্রিক চেতনার মূল স্বায়ত্তশাসন ও ব্রিটিশ-ভারতীয়দের নাগরিকত্বের সমানাধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি অনুপস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস ও লীগের কাছে মন্ট-ফোর্ড প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি ; সমস্যা থেকে উত্তরণ না হয়ে পাশ কাটিয়ে চলার প্রবণতা বলেই তাঁরা এই প্রস্তাবটিকে মনে করলেন। নভেম্বর মাসে বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায় বিজয়ী উড্রো উইলসন এবং লয়েড জর্জ নিজেদের সপক্ষে মিত্রশক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের জয়গান গেয়ে চলেন, এই অবস্থায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুদ্ধ জয়ে মিত্রশক্তিকে অভিনন্দিত করলেও ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন, ব্রিটিশের সঙ্গে

নাগরিকত্বের সমানাধিকারের দাবী উচ্চারিত হলো, প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলো রওলাট কমিটি গঠনের, সেন্সর সংবলিত প্রেস আইনের। যুদ্ধশেষে মুসলিম লীগেব কাছে অন্য একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তুরস্কের খলিফার ভবিষ্যৎ কি হবে?

তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানের সঙ্গে যোগ দেয়ার পরে ভারতে ব্রিটিশ সরকার মুসলিম নেতৃত্বকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছিল যে, যুদ্ধে পরাজিত হলেও তুরস্কের খলিফার প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করা হবে না। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে তুবস্কেব পরাজয়ের পরেই ব্রিটিশ শাসকবর্গ সে প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করতে শুরু করে। তুরস্কের খলিফার অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে মুসলিম লীগের দিল্লি অধিবেশনে প্রস্তাব উঠলে মিঃ জিন্না এর বিরুদ্ধ মতামত ব্যক্ত করেন; কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, খিলাফৎ সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত, অতএব লীগের সাংগঠনিক আওতায় তা পড়ে না। দিল্লির এই লীগ অধিবেশনে ডাঃ আনসারী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং মূল সভাপতি ছিলেন মিঃ এ. কে. ফজলুল হক।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি সিডিশন কমিটির রিপোর্ট (রওলাট আইন) জাস্টিস রওলাট ভারতবাসীকে নববর্ষের উপহার দিলেন, ভবিষ্যতের কর্মসূচীরও ইঙ্গিত দিলেন। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে মিত্রশক্তির শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতবাসীকে এগিয়ে আসতে গান্ধীজী, লোকমান্য তিলক প্রমুখ আপসকামী নেতৃবৃন্দ যে উদারতা, বিনয় ও আনুগত্য দেখিয়েছিলেন এটা হলো তার চমৎকার প্রতিদান, সহযোগিতার বিদ্রূপাত্মক অনমনীয় মনোভাবের প্রকাশ। বস্তুত এ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থেই ভাবতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে ব্যবহার করেছে, তাঁদের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করেছে পতনোন্মুখ ব্রিটিশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে, জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের এগিয়ে দিয়ে (মেসোপটেমিয়াতে) নিজ মূল ভূখণ্ডের ভেতরকার নাগরিকদের অসন্তোষ থেকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে , কিন্তু ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের প্রায় সব দিক দিয়ে বিধ্বস্ত ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য ছিল কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে স্থাপিত। ভাবতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকেরা খিলাফত আন্দোলনকে এড়িয়ে যেতে দিল্লি মুসলিম লীগ সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ডাঃ আনসারীর বক্তৃতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে।

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন এবং সন্ত্রাসমূলক ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত ও অনুসন্ধান করাই ছিলো প্রাথমিকভাবে রওলাট কমিটির উদ্দেশ্য, কিন্তু রিপোর্ট পেশ হলে দুটি খসড়াতেই দেখা গেল অন্যরকম : (ক) দি ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনাল ল' এমেণ্ডমেন্ট, বিল নম্বর ১, ১৯১৯ (খ) দি ক্রিমিনাল ল' এমার্জেন্সি পাওয়ার্স, বিল নম্বর ২, ১৯১৯। গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্না উভয়েই এই বিলের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে এগিয়ে আসেন। ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে কেন্দ্রীয় আইনসভাতে (সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এসেমব্লি) সরকারী সদস্যদের ভোটের জোরে খসড়া দুটি আইনে রূপান্তরিত হলে মিঃ জিন্না রওলাট আইনের প্রতিবাদে তাঁর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বড়লাটের কাছে চিঠি লেখেন; চিঠিতে ছিলো :

> এই বিল পাস করে আপনার সরকার মাত্র এক বছর পূর্বে যুদ্ধ সম্মেলনে ভারতবাসীর সাহায্য চেয়ে যেসব যুক্তি দিয়েছিল তার প্রতিটিকে সক্রিয়ভাবে নস্যাৎ করেছেন। গ্রেট ব্রিটেন যে সব নীতি সংবক্ষণার্থ যুদ্ধ করেছিল, সরকারেব এই পদক্ষেপের দ্বাবা নিষ্ঠুরভাবে

> তা পদদলিত হয়েছে। ন্যায় বিচাবের মূল নীতি উৎসাদিত হয়েছে এবং যখন রাষ্ট্রের সামনে কোনরকম সত্যকারের সঙ্কট নেই তখন জনসাধারণের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আর এটা করা হয়েছে এমন এক মাত্রাতিবিক্ত ন্যাক্কারজনক ও অযোগ্য আমলাতন্ত্রের দ্বারা যার না জনসাধারণের প্রতি কোন উত্তরদায়িত্ব আছে এবং না আছে যথার্থ জনমতের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ। ....সুতরাং এই বিল পাস করা এবং যেভাবে তা পাস করা হয়েছে তার প্রতিবাদে আমার ইস্তফা পাঠাচ্ছি। কারণ আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায় কাউন্সিলে থেকে আমি দেশের জনসাধারণেব কোন কাজে লাগব না। এছাড়া কাউন্সিলের সদস্য জনপ্রতিনিধিদের অভিমতের প্রতি যে সরকার এমন প্রচণ্ড তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে তার প্রতি সহযোগিতা করা কারও আত্মমর্যাদাব অনুকূল নয। কাউন্সিলেব বাইবে যে অগণিত জনসাধারণ রয়েছেন তাঁদেব মনোভাব এবং আবেগের মর্যাদা বক্ষার্থেও আমার এই সিদ্ধান্ত। আমার মতে যে সরকার শান্তিব সময়ে এ জাতীয় আইন প্রণয়ন করে সে আর নিজেকে সভ্য সরকার বলে দাবী করতে পারে না।....[১৬]

রওলাট আইনের প্রতিবাদে দেশে হরতালের ডাক দেয়া হয, প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ৩০শে মার্চ এই তারিখ নির্ধারিত হলেও পরবর্তীতে ৬ই এপ্রিল করা হয়, কিন্তু দিল্লিতে ৩০শে মার্চ তারিখেই হরতাল পালিত হলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন মিছিলের উপর গুলি চালালে সমগ্র দেশ এই কালাকানুনের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। ঠিক এমনি সময় ১৩ই এপ্রিলে জালিযানওয়ালাবাগে জেনারেল ডাযার সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালায়।

অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত হলে কর্মব্যস্ত ডঃ সয়ফুদ্দীন কিচলু ও ডাঃ সত্যপালকে পাঞ্জাবের ডেপুটি কমিশনাব নিজের বাসভবনে ডেকে নেন ১০ই এপ্রিল, কিন্তু জনসাধারণকে অতঃপর জানানো হলোনা বন্দী করে তাঁদের কোথায় রাখা হয়েছে; পাঞ্জাবের অমৃতসরে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে উত্তাল হলো। পুলিস গুলি চালালো অমৃতসরে। ক্ষিপ্ত, মারমুখী জনতা একটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, কয়েকজন ইংরেজও নিহত হলো। ১৩ই এপ্রিলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় উপস্থিত প্রায় কুড়ি হাজার লোকের উপর নির্বিচারে গুলি চালালো ব্রিটিশ সামরিক অফিসার জেনারেল ডায়ার। সরকারী ভাষা অনুসারে চারশত লোক নিহত এবং পনেরো শতাধিক আহত প্রচারিত হলেও সঠিক সংখ্যা আজও জানা যায়নি, তবে সরকারের দেয়া নিহত ও আহতের সংখ্যা যে সত্য ঘটনার তুলনায় খুবই সামান্য তা তখনকার নেতৃবৃন্দ সহজেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। লজ্জার এবং অমানবিকতার বিষয় হলো, জেনারেল ডায়ার আর ব্রিটিশের কর্মকর্তারা আহতদের কোনই চিকিৎসা করাননি, আহতরা প্রাথমিক সেবা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো জালিয়ানওয়ালাবাগকে, অমৃতসরকে; সাংবাদিক-রাজনৈতিক কর্মীদের উপর এলো নিষেধাজ্ঞা, পাঞ্জাবে সামরিক আইন দেয়া হলো, অত্যাচারের স্রোতে ভেসে গেল অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা, কসুর, গুজরাট, সংখ্যাতীত মানুষের মৃত্যু, নির্যাতন, লাঞ্ছনা এবং বিচ্ছিন্ন যোগাযোগের বিড়ম্বনা উপেক্ষা করে জনতার মধ্যে জেগে ওঠে নতুন শক্তি, উদাম, প্রেরণা। বিভিন্ন স্থানে মিছিল, প্রতিবাদ সভা হতে থাকে; এইসব মিছিল-সভাতেও প্রশাসকের নির্দেশে গুলি চলে। কলকাতায় নিহত হয়েছিল পুলিসের গুলিতে ৬ জন, আহতের সংখ্যা ১২। রবীন্দ্রনাথ মানবতার এই দুঃসহ পরিণতি দেখে ব্রিটিশের

দেয়া 'নাইট' খেতাব বর্জন করেন ; তিনি ভারতের ভাইসরয়কে প্রতিবাদ পত্র পাঠান—যার প্রতি ছত্রে ছত্রে কবি-হৃদয়ের বেদনার বাণী ছিলো উপস্থিত ; মানবতার বাণী যেন সেখানে প্রতি পদে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো। সময়ের ধারা বেয়ে জনতার উত্তাল আন্দোলন—প্রতিবাদ স্তিমিত হয়ে এলেও দেশের এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজীর অবস্থান, নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মুজফ্ফর আহ্মদ এভাবে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন :

> পাঞ্জাবে যা যা ঘটেছিল গান্ধীজী তাতে মনে দুঃখ পাননি একথা কেমন করে বলব? কিন্তু তিনি ঘোষণা করলেন যে সত্যাগ্রহের কথা বলে তিনি হিমালয়প্রমাণ ভুল করেছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর প্রস্তাবের ফলেই মন্দ লোকেরা স্থায়ী বিশৃংখলতা ঘটাতে পেরেছে। তিনি তাঁর সত্যাগ্রহেব প্রস্তাব তুলে নিলেন। পাঞ্জাবে কি ঘটে গেল, আর গান্ধীজী কি বললেন। তিনি জনসাধাবণকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলেন।[১৭]

সরকার রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড সি. এফ. এন্ড্রুজ সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন, একই কারণে গান্ধীজীও গ্রেপ্তার হন ; তবে গান্ধীজীকে বোম্বাইতে এনে বিনাশর্তে মুক্তি দেয়া হয়। 'গ্রেট ব্রিটেনে হাউজ অব কমন্স' জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত প্রথামতোই দুঃখ প্রকাশ করলেও 'হাউস অব লর্ডস' জেনারেল ডায়ারকে সমর্থন করে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদী আন্দোলনে ভারত আলোড়িত থাকা অবস্থাতেই ভারতীয় বাজনৈতিক নেতৃত্বকে তিনটি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। ফলশ্রুতি, প্রতিবাদী আন্দোলন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। (ক) বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির সহযোগী হিসেবে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে ভার্সাই চুক্তিতে মিত্রশক্তির বৃহৎ শক্তিগুলির তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাগ-বাটোয়ারার পরিকল্পনা। ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের যুদ্ধ চলাকালীন মুসলমান সম্প্রদায়কে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। (খ) জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ারের নেতৃত্বে হত্যাকাণ্ড ঘটার পরেও অমৃতসরে পূর্ব ঘোষিত কংগ্রেস অধিবেশন বসবে কিনা? (গ) মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সংস্কার আইন প্রয়োগে দেশীয় স্বার্থ কতখানি প্রতিষ্ঠিত হবে?

গ্রেট ব্রিটেন এবং মিত্রশক্তির উত্থাপিত ভার্সাই চুক্তি অনুসারে তুরস্কের খলিফার অস্তিত্ব বিপন্ন দেখে ভারতীয় মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ; বিশেষত যুদ্ধ চলাকালীন ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গ অঙ্গীকার করেছিল যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন তুরস্কের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষপ্রসূত পদক্ষেপ নেয়া হবে না। এ সময় জেল থেকে মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ মুসলিম সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ মুক্তি পান এবং তুরস্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা আবেগদীপ্ত ভাষণ দেন। সাধারাণ মুসলমানরা তুরস্কের খলিফার পরাজয়কে রাজনীতিগতভাবে চিহ্নিত না করে ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করে 'যুদ্ধং দেহি' মানসিকতায় তৈরী হয় ; দীর্ঘ আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে ব্রতী হলো।

দেশের সর্বত্র যখন প্রধান আলোচ্য বিষয় অমৃতসর, প্রতিরোধ ও বিপ্লবের প্রেরণা অমৃতসর, তখন অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হলেও বিপ্লবের বার্তা বহন করতে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়। কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় প্রতিপন্ন হলো ভারত সংস্কার আইনের প্রয়োগে

কতটুকু সুযোগ লাভ সম্ভব, যদিও চিত্তরঞ্জন দাশ পূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন সরকার গঠনের প্রস্তাব রাখেন কিন্তু গান্ধীজীর নমনীয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ সিদ্ধান্ত হিসেবে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ সংস্কার আইনটিকে সামনে রেখে 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও', এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবক চিত্তরঞ্জন দাশ এবং অন্যতম সমর্থক মিঃ জিন্না দেখলেন যে মূল কথা বা সিদ্ধান্ত দেয়ার গান্ধীজীই স্বত্বাধিকারী।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শেভার্সের সন্ধিশর্ত অনুসারে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে মিত্রশক্তির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা এবং খলিফার প্রতি আচরণের বিরুদ্ধে ভারতে 'খিলাফত আন্দোলন' সংঘটিত হয়। তুরস্ক এবং ভারতের পার্শ্ববর্তী আফগানিস্তানের সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

খলিফার শাসনকালেই তুরস্কের নবীন প্রজন্ম উপলব্ধি করতে পারে, বর্তমান সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে পশ্চিমী সম্প্রসারণবাদ বা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভবপব নয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের দিকেই তুরস্কে 'প্রাচীনধর্মী বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নবীনদের আন্দোলন ও বিদ্রোহ শুরু হয়। বিশ্বযুদ্ধের পরে কামাল পাশা তরুণ তুর্কীদের নেতৃত্ব দেন। আফগানিস্তানেও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে।

> ১৯০৭ সালে ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে 'পার্শিয়া তিব্বত ও আফগানিস্তান সম্পর্কিত একটি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়, যে চুক্তিতে জারের রুশ সরকার আফগানিস্তানের উপর তার সকল দাবী প্রত্যাহার করে এবং ভবিষ্যতে এদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ব্রিটিশ মধ্যস্থতার মাধ্যমে চালাতে স্বীকৃতি জানায়।[১৮]

১৯১৯-এ সিংহাসনে বসে আমীর আমানুল্লাহ্ ব্রিটিশের 'খবদরী' মেনে নিতে না পেরে সার্বভৌম রাষ্ট্রের ঘোষণা করেন। ততদিনে রাশিয়াতে জারের পতন ঘটেছে, নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়েছে; এবং সোভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ঘোষণা করেছে। আমীর আমানুল্লাহ্ সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আশা ব্যক্ত করলে মহামতি লেনিন ও কালিনিন আফগানিস্তানের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়ে বন্ধুত্বের প্রত্যাশায় দ্রুত জবাব দেন।

ভারতের মুসলিম নেতৃত্ব তুরস্ক, আফগানিস্তান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অসহযোগ প্রস্তাব এবং গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের প্রস্তাব খিলাফত আন্দোলনের প্রথম সভায় (বম্বে) গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০শে মে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য কলকাতায় বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করে। ১২ই জুলাই তারিখে কমরেড মুজফফ্র আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের যৌথ উদ্যোগে এবং এ. কে. ফজলুল হকের মালিকানায় 'নবযুগ' নামে সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ পায়; এই পত্রিকাটি ৬/৭ মাস জীবিত থাকলেও বিভিন্ন আন্দোলনের বিশ্লেষণে বিশেষত ভারতীয় মজুরদের সমস্যাবলীকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা। ২২শে জুন খিলাফত কমিটি বড়লাটকে যে চিঠি দেয় তার মূল বক্তব্য ছিলো তুবস্ক সম্পর্কিত অভিযোগগুলির আশু সমাধানের, নতুবা এই কমিটি ১লা আগস্ট থেকে আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে; অবশ্য গান্ধীজীও এই সময় খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মানসিকতা ব্যক্ত করলে সবকাব চবমপত্র দেন। ৪—৯ই সেপ্টেম্বব কলকাতায় কংগ্রেসেব বিশেষ

অধিবেশনে খিলাফতের সমর্থনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হলো, কিন্তু এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মিঃ জিন্না সঙ্গে পেলেন এ্যানি বেসান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে। ৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতাতে মুসলিম লীগেরও বিশেষ অধিবেশন বসে, মুসলমি লীগের সভাপতি হিসেবে এই অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন :

> দেশবাসীর সম্মুখে খিলাফৎ সম্মেলনের সমর্থন নিয়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগের কর্মসূচী উপস্থিত করেছেন। এবারে আপনাদেরই স্থির করতে হবে যে আপনারা ঐ কর্মসূচীর মূলনীতি অনুমোদন করেন কি না? আর করলে বিস্তারিতভাবে এর কার্যক্রম স্বীকার করেন কি না তাও ভেবে দেখতে হবে। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেবার সময় আপনাদের প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগত আঘাত পড়বে। তাই একমাত্র আপনাদের উপরই কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে নিজ নিজ শক্তির পরিমাপ করার এবং প্রশ্নটির সব দিক নিয়ে চিন্তা করার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে। তবে একবার যদি আপনারা সামনের দিকে কুচকাওয়াজ করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে কোন অবস্থাতেই যেন আর পশ্চাদপসরণ না করেন (না, না, কখনই না)....আমি আর আপনাদের আটকে রাখতে চাই না। তবে বসে পড়ার পূর্বে কেবল এটুকু বলতে চাই যে মনে রাখবেন—সম্মিলিত হলে আমরা খাড়া থাকব আর বিভাজিত হলে ধরাশায়ী হব (সাধু, সাধু এবং করতালি)।[১৯]

প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করে গান্ধীজী বড়লাটকে চিঠি দিয়েছিলেন কেন? কেনই-বা কংগ্রেস কলকাতা অধিবেশনে খিলাফতকে সমর্থন করে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো? গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, লাজপত রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মিঃ জিন্না এভাবে বক্তব্য রাখলেন কেন? মিঃ জিন্না কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে খিলাফতের সমর্থন সূচক অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবকে তো সমর্থন করেননি? তবে পক্ষে-বিপক্ষের মিশ্র অনুভূতি সম্পন্ন বক্তব্য এখানে রাখলেন কেন?

মন্টেগু-চেমসফোর্ডের প্রস্তাব আইনে রূপান্তরিত হয়ে শাসন সংস্কাররূপে বাস্তবে প্রযোজ্য হতে গেলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিহেতু প্রত্যক্ষ নির্বাচনেও কংগ্রেস খুশি হতে পারেনি, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলো এর বিরোধিতা করেও কোনো সুফল ফলবে না। তবে কংগ্রেসের অসন্তোষ থেকেই গেল। মহাত্মা গান্ধীও বিক্ষুব্ধ জনতার সর্বজনগ্রাহ্য পথ খুঁজতে তৎপর ছিলেন; এবং নিজের জন্য নেতৃত্বের প্রধানতম আসনটিকে অটুট রাখতে তৎপর ছিলেন, খিলাফত আন্দোলন তাঁকে সেই সুযোগ এনে দেয়—হিন্দু-বর্ণহিন্দুরা নিমরাজি থাকলেও ভারতের বৃহত্তর বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগকে এর মাধ্যমে গান্ধীজী বশীভূত করার প্রচেষ্টা নেন। মিঃ জিন্না হোমরুলের সভাপতি থাকা অবস্থায় এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বালগঙ্গাধর তিলকের ঘোষণা-পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী তাঁর নিজের মতামত এবং বিশ্বাসের কথা উপস্থাপন করলে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম থেকে যাঁরা হোমরুলে ছিলেন, বিশেষত জয়া কর, যমুনা দাস, মঙ্গল দাস, দ্বারকা দাসদের সঙ্গে মিঃ জিন্না এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেননি। নাম পরিবর্তনের প্রতিবাদ **১০৯ বনাম**

৪২ ভোটে বাতিল হলে গান্ধীজীর ইচ্ছে অনুসারে 'হোমরুল লীগ'-এর নাম হয় স্বরাজ্য সভা। সার্বিকভাবেই প্রতিবাদ করে মিঃ জিন্না অনুগামীদের নিয়ে হোমরুল লীগ (স্বরাজ্য সভা) থেকে পদত্যাগ করেন। এর ফলে কংগ্রেস ও হোমরুল লীগ উভয় ক্ষেত্রেই গান্ধীজী মিঃ জিন্নাকে রাজনীতির সূক্ষ্ম চালে পরাজিত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এখান থেকেই গান্ধীজী ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করে আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসেবে জনসাধারণের কাছে গণ্য হলেন। এর মাধ্যমে তিনিই প্রথমে ধর্ম আর রাজনীতিকে এক প্রাঙ্গণে সমবেত করলেন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনটা মুখ্য হলেও সাধারণ মুসলমানদের কাছে তার থেকে বেশী ছিল ধর্মীয় চেতনায় সংগ্রামকে, অসহযোগ আন্দোলনকে গতি দিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফার সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রাখা; তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। গান্ধীজী জেনেশুনেই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রয়াসে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে টেনে আনলেন, পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু দুই তত্ত্বকে একই হালে জুড়ে আন্দোলনের জমি চাষ করতে এগোলেন; বর্তমান ফললাভের আশায় ভবিষ্যতের অবস্থান সম্পর্কে নিজের দূরদৃষ্টিকে নিজেই দূরে সরিয়ে রাখলেন। কংগ্রেস নীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে নেতৃত্বে ভর দিয়ে—সমাজ বিশ্লেষণে পুঁজিবাদ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমতায় টেনে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসে বাস্তবমুখী পন্থা অবলম্বন করতে পারেনি। গান্ধীজীও তৎকালীন আন্দোলনের মাধ্যমে রক্তাক্ত বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েও বিপ্লবকে—স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচেষ্টাকে উত্তরণ ঘটিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মানসিকতায় ছিলেন না। কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে লাজপত রায়ের বক্তব্য বিতর্কিত হলেও সে কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু সমসাময়িক কালে ভারতে বিভিন্ন ফ্রন্টে নানা আন্দোলন চলে, বিশেষত শ্রমিক আন্দোলনের কথা স্মর্তব্য। শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘটে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিরা ভবিষ্যত ভাগ্য নির্ধারণে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। শুধু লাজপত রায় কেন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে ছিলো তাঁরা রক্তাক্ত বা রক্তহীন যে কোনো বিপ্লবে শঙ্কিত হবেন। কেন না সামন্ত প্রভুদের আদলে গঠিত যে নেতৃত্ব তা কখনোই শ্রেণীচেতনার মাধ্যমে জনসাধারণের ইচ্ছেকে রূপ দিতে, বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে পারে না । অন্তত ভারতেব রাজনীতিতে এ ধরনের নেতৃত্বের প্রকাশ তখনও ঘটেনি, যারা উভয়ের ন্যূনতম সমঝোতার মাধ্যমে আন্দোলন-বিপ্লবে পরাধীনতা এবং অর্থনৈতিক শোষণ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং শোষণ মুক্তির অঙ্গীকারে জনতার সঙ্গে মিশে যাবেন। মূলত এ সময়ে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা রাজনীতি ও আন্দোলনে ব্যক্তিগত পরিচিতি, স্বীয় শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত হতেন; যার জন্য কংগ্রেস-মুসলিম লীগ নেতৃত্ব জনসাধারণের সঙ্গে আন্দোলন করেছেন কিন্তু জনসাধারণের ইচ্ছের সঙ্গে, আদর্শ ও উদ্দীপনার সঙ্গে নিত্যদিনের জীবনযাত্রায় নিজেদের একাত্ম করে তাদের বাস্তব সমস্যাবলীর ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি (বর্তমানেও যে এটা হয়েছে তা নয়, তবে জনতার কাফেলায় সংগ্রামী নেতৃত্বের স্পন্দন বেড়েছে।) সেই সময় মিঃ জিন্নাকে রাজনৈতিক বক্তব্য ও আচরণে স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার মনে হলেও নেতৃত্বের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ভিন্নমুখী করে তুলেছিল। ২৮শে ডিসেম্বর নাগপুর কংগ্রেসে মিঃ জিন্নার বক্তব্যকে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ·

> অভিজাত এবং সংবিধাননিষ্ঠ জিন্না ও তাঁর নেতৃত্বে প্রভাবিত মুষ্টিমেয় কিছু নেতাব 'গেঁয়ো মানুষদের ক্ষেপানোর এই মেঠো কর্মসূচী'র সাফল্যে গভীর সন্দেহ। জিন্না তাই বিধিবদ্ধভাবে অসহযোগের বিরোধিতা করলেন। তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাবিত নূতন সংবিধানের লক্ষ্য— শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বরাজ অর্জনের আদর্শেও অবিশ্বাসী। কারণ তাঁর মতে রক্তপাত ছাড়া স্বাধীনতা আসবে না এবং দেশবাসীর যেহেতু হিংসার শরণ নেবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটাই নেই, তাই বর্তমান অবস্থায় নির্ভেজাল স্বাধীনতার কথা বলা হঠকারী ব্যাপার। তিনি সেইজন্য মালব্যজীর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতার সমর্থক।[২৮]

মিঃ জিন্নার চরিত্রে একটা বিশেষ দিক এখানে প্রকাশ পেলেও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর টানা-পোড়েনের এটা ছিল বিশেষ সময় ; কেন না মুসলিম নেতৃত্বের একাংশকেও এসময় গান্ধীজী কাছে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্নার পক্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে নিজের অবস্থান ২/৩/৪ নম্বরে পিছিয়ে নেয়া সম্ভব ছিলো না ; নেতৃত্বের সংঘর্ষ এক্ষেত্রে ছিলো অবশ্যম্ভাবী। তবে মিঃ জিন্নার বক্তব্য রূঢ় হলেও বাস্তব সত্য ছিলো ; 'দেশবাসী' বলতে তিনি নেতৃত্বকেই মূলত বুঝিয়েছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর শুধু ব্যক্তিত্বেব সংঘাতই নয়, ভবিষ্যৎ কর্মসূচী এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পার্থক্যজনিত কারণে উভয়ের ব্যবধানও সূচিত হচ্ছিলো। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে মিঃ জিন্না সুষ্ঠু সমাজ বিকাশে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, দেশের স্বাধীনতার পক্ষে গ্রহণীয় মনে করেননি। গান্ধীজীর সঙ্গে মিঃ জিন্নার বিরোধে প্রায় বিশ বছরের কংগ্রেসের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক এ সময়ে তাঁর শেষ হয়ে যায়। গান্ধীজীও যে তখন অনেকটাই আবেগপ্রবণ এবং ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে সমাজ ও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অ-সচেতন ছিলেন তা তাঁর কর্মকাণ্ডের একাংশের বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। নীলমণি মুখোপাধ্যায় বলেন :

> কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে লাজপত রায় সেই সময়কে এক বৈপ্লবিক যুগ বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু তিনি এ কথাও বলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কার অনুযায়ী বিপ্লবে আগ্রহী নন। এর ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাব মধ্যে একটি পরস্পব বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। গণবিপ্লবের কথা ভাবা হচ্ছে অথচ যাঁরা তাব নেতৃত্ব দেবেন বিপ্লবে তাঁদের অনীহার কথাও ঘোষিত হচ্ছে।
>
> হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচেষ্টা ছিল এই পর্বের সমচেয়ে বড় ঘটনা। একদা গোখলে বলেছিলেন যে হিন্দু, মুসলমান এবং ব্রিটিশ ভারতের এই রাজনৈতিক ত্রিভুজের দুই বাহু মিলিতভাবে সর্বদাই তৃতীয় বাহুর চেয়ে বৃহত্তর। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই পরম শুভ লগ্নেও কিন্তু কিছু কিছু উদ্বেগজনক ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। গান্ধীজির 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ৮ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তার পরিচয় মেলে। প্রশ্ন উঠেছিল : ব্যক্তি বিশেষের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যদি বাঞ্ছনীয় না হয় তাহলে কোন জিগির গ্রহণ করা হবে? গান্ধীজির মতে 'আল্লা হো আকবর', 'বন্দেমাতরম,' এবং 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়' এই তিনটি জিগির জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের গ্রহণযোগ্য ছিল। এর মধ্যে আবার তৃতীয় জিগিরটির সময়োচিত তাৎপর্য ছিল সমধিক। গান্ধীজি ভেবেছিলেন এর দ্বারাই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হৃদয়গত মিলন সাধিত হতে পারবে। আপেক্ষিকভাবে বিষয়টির তত গুরুত্ব না থাকলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির নির্দেশ গৃহীত হয়নি। হিন্দু জনসাধারণ দীর্ঘকালের সংস্কারবশে 'আল্লা হো আকবর' জিগির দিতে মানসিক বাধা বোধ করেছিলেন যেমন মুসলমানদেরও 'বন্দেমাতরম'

> ধ্বনি সম্বন্ধে অনীহা ছিল। হয়তো এই সমস্যার সমাধান ছিল সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাইকে সামিল করে গণসংগ্রাম আরম্ভ করার চেষ্টা করা। বহুকাল পরে এক বিশেষ পরিবেশে সুভাষচন্দ্র এটা সম্ভব করতে পেরেছিলেন তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে।[২১]

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় 'গণসংগ্রাম'-এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং হিন্দু-মুসলমানের যৌথ কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'কে তুলে ধরেছেন, কিন্তু গান্ধীজীর 'অসহযোগ' আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের—উভয় সম্প্রদায়ের *সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে দূরীকরণে গান্ধীজীর কোনো সার্থক প্রয়াসকে তুলে ধরেননি।* কেন না গান্ধীজীর পক্ষে সেটা করা সম্ভব ছিলো না, তিনি তেমন কোনো যৌক্তিক প্রয়াসও চালাননি; মিলনের ক্ষেত্র যেখানে সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ বা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিতে-সংকীর্ণতায় রুদ্ধ সেখানে এটা সম্ভব ছিলো না। ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের অবস্থানে পরবর্তীতে এ বিষয়টি আমরা দেখতে পাবো। পরবর্তীতে 'হরিজন' বলতে গান্ধীজীর আর এক প্রয়াস বা কর্মপদ্ধতি যা হাস্যকর, কেন না শ্রেণীভিত্তিক না হয়ে আবেগসর্বস্বতার মোড়কে ধর্মীয় দৃষ্টিতে পশ্চাৎপদতাকে তিনি অবলম্বন করেছিলেন। বাস্তবিকপক্ষে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রেণীচরিত্রের উন্মেষ ঘটিয়ে যদি তিনি গণআন্দোলন পরিচালনা করতেন তবে হয়তো মিঃ জিন্নার 'হৃদকম্প' উপস্থিত হতো না এবং ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস আমরা অন্যভাবে দেখতে পেতাম; স্বাধীন ভারতের মানচিত্রও হয়তো এভাবে হতো না। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী অসহযোগের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনতাকে আলোড়িত করতে পেরেছিলেন, আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহেণ উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী বৃহত্তর জনতার শ্রেণীগত অবস্থানে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি ও সহমর্মিতায় নেতৃত্ব দিতে অপারগ ছিলেন ; কেন না তাদের আন্দোলনে—অংশগ্রহণে কোথাও ব্যক্তিজীবনের জীবনধারণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো না—যা ছিলো তা তো নেতিবাচক দিককেই তুলে ধরেছে। কিন্তু হতে পারতো—

নীতি : মূল নেতৃত্ব > নীতি ব্যাখ্যা : প্রয়োগ ও নেতৃত্ব > আন্দোলনকারী সাধারণ মানুষ : নীতি প্রয়োগ > চেতনা সম্প্রসারণ বা চেতনার বিকাশ।

তবে যা হলো—

মূল নেতা (গান্ধীজী) : নীতি অস্পষ্ট > কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদ বিশ্লেষণ > প্রয়োগ নেই : নেতৃত্ব দোদুল্যমান > সাধারণ মানুষ মূল নেতৃত্বে বিশ্বাসী : নীতি সম্পর্কে সংশয়।

তাই দেখা যায় সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলনরত মানুষ সংকল্প গ্রহণ করে—উদ্দাম হয়ে ওঠে কিন্তু কার্যসিদ্ধির জন্য সংশপ্তক হতে পারে না। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে কংগ্রেসের, গান্ধীজীর নির্দেশ ছিলো সরকারের অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ থেকে নিজেদের সরিয়ে আনার, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে সরকারী চাকুরি না নেয়া, সরকারকে সাহায্য করার জন্য আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা এবং বিদেশী পণ্য সামগ্রী বর্জন। কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে নীতির কিছু বদল ঘটে, শান্তিপূর্ণ স্বরাজ্যের কথা উল্লেখ হলেও, সংগঠনে শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হলেও সমসাময়িক শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষের বিষয় কিন্তু উত্থাপিত হলো না। তাদের ধর্মঘট করার অধিকার

সম্পর্কিত কোনো বক্তব্যই এলো না, কৃষকদের রাজস্ব এবং ঋণভারের কথাও তেমনটি আলোচিত হলো না। মোদ্দা কথা হলো, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনধারণ বিষয়টি ছুঁয়ে যাওয়া হলেও কার্যত এড়িয়ে যাওয়াই হলো।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবরে উজবেকিস্তানের তাশখন্দ শহরে 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামক বাড়িতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সূচনা-পর্বে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গদেশের একসময়কার বিপ্লববাদী অনুশীলন দলের (ব্যারিস্টার মিস্টার পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীন) সক্রিয় সদস্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (আমেরিকার স্টনফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুলিসের ঝামেলা থেকে রক্ষাব জন্য ধনগোপাল মুখোপাধায় যাঁর নামকরণ করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, সংক্ষেপে এম. এন. রায়)। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উজবেকিস্তান যাওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের অস্ত্রেব জন্য দু'বার জাকার্তার বাটাভিয়ায় গিয়েছিলেন, ১৯১৫-এর পরে দেশে না ফিরে তিনি উজবেকিস্তান হয়ে পরবর্তীতে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়ায় শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক আদর্শে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এর প্রভাব পড়ে ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীগণের মধ্যে । এম. এন. রায়ও সম্ভবত এভাবেই এবং বিদুষী স্ত্রী এভেলিন ট্রেন্ট (Evelyn Trent)-এর সান্নিধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে আকৃষ্ট হন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে মেক্‌শিকোতে রুশ কমিউনিস্ট নেতা মাইকেল বরোদিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়, মাইকেল বরোদিনের কাছেই তিনি প্রথম মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং মাইকেল বরোদিনের সম্মতির মাধ্যমেই মেক্‌শিকো কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে এম. এন. রায় এগিয়ে আসেন ; এবং মেক্‌শিকোর প্রতিনিধি হয়েই তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে মস্কো যান। কমিউনিস্ট ইন্টারনাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত একজিকিউটিভ কমিটির দেয়া ক্ষমতা সম্পন্ন সাব কমিটি 'স্মল বুরো'-তে তিনি কো-অপ্টের মাধ্যমে সদস্যপদ পান। এম. এন. রায় অতঃপর সোভিয়েত সাহায্য নিয়ে তুর্কিস্তানে পৌছে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ভারতের জন্য মুক্তিফৌজ গঠন করতে চেয়েছিলেন এবং তাশখন্দের মিলিটারি স্কুলে প্রবাসী ভারতীয়দের (প্রধানত মুহাজিরদের) সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী করতে তৎপর হন। তবে আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে নবগঠিত ভারতের মুক্তিফৌজদের সশস্ত্র ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা আফগানিস্তান সরকারের প্রধান আমানউল্লাহ্ মেনে ন' নিলে এম. এন. রায়ের এই পর্বের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের রীডার ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিক উজবেকিস্তানের লেনিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ভারতের মুহাজির সম্পর্কিত কৌতূহলে উজবেকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুহাফিজখানায় (Archives) F. 60. ed. No. 724. L.–1–4 নম্বরের একটি নথি পান, এই নথিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের রূপটি দেখা যায়।[২২]

"Formed the Indian Communist Party in Tashkent on Oct. 17, 1920, with the following members :

1. M. N. Roy
2. Evelina Trent Roy

3. A Mukherjee
4. Rosa Fitingof
5. Mohd. Ali (Ahmed Hasan)
6. Mohd. Shafiq Siddiqui and
7. Acharya, M. Prativadi Bayankar

The period of probation for candidate members would be three months.

Mohd. Shafiq is elected Secretary.

The Indian Communist Party adopts the principles proclaimed by the Third International and undertakes to work out a programme adapted to the Indian condition.

(Sd.) President : M. Acharya

(Sd.) M. N. Roy, Secretary''[২৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তির, বিশেষত ব্রিটিশের কঠোর মনোভাব ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে; কেন না তুরস্কের সুলতান মুসলিম জাহানের খলিফা, মুসলমানদের পবিত্র ধর্মস্থানগুলির বা তীর্থস্থানগুলির রক্ষকও বটে। ব্রিটিশের বিরোধী মনোভাবের জন্য, কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য সুলতানের রাজ্যচ্যুতি ঘটলে বা সুলতানের সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হলে তীর্থস্থানের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব কতখানি পালিত হবে সে বিষয়ে ভারতের মুসলমান সমাজ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ভারত সচিব মিঃ মন্টেগু এবং প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের নিকট ভারতীয় মুসলিম সমাজের দূত উপস্থিত হয়েও কোনো নিরাপত্তা বা আশ্বাস বাক্য না পেলে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করতে পারলে ব্রিটিশকে তুরস্কের খলিফার প্রতি কঠিন মনোভাব থেকে সরানো সম্ভব হলেও হতে পারে। মহাত্মা গান্ধী এই সময় অসহযোগ এবং আত্মশক্তির উপর নির্ভর করতে ভারতের মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানান এবং তুরস্কের ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলির পবিত্রতা রক্ষায় তাঁর সহযোগিতার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন।

১৪ই মে ১৯২০ সেভার্স সন্ধির শর্ত প্রকাশিত হলে অটোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশের মনোভাব ধরা পড়ে। তুর্কী সুলতান নজরবন্দী হয়ে রইলেন, তাঁর সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও নানা অছিলায় খণ্ডিত করার প্রচেষ্টা হলো; শুধুমাত্র এশিয়া মাইনরে অবস্থিত তুর্কীদের মূল বাসভূমিটুকুই সুলতানের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করে ব্রিটিশ ও ফরাসীরা ম্যাণ্ডেটের মাধ্যমে ভাগাভাগি করে নেয় সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশ। শান্তি-শৃঙ্খলার নামে মিত্রশক্তির প্রতিপত্তি উপস্থিত করে কার্যত সুলতানকে হীনবল করার প্রচেষ্টায় ভারতীয় মুসলমান সমাজ শঙ্কিত হলো এবং এলাহাবাদে নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতিতে গান্ধীজীর পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবাদে তারা আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। বস্তুত গান্ধীজীও হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব ও অসহযোগের কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ করে তাদের সহায় হলেন। এখান থেকেই খিলাফত আন্দোলনের ব্যাপ্তি, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গঠনের প্রচেষ্টা, ব্রিটিশ শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন-সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব সৃষ্টির প্রয়াস পান গান্ধীজী। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই :

> ভারতে অসহযোগ আন্দোলন সেভার্স সন্ধি নাকচে এবং মিত্রশক্তি ও তুর্কীর মধ্যে লজান সন্ধি সংসাধনে বিশেষ সহায়তা করেছে।[২৮]

১৯২০-এর ১লা থেকে ৩রা জুন এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সভায় অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতাদের উপস্থিতিতে 'স্বরাজ' এসে উপস্থিত হয়। ১৯১৯-১৯২০তে ভারতে যেসব ঘটনা ঘটেছিল তা জনমনে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবকে তুঙ্গে পৌঁছে দেয়, রওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড—এই হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মুকুন্দ রামরাও জয়াকর, ফজলুল হক ও আব্বাস তায়েবজী স্বাক্ষরযুক্ত কংগ্রেস সাব কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ। হাউস অব লর্ডস্-এ ডায়ারকে পৌনঃপুনিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ; পাঞ্জাবের সামরিক আইন ও সাধারণ জনতার উপর অত্যাচার, দ্বৈত শাসনের পরিকল্পনা, সর্বোপরি ইংলণ্ডের মানুষদের ডায়ারের প্রতি সমর্থন দেশবাসীর কাছে মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য সওয়াল বলে মনে হয়। এরকম একটা পরিস্থিতিতে প্রতিবাদী ভাষা শুধু খিলাফত আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের উপরই বর্তায় না একথা দেশবাসী আন্তরিকভাবেই বুঝতে পারে। কাউন্সিল নির্বাচন বিষয়টি এসে গেলেও জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতারা সচেতন হলেন, অনেকেরই 'মোহমুক্তি' ঘটল।

সেপ্টেম্বরের ৪-৯ কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে নীতি বা আদর্শগতভাবে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনকে নিজের বলে গ্রহণ করে এবং বিদেশী জিনিস—বিশেষত বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ করে দেশী খাদির উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ, দেশের আদালত, কাউন্সিল, সরকারী বিদ্যালয় বয়কটের ডাক দেয়া হয়। আর জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা এবং উৎসাহ দান সম্পর্কে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশ কলকাতার বিশেষ অধিবেশনের মতো বিরোধীর ভূমিকায় না থেকে নিজেই কেন্দ্রীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। অনেকেই অনুমান করেন যে, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত অনুরোধই চিত্তরঞ্জন দাশের মত পরিবর্তনের প্রধান কারণ। এই অধিবেশনে অসহযোগ সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মূলকে বিপান চন্দ্র এভাবে উপস্থিত করেছেন :

> অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে ছিল সরকারী খেতাব ও সম্মান ত্যাগ, সবকার অনুমোদিত স্কুল ও কলেজ, আদালত, বিদেশী কাপড় বয়কট। প্রয়োজনে সবকারী চাকরি থেকে ইস্তফা এবং কর না দেওয়া সমেত ব্যাপকভাবে আইন অমান্যও হতে পারে। ঠিক হল জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠায়, বিরোধ মীমাংসার জন্যে পঞ্চায়েত গঠনে, চরকায় সূতা কাটতে ও তাঁত বুনতে জনগণকে উৎসাহিত করা হবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখার, অস্পৃশ্যতা দূর করার ও অহিংসার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্যে আহ্বান জানানো হল জনগণের কাছে। গান্ধীজী প্রতিশ্রুতি দিলেন এই কর্মসূচী যদি পুরোপুরি কার্যকর করা যায় তা হলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে। এভাবে, নাগপুর অধিবেশন সংবিধান-বহির্ভূত গণআন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসকে দায়বদ্ধ করল।[২৯]

গান্ধীজী বা কংগ্রেসের এই অসহযোগ নামের গণ-আন্দোলনের কর্মসূচীর পশ্চাৎপট

হিসেবে কয়েকটি কারণের উল্লেখ করেছেন প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় :

(১) কুখ্যাত রওলাট আইনের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের জনবিরোধ চরিত্রটি জনসমক্ষে প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং এই নিষ্ঠুর আইনের প্রতিবাদে সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত হয়।

(২) ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্মম হত্যাকাণ্ড সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

(৩) ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে নরমপন্থীগণ জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করায় কংগ্রেসে পুনরায় চরমপন্থী গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হয়ে ওঠে। ফলে কংগ্রেসের পক্ষে গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়া সহজতর হল।

(৪) খিলাফত প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, তা মুসলমান জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে এবং এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যেব ভিত্তিতে এক প্রবল গণ-আন্দোলনের ডাক দিলেন যার ফলে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়।[২৬]

শ্রী চট্টোপাধ্যায় কারণগুলি উল্লেখের পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীকে ইতিবাচক (Positive) ও নেতিবাচক (Negative) এই দ্বিবিধকে এভাবে তুলে ধরেছেন :

ইতিবাচক বা গঠনমূলক (Constructive) কর্মসূচী স্বদেশী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ; এগুলি হল—দেশী সুতায় বস্ত্রবয়ন অর্থাৎ চরকা ও তাঁতের ব্যবস্থায়, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, হিন্দু-মুসলমান সংহতি ও তিলক স্মৃতি তহবিলের জন্য এক কোটি টাকা চাঁদা আদায়।

গঠনাত্মক কর্মসূচী অনুসারে ঠিক হল—জনগণের মধ্যে কুড়ি লক্ষ চরকা বিতরণ করতে হবে এবং অসহযোগ কর্মসূচী রূপায়ণের এক কোটি সদস্যের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

অসহযোগ আন্দোলনের নেতিবাচক কর্মসূচীব প্রধান বিষয়গুলি হল :

(১) সরকারী আইন-আদালত পরিহার করা।
(২) সরকারী স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনগুলি বর্জন।
(৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন বয়কট।
(৪) সরকারী পদক ও খেতাব প্রত্যর্পণ এবং সকল সরকারী অনুষ্ঠান বর্জন।
(৫) মদ্যপান নিবারণ।
(৬) ব্রিটিশ বস্ত্র বর্জন।

নেতিবাচক কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য কয়েকটি পরিপূরক গঠনমূলক কর্মসূচী গৃহীত হয়। এইগুলি হল—সরকারী আদালতের পরিবর্তে জনগণের সালিসি বোর্ড গঠন, জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, চরকার বহুল ব্যবহার গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন।[২৭]

কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (৪-৯ই সেপ্টেম্বর) অসহযোগের প্রস্তাব সম্পর্কে এ্যানি বেসান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অন্যান্যদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন না, বরং বলা যায় তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ছিল অসহযোগের বিরুদ্ধেই। মিঃ জিন্নাও বিশ্বাস করতেন যে সাংবিধানিক পথে বা রক্তপাতহীন অসহযোগে ভারতে স্বাধীনতা আসবে না, বর্তমানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

মধ্যেই স্বাধীনতার সমর্থক হয়ে উঠতে হবে। যদিও মিঃ জিন্না ৭ই সেপ্টেম্বরে লীগের বিশেষ অধিবেশনে লীগ নেতৃত্ব ব্যতীত মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, লাজপৎ রায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সামনে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেন যে অসহযোগের মূল কর্মসূচী কি সে বিষয়ে নেতৃত্বকে নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের শক্তিরও সমীক্ষা করা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু নাগপুরের কংগ্রেসে মিঃ জিন্না অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দৃঢ় বক্তব্য উপস্থিত করেন, বিধিবদ্ধভাবেই তিনি অসহযোগের বিরোধিতা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন না শান্তিপূর্ণ বৈধ উপায়ে 'স্বরাজ' আসবে, যদিও কংগ্রেসের এটাই আদর্শ ও লক্ষ্য। মিঃ জিন্নার অভিমত, এর ফলে দেশকে এক চরম সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়া হবে এবং গান্ধীজীকে তিনি সংগঠনে বিভাজনের জন্য দায়ী করেন। বলা চলে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন থেকেই মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে নিজের এতদিনের সম্পর্কের ছেদ টানলেন। নেতৃত্ব এবং আদর্শের সংঘাতে গান্ধীজী বনাম মিঃ জিন্নার এখান থেকেই মেরুকরণ চিহ্নিত হয়।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের জের টেনেই ১৯২১-এ আমরা দেখি অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর অবিসংবাদিত একক নেতৃত্ব। দেশের আপামর জনতা গান্ধীজীকে নেতৃত্বে বরণ করেছেন, তাদের বিশ্বাস গান্ধীজীর নেতৃত্বে এক বছরের মধ্যেই ভারত স্বরাজ লাভ করতে সক্ষম হবে।

৬ই জানুয়ারি (১৯২১) কৃষক আন্দোলনের একটি স্মরণীয় দিন। সংযুক্ত প্রদেশের রায়বেরলিতে অনুষ্ঠিত কৃষক আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে ৭জন নিহত ও বহু আহত হয়। ফলশ্রুতি, ফেব্রুয়ারি মাসে প্রায় সত্তর হাজার কৃষক অসহযোগ আন্দোলনে নিজেদের সামিল করে। খিলাফত কমিটির করাচী অধিবেশনে মুসলমানদের অতীতের দাবিদাওয়াগুলির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়—প্রস্তাবও এই বিষয়ে গৃহীত হয়। আশা করা হয়েছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে 'স্বরাজ' বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে, কিন্তু প্যান-ইসলামী সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনাই প্রস্তাবে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু তাহলেও গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে ধর্মঘটী জনতা মিছিল করে।

অসহযোগ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিদেশী দ্রব্য বর্জনে বিশেষত বস্ত্র বর্জনে ২১শে জুলাই বম্বেতে বিদেশী কাপড়ে আগুন জ্বালানো হয় গান্ধীজীর উপস্থিতিতে। বোম্বাইতে জুলাই মাসের কংগ্রেস কমিটির সভায় বিদেশী কাপড় বর্জনর তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর করা হয়। বিদেশী কাপড় বর্জনের আহ্বানের ফলে বিদেশ থেকে বস্ত্র আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, ১৯২০-২১-এ আমদানির পরিমাণ ছিল ১০২ কোটি টাকা, ১৯২১-২২-এ এই অঙ্কটা নেমে ৫৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অক্টোবর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি তবুও বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগে আন্দোলনের অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি মনে করে। কিন্তু সাধারণ জনমানসে এই বলে প্রতীতি জন্মে যে, অসহযোগের সবগুলি ধারার মধ্যে বিদেশী বস্ত্র বর্জনই সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করেছিল।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিদেশী বস্ত্র বর্জনের শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর স্থির হলে এবং বিদেশী কাপড় পোড়ানো বা তুর্কী সৈন্যদের জন্য পশ্চিম

এশিয়াতে পাঠানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিঠলভাই প্যাটেল প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিগণ প্রতিবাদ জানান। খদ্দরের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তা দেশের জনগণের চাহিদার তুলনায় ছিল খুবই সামান্য ; পক্ষান্তরে বিদেশী কাপড়ে বহ্নি-উৎসবে দেশে কাপড়ের অভাব হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় লালিত বহ্নি-উৎসবে বা বিদেশী বস্ত্র বর্জনে দেশীয় পুঁজিপতিদের একাংশ লাভবান হলো, তাদের ভাণ্ডার থেকেই চাহিদাহেতু সামগ্রিক জোগানের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে তাদের লভ্যাংশের মাত্রা স্বাভাবিক থেকে বৃদ্ধি পেল বহু গুণ। যদিও ১৯২০-এর শেষ দিকে দেশীয় বয়ন শিল্পের শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে—শ্রম-মজুরি সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে ; বাংলা ও গুজরাটে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে এই সময় অনেক শ্রম-দিবস নষ্ট হয়। গান্ধীজী এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াননি, এমন কি এই ধর্মঘটকে সমর্থনও জানাননি; কেননা তিনি পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে পারস্পরিক অবস্থান নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী হয়েও রাজনৈতিক ধর্মঘটের বিরুদ্ধে ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেস তহবিলের সংখ্যাগত মাত্রা বৃদ্ধির জন্য দেশীয় মিল মালিক, ছোট-বড় জোতদার জমিদার, ব্যবসাদারদের সাহচর্য ছিল কংগ্রেসের প্রধান অবলম্বন। যদিও বলা চলে, ১৯২০-এর শেষার্ধে এসে কংগ্রেস শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত, দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত 'বাবু' শ্রেণীর কবল থেকে জনগণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে শুরু করে, যদিও সাধারণ মানুষ বিক্ষিপ্ত, সাংগঠনিক রূপরেখাহীন, কিন্তু পরিবর্তনমুখী উন্মাদনায় অস্থির।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন মূলত ১৯২১-২২-এর দুটি বছর ঘিরেই ভারতের সমাজবিন্যাসে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়ার নিদর্শন রেখে যায়। অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেস তথা গান্ধীজীর আন্দোলনে-আহ্বানে পুঁজিপতি ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকজনের অংশগ্রহণ এবং আত্মত্যাগ ছিলো নামমাত্র। সরকারের দেয়া ৫১৮৬টি খেতাবের মধ্যে মাত্র ২৪টি ত্যাগ হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভিজাত্য প্রতীকের প্রতি লোভ শ্রেণীগত অবস্থানে তখনও অটুট ছিল। ওকালতি ব্যবসা ছেড়ে দেন এমনি আইন ব্যবসায়ীর সংখ্যা ১৯২১-এ শেষ পর্যন্ত ১৮০ জন ; উদাহরণ হিসেবে মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সি. রাজা- গোপালাচারী প্রমুখ আইনজীবীগণ সরকারী আদালতে লাভজনক আইন ব্যবসা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বে আত্মত্যাগের গৌরবে গৌরবান্বিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছেড়ে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতার জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। জওহরলাল নেহরু এলাহাবাদের হাইকোর্টের আইন ব্যবসা পরিত্যাগের মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন।

শিক্ষা ক্ষেত্রেও সরকারী কলেজ ও বিদ্যালয় ত্যাগ করে জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-শিক্ষকেরা এসে উপস্থিত হন।

জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ		**ছাত্রসংখ্যা**	**১৯১৯-২০**	**১৯২০-২১**
বিহার ও ওড়িশা	৪৪২টি	কলেজ :	৫২৪৮৬	৪৫৯৩৩
বাংলা	১৯০টি	মাধ্যমিক :	১,২৮৩,৮১০	১,২৩৯,৫২৪
বোম্বাই	১৮৯টি			
যুক্তপ্রদেশ	১৩৭টি			

জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজগুলির খুব অল্প সংখ্যকই স্থায়িত্ব পেয়েছে, গান্ধীজীর কথামত এক বছরে স্বরাজ না আসাতে এবং প্রথাগত ডিগ্রির টান ও প্রয়োগ সুবিধা সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাভাবিকভাবেই লুপ্ত হতে বসে। বাংলায় আন্দোলনের এই পর্ব অধিক গুরুত্ব লাভ করেছিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেরাই সরকারী অনুমোদন প্রত্যাহার করে তার জন্য ছাত্ররা ধর্মঘটে অংশ নেয়। চিত্তরঞ্জন দাশ এই পর্বে ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন। বাংলার পরেই এই আন্দোলনে পাঞ্জাবের স্থান গৌরবজনক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধের ব্যয়ভারের বৃহত্তর অংশ বহন করতে বাধ্য হলে তার অর্থনৈতিক অবস্থানে মন্দা শুরু হয়। এব প্রভাব পড়তে থাকে ব্রিটেনের উপনিবেশগুলির উপরে, ভারতের অর্থনীতিতেও এর ছাপ পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু ১৯১৮-১৯-এর শেষ দিকে ভাবতের প্রায় সর্বত্রই খাদ্যশস্য উৎপাদনে খারাপ অবস্থা দেখা দিলে ভারতে সঙ্কট উপস্থিত হয়। ভারতে খাদ্যাভাবের অবনতি উপস্থিত, দেশে বৃদ্ধি পেতে থাকে বেকারির সংখ্যা, ভারতের শিল্পে উৎপাদন আনুপাতিক হারে হ্রাস পেলে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও দুরবস্থা সৃষ্টি হয়। একদিকে খাদ্যশস্যের ঘাটতি অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদন হ্রাস সমাজব্যবস্থার উপরে—ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিরূপ প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি করে।

অবশ্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ১৯১৮-১৯-এর দিকে কৃষক সভা বা কৃষক আন্দোলন কখনো অভিজাত সামন্তপ্রভুদের, কখনো অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের বিরুদ্ধে বিবিধভাবে উপস্থিত হয়। যদিও সামন্তপ্রভু, জোতদার-অবস্থাসম্পন্ন কৃষকরাই ছিলেন কংগ্রেসের অর্থ-উৎসের মূল অবলম্বন, তাহলেও দেশীয় রাজনীতি অনুকূল কোন কোন প্রদেশে এই আন্দোলন তৃণমূল স্তরে এসে গঠনতান্ত্রিকভাবে রূপ লাভ করে। ১৯১৭-এর নভেম্বরে খেড়ার কাপড়ভঞ্জ তালুকের মোহনলাল পাণ্ডের নেতৃত্বাধীন কৃষক আন্দোলন বিলম্বে হলেও গান্ধীজী অনুমোদন করেছিলেন যদিও গান্ধীজীর অযথা কালহবণকে সাধারণ কৃষককুল সহজভাবে গ্রহণ করেনি।

রাজস্থানের বিজোলিযায় বিজয় সিং পথিক, মানিকলাল বর্মা একটি শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন. ১৯১৯ থেকে ১৯২২-এব মধ্যে রাজস্থানে কৃষক আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করলেও আন্দোলনের মূল চরিত্র বদলে যায়। উত্তর বিহারের দারভাঙ্গাতে, মুজফ্ফরপুব, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, মুঙ্গেরে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে ১৯১৯ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে ; তবে ১৯১৯ থেকেই কৃষকদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া নিয়ে অভাব অভিযোগ পূরণের উদ্দেশ্যে সভা আরম্ভ করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব দারভাঙ্গায় প্রথাগত অধিকারের বিরুদ্ধে ভাগচাষীরা আন্দোলনে নামলে ১৯২০-এর শুরুতে দারভাঙ্গা রাজের কর্মীরা সুচতুরভাবে এই আন্দোলনকে—পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লেখ্য, বিহারে ভাগচাষী সাধারণ কৃষক এবং নিম্নবর্ণের লোকদের আন্দোলনের ফলে জমিদার শ্রেণী ভীত হয়ে উঠেছিল। ১৯২০-২১-এ যুক্তপ্রদেশে সাধারণ কৃষকদের উপর নানাপ্রকার উপ-কর এবং ভাগচাষীদের উপর বেগার শ্রম আন্দোলনেব রূপ পরিগ্রহ করে, যদিও পূর্বেই ১৯১৮তে সেখানে কিষাণসভার পত্তন ঘটেছিল। প্রতাপগড়, রায়বেরলি, সুলতানপুর, ফৈজাবাদে কিষান আন্দোলন গতিশীল রূপ নেয় ; এক্ষেত্রে বাবা রামচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্রপ্রদেশের কুড্ডাপাহ্ রায়াচোটি, গুন্টুরে কৃষকরা শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে। মালাবারের অশান্ত মোপলাদের

হিংসাত্মক আন্দোলন ও বিদ্রোহ সরাসরি কিষান আন্দোলন না হলেও সংশ্লিষ্ট। এই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে ২৩৩৭ জন বিদ্রোহীর মৃত্যু ও ১৬৫২ জন আহতকে সাক্ষী রেখে ; এই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল ভূস্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে একত্রিত মোপলাদের সংগঠিত হিংসাত্মক প্রতিবাদ। মোপলাদের প্রাথমিক পর্বে শত্রু বলে চিহ্নিত হয়েছিল 'জেনমি' বা ভূস্বামীরা, কিন্তু সরকারকে সাহায্য করার অপরাধে যারা তাদের শত্রু বলে স্থির হয়েছিল তার অধিকাংশই হিন্দু ; তাই কেউ কেউ মোপলাদের এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক বলেও চিহ্নিত করেছেন—কেন না মোপলারা প্রায় সবাই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত। এই বিদ্রোহের প্রাথমিক পর্বে কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং অসহযোগ আন্দোলনের নেতারাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মোপলারা অহিংসা নীতির প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান না হওয়ায় ক্রমশ এই নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়। বস্তুত দুর্বল এবং দরদহীন নেতৃত্বকে মোপলারা নিজেদের প্রতিনিধি বলে মনে করেনি ও মেনে নিতে পারেনি।

অন্যান্য প্রদেশের মতোই খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া অসম ও বাংলাদেশে (বঙ্গদেশে) লক্ষিত হয়। মজুরি বাড়ানোর দাবীতে আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, গান্ধীর প্রতিষ্ঠাতে যুক্তপ্রদেশ থেকে আসা জমিদার-জোতদারদের দ্বারা বিতাড়িত অতি দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে জন্মস্থানে বা ফেলে আসা বসত-বাড়িতে ফিরে যাওয়ার এক প্রচেষ্টা শুরু হয়। তাদের মধ্যে নানা গুজব ছড়ালে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে গান্ধীজীর স্বরাজ এলে তারা পুনরায় নিজ বাসভূমে বসবাসের অধিকার পাবে। প্রকৃতপক্ষে চা বাগানের এই শ্রমিকেরা যেমন দরিদ্র তেমনি ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। তাদের আন্দোলন এই সময় অসমের চা বাগান অঞ্চলে ব্যাপকতা পায়, কিন্তু তাদেরকে কেন্দ্র করে বাংলাও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। চা বাগান থেকে পালিয়ে আসা শ্রমিকদের উপরে ২০-২১শে মে গুরখা আক্রমণ হলে এই পর্যায়ে বাংলাতে সফল নেতৃত্ব দেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত।

অসহযোগ আন্দোলনে বাংলা কিছুটা এগিয়েই ছিল। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা বিভিন্ন দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, বঙ্গের মুসলমানরা তখন এ আন্দোলনের প্রতি বিমুখ না হলেও সক্রিয় হিসেবে সামনে আসেনি। যাঁরা এসেছিলেন তার সংখ্যা অনুপাতে ছিল খুবই সামান্য। খিলাফত আন্দোলনকে সামনে রেখে গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে তারা এগিয়ে এলে, সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে বঙ্গদেশে অসহযোগ আন্দোলন নতুন মাত্রায় বিকাশ পেল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলনের বিষয়বস্তু থেকে এটা আলাদা হলেও হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভূমিকা বিপ্লবাত্মক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। তবে এ কথা স্বীকার্য যে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাংলার অসহযোগ আন্দোলন টপ্‌কে যেতে পারেনি। স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫) কবি রবীন্দ্রনাথ—গীতিকার রবীন্দ্রনাথ—সুরকার রবীন্দ্রনাথ—এমন কি শিল্পী রবীন্দ্রনাথ অসহযোগে মৌন-গভীর, কখনো বা বিদেশী বস্ত্রের বহ্নি উৎসব দেখে ভাবিত ব্যথিত, কখনো উদ্বিগ্ন কলমের খোঁচায় জড়িয়ে পড়েন বিতর্কে— ভবিষ্যৎ কেমন হবে? পরবর্তীতে ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে দার্শনিক

রবীন্দ্রনাথ কতোটা নির্ভুল এবং প্রাসঙ্গিক। তবে অসহযোগ আন্দোলনে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক বিষয়টি একটা সময় মুখ্য হয়ে ওঠে। ১৯২১-এর শুরু থেকেই এখানে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটলেও নভেম্বর থেকেই এটা গতি লাভ করে, জঙ্গী হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে।

বঙ্গদেশে চিত্তরঞ্জন দাশের সুযোগ্য তিন তরুণ সহকর্মী আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের নেতৃত্বে তুলে ধরেন, আন্দোলনকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করেন। পূর্ব বাংলায় শ্রমিক ধর্মঘটে সুযোগ্য নেতৃত্ব দেন চট্টগ্রামের যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে সামনে তুলে এগিয়ে আসেন মেদিনীপুরের বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কলকাতার নাগরিক জীবনে রাজনৈতিক চেতনাকে আন্দোলনের হাতিয়ার করতে—বিশেষ করে শিক্ষা পদ্ধতিকে ঔপনিবেশিক ভাবধারা থেকে মুক্তি দিতে সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতায় জনসাধারণকে আন্দোলনমুখী করতে সক্ষম হন।

১৯২১-এর প্রথম দিক থেকেই ছাত্র-আন্দোলন বিকাশ লাভ করলেও নভেম্বর থেকে বঙ্গদেশ অসহযোগ আন্দোলনে আলোড়িত হয়। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারত সফরকে কেন্দ্র করে ১৭ই নভেম্বর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ বঙ্গদেশে—কলকাতায় হরতাল বিপুল সাফল্য লাভ করে ; কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়ন্ত্রণের মুখ্যভাগে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। প্রায় একই সময় খিলাফত আন্দোলনকারী মুসলমান শ্রমিক ও সাধারণ মুসলমানদের নেতৃত্বে মুহম্মদ ওসমান সাফল্যলাভ করেন ; সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট চিন্তা-ভাবনার অগ্রণী গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে কলকাতাতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নিজেকে ও কমিউনিস্ট চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

১৯২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকেই বঙ্গদেশের পাট চাষ অঞ্চলে বাইরে থেকে আসা এবং কৃষক নয় এমন অসহযোগের কর্মিবৃন্দ পাটের পরিবর্তে ধান ও তুলা চাষের জন্য কৃষকদের উৎসাহ দেন। তাদের ধারণা ছিল এর ফলে বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত পাটকলগুলির ক্ষতি করা যাবে এবং দেশে খাদ্য ও খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। কিন্তু এই আন্দোলনকারী অসহযোগের কর্মিবৃন্দ তাদের বক্তব্য সাধারণ চাষীদের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে তুলে ধরতে পারেননি, ধান ও তুলা চাষের বাস্তব প্রয়োজনটা উপলব্ধি করাতে ব্যর্থ হন ; ফলশ্রুতি চাষীরা এই আবেদনে সামান্যই এগিয়ে এসেছিল। বস্তুত পাট চাষই চাষীদের সমসাময়িক অবস্থায় আর্থিক স্বচ্ছলতার উপায় ছিল। তাই অসহযোগ আন্দোলনকারীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পাবনা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, নদীয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে মিল মালিকরা খুব বেশী অসুবিধায় পড়েনি।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন-বিক্ষোভ অসহযোগ-এ নতুন মাত্রা লাভ করে। তাঁর নেতৃত্বে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের ফলদায়ী-করবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠলে স্থানীয় প্রশাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রামপুরহাট মহকুমায় প্রজাবিলির কাজকর্মের বিরোধিতায় কৃষকরা এগিয়ে আসেন। ১৯২১-এর শেষ থেকে ১৯২২-এর প্রথম তিন মাসে সাধারণ মানুষের মনে 'গান্ধীরাজ'

সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা জন্মায়. কোথাও কোথাও অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শের পরিপন্থী কাজকর্ম দেখা দেয়; রাজশাহী জেলের বন্দী পালানো থেকে শুরু করে ঝাড়গ্রামে সাঁওতালদের হাট ও জঙ্গল লুঠ, জলপাইগুড়িতে পুলিশের উপর আক্রমণ, নিলফামারিতে মুসলমান কৃষকদের 'গান্ধী দারোগা'-র অধীনে স্বরাজ থানা স্থাপন, চট্টগ্রামে সংরক্ষিত অরণ্য লুঁটপাট প্রভৃতি।

সার্বিকভাবেই অসহযোগ আন্দোলনকে আমরা দেখতে পাই অর্থনৈতিক বয়কট আন্দোলনের কার্যকরী ভূমিকা পালনে পাঞ্জাব, রাজস্থান, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বঙ্গদেশ সহ প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশই তৎপর। ভারতের সর্বত্র এক চিত্র নয়, অঞ্চলভেদে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিও মূল নীতি থেকে অনেক সময়ই দূবে চলে গেছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে ১৯২১-এর ১৭ই নভেম্বর বিশেষভাবেই স্মরণীয়। ভারতবাসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য-সহযোগিতা করায় এদেশীয়দেব ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ওয়েলস্-এর যুবরাজ ভারতে আসেন। বস্তুত এটা ছিল ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর একটি ভ্রান্ত ধারণা, রাজভক্ত ভারতীয় জনসাধারণ আন্দোলন পরিহার করে সঙ্কটকালেও যুবরাজের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শনে কার্পণ্য করবে না। কিন্তু বাস্তবে ছিল মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের সংস্কার পরিকল্পনার উদ্বোধনকে উপলক্ষ করে প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর ভারত আগমন। এই সময়কার ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতার খবর ব্রিটিশ সরকারের গোচরে ছিল, কিন্তু ভারতের বড়লাট লর্ড রিডিং কথা দিয়েছিলেন, ভারতে প্রিন্স অব ওয়েলস্ যথাযোগ্য সংবর্ধনা পাবেন। কিন্তু ভারতে তখন খিলাফত-অসহযোগ মিলে জনতার আন্দোলন নতুন মাত্রা পেয়েছে তা শাসকবর্গ উপলব্ধি কবতে ব্যর্থ হয়, অন্যদিকে বড়লাট, ছোটলাট, উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীরা ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে নিজেদের দক্ষতাব— প্রশাসনিক উৎকর্ষতার উদাহরণ তুলে ধরার প্রয়াস পান; যদিও হিতে-বিপরীত ফল ফলে। ভারতের সর্বত্রই জনসাধারণ ছোট বড় মোর্চা গঠন করে। উল্লেখ্য, এখানেও নিম্ন আয়ের লোকজন, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরাই আন্দোলনের অংশীদার বেশী; কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও নেতৃত্বে এদের স্থান ছিল সংখ্যায় নগণ্য—নেই বললেও চলে। সংগ্রামী জনতাও পুঁজিপতি শ্রেণীর নেতৃত্বকে দেখে অস্বীকার করতে পারেনি, ববং আন্দোলনের মূল শক্তি সরাসরি দেশীয় পুঁজিপতির হাতে লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত না হলেও তাদের স্বার্থবহনকারী বিশ্বস্ত অনুগতের উপর ন্যস্ত হয়। ফলশ্রুতি, তারা আন্দোলনে নেমেও বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে সীমিত রূপ দিতে সচেষ্ট হয়, গান্ধীজীকেও আমরা এই পর্যায়ে নেতৃত্ব গ্রহণকারীরূপে দেখতে পাই।

যুবরাজের ভাবত আগমনকে সামনে রেখেই অসহযোগ আন্দোলন অহিংস না থেকে সহিংস হয়ে ওঠে। ১৭ই নভেম্বর যুবরাজ মুম্বাইতে পৌঁছলে ভারতের সর্বত্র অসহযোগীদের ডাকা হরতাল ও বিক্ষোভ সমাবেশের সময় মুম্বাইতে একদল জনতা হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। যুববাজকে অভিনন্দন জানাতে আসা লোকজনদের সঙ্গে সবাসরি তাদের সংঘর্ষ ঘটে। পাঁচ দিন ধরে সরকারের পুলিস ও সেনাদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের ফল ফললো সরকারী হিসেব মোতাবেক ৫৩ জনের মৃত্যু, প্রায় চার শতাধিকের আহত হওয়া এবং ২০০০ জনেব গ্রেপ্তাব দিয়ে। যুববাজ যেখানে গেলেন সেখানেই জনসাধারণ অসহযোগিতার প্রকাশ

ঘটালো হরতাল ঘটিয়ে। সরকারের দমনমূলক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কলকাতাতে সুভাষচন্দ্র বসু নেতৃত্ব দিলেন সফল হরতালের। দেশব্যাপী জনতার একাংশ হিংসার পথ গ্রহণ করেছে দেখে গান্ধীজী তার তীব্র নিন্দা করলেন এবং দায়ভার নিজের উপর নিয়ে জনগণকে শান্ত হওয়ার জন্য ও নিজের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অনশন শুরু করেন। সরকারী কর্তৃপক্ষ অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দমননীতি কড়াভাবে প্রয়োগ করতে স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘকে অবৈধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নেতাদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। কলকাতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলে ১০ই ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেপ্তার হতে হয়। গ্রেপ্তার হলেন বাসন্তী দেবী, লালা লাজপত রায়, মতিলাল নেহরু, জহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র বসু সহ ৩০ হাজারেরও বেশী আন্দোলনকারী। তখনও কলকাতা ভারতের প্রধান শহর, দেশে-বিদেশে কলকাতার গুরুত্ব বেশী, কলকাতা কেন্দ্রিক আন্দোলন ব্রিটিশ শাসকবর্গকে ভাবিয়ে তোলে অজানা সংকেতে। প্রিন্স অব ওয়েলস্ কলকাতাতে তাঁর সফর শেষ করবেন বলে বড়লাট চেষ্টা করলেন যাতে এখানের সংবর্ধনা স্মরণীয় হয়ে থাকে—যুবরাজ এবং ব্রিটিশ সরকারকে খুশি করা যায়। কিন্তু কলকাতার বাস্তব চিত্র অন্যরকম। মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এগিয়ে এলেন (প্রথমেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে আলোচনা) বড়লাট ও কংগ্রেসের মধ্যে রফা করতে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন পণ্ডিত মালব্যর প্রসঙ্গ টেনে :

> বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে তিনি এই ধারণা নিযে ফেরেন যে, আমরা যদি প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতা সফর বয়কট না করতে রাজী হই তাহলে সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে একটা রফায় আসবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শ্রীযুক্ত দাশ আর আমার সঙ্গে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনার জন্যে আলিপুর জেলে আসেন। পণ্ডিত মালব্যকে আমরা পাকাপাকিভাবে কোনো উত্তর দিইনি; কেন না আমরা চেয়েছিলাম নিজেদের মধ্যে বিষয়টি আলোচনা করে নিতে। শ্রীযুক্ত দাশ আর আমি, আমরা দুজনেই এই সিদ্ধান্তে আসি যে, প্রিন্স অব ওয়েলসকে আমরা বয়কট করার দরুণই সরকার বাধ্য হয়ে সমঝোতা করতে চাইছে। আমাদের উচিত এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠকে বসা। এটা আমরা ভালো কবেই জানতাম যে, তাতে আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবে না— তবে রাজনৈতিক সংগ্রামে সেটা হবে সামনেব দিকে একটি বড পদক্ষেপ। সেও কম কথা নয়।..... আমরা প্রস্তাব কবি যে, ব্রিটিশ যা দিতে চাইছে আমরা নেব। কিন্তু এই শর্তে যে, গোলটেবিল বৈঠক হওয়ার আগেই সমস্ত বন্দী নেতাকে ছেড়ে দিতে হবে।
>
> পরের দিন পণ্ডিত মালব্য আবার যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, আমরা তাঁকে আমাদের অভিমতের কথা জানিয়ে দিলাম।.....পণ্ডিত মালব্য ফিরে গিয়ে সব কিছু বড়লাটের গোচরে আনেন। দুদিন পরে এসে জেলে আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বললেন আলোচনায় যোগদানকারী সমস্ত রাজনৈতিক নেতাকে সরকার ছেড়ে দিতে রাজী। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দুই আলী ভ্রাতা ও আরো অনেক কংগ্রেস নেতা। আমরা একটা বিবৃতি তৈরী করলাম, তাতে সুস্পষ্টভাবে আমরা আমাদের মতামত জানিয়ে দিলাম। পণ্ডিত মালব্য সেই দলিল নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে বোম্বাই চলে গেলেন। গান্ধীজী আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তাতে আমরা যেমন অবাক হলাম, তেমনি দুঃখিতও

হলাম। তিনি জেদ ধরলেন যে, আগে নিঃশর্তে সমস্ত রাজনৈতিক নেতাকে, বিশেষ করে আলী ভ্রাতাদের মুক্তি দিতে হবে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ওঁদের ছেড়ে দেওয়ার পরেই শুধু গোলটেবিলের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।[২৮]

মৌলানা আজাদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাবনা-চিন্তা এবং পণ্ডিত মালব্যের সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা ভেস্তে গেল। গান্ধীজী তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। কলকাতায় দারুণভাবে বয়কট সফল হলো, কিন্তু রাজনৈতিক আপসের দুর্লভ সুযোগটি হারাতে হলো।

১৯২১-এর ডিসেম্বরের শেষদিকে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে আহমেদাবাদে, চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি নির্বাচিত হয়েও জেলেই থাকেন, সভাপতির কাজ পরিচালনা করেন হাকিম আজমল খাঁ। স্বরাজের পথে অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্ব ও বিকাশ নিয়ে আলোচনার মূল পর্বে স্বীকৃতি পেল সমষ্টিগতভাবে আন্দোলন পরিচালনার এবং নেতৃত্বে থাকবেন গান্ধীজী-ই। আহমেদাবাদের সভার সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়ে গান্ধীজী বড়লাটকে এই মর্মে চিঠি দিলেন যে, গুজরাটে সুরাট জেলার বরদৌলীতে ১লা ফেব্রুয়ারি (১৯২২) থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন। স্মর্তব্য, ভারতের মতো বিশাল দেশের একটি প্রদেশ নয়—একটি জেলাও নয়, শুধু একটি পরগণা মাত্র এই আন্দোলনের জন্য নির্বাচিত হলো।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এক সন্ধিক্ষণে এসে উপস্থিত হলে প্রথমে স্যার শঙ্করণ নায়ার ও পরে স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন ১৪-১৬ই জানুয়ারি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীজী সহ অন্যান্য নেতারাও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন, সম্মেলনের আপস প্রস্তাবে সরকার মনোযোগ না দিলে গান্ধীজী বড়লাট লর্ড রিডিংকে ১লা ফেব্রুয়ারি সাত দিনের সময় দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। তিনি এই চিঠিতে অভিযোগ উত্থাপন করেন, সরকার যদি সমস্ত রকম দমনমূলক নীতি পরিহার না করেন, মিছিল, জনসভা, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা না দেন, যদি গ্রেফ্‌তার করা অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনকারীদের মুক্তি না দেন, অহিংস আন্দোলন করার পথে যদি বাধা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তবে কংগ্রেস ও আন্দোলনকারীদের প্রস্তাবিত গণ-আইন অমান্য আন্দোলন ব্যতীত তাঁর সামনে কোন পথ খোলা থাকবে না। বড়লাট লর্ড রিডিং এই পত্রের কোন উত্তর দেননি। কেন না ততদিনে প্রিন্স অব ওয়েলস্ দেশে ফিরে গেছেন, ক্ষুণ্ণ হয়েছে লর্ড রিডিং-এর ভাবমূর্তি, তাই সরকারের এই প্রস্তাবে কোনো আগ্রহই ছিল না, বরং তিনি কংগ্রেস দ্বারা দেশের আইন শৃংখলার অবনতি ঘটেছে এই অজুহাত উত্থাপন করে চরম দমননীতির আশ্রয় নেন। গান্ধীজীর দেয়া প্রস্তাবসমূহ তো পূর্বেকার পণ্ডিত মালব্যের দেয়া চুক্তিরই অনুরূপ; তবে সময়ের প্রেক্ষাপটে শাসকগোষ্ঠীর কাছে আজ এগুলি অর্থহীন। গান্ধীজীর সামনে গণ-আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বরদৌলী যাওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ খোলা থাকে না, তিনি বরদৌলী যাত্রা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, আহমেদাবাদের কংগ্রেস অধিবেশন, পরবর্তী সর্বদলীয় সম্মেলন এবং গান্ধীজীর ১লা ফেব্রুয়ারির বড়লাট লর্ড রিডিংকে লেখা চিঠির এই সময়টাতে ভারতের স্বরাজের স্বপ্ন দেখা আন্দোলনরত জনসাধারণ এবং বিপ্লবী ভাবধারায় গঠিত ছোট ছোট মোর্চাগুলির দেশে সর্বাত্মক আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব বিপ্লবী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর বিপ্লবের পথেব সন্ধান দিতে ব্যর্থ

হয়, নেতৃত্ব জাতীয় আন্দোলনকে ব্যাপকতর না করে বরং তাকে সীমিত কলেবরে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করতে চাইলেন। এই সময় বিপ্লব-বিদ্রোহের যে সুযোগ এসেছিল, গণ-মানস যেভাবে আবগ-তাড়িত হয়েছিল তাতে নেতৃত্বের বিপ্লবাত্মক চেতনা যুক্ত হলে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭ পর্যন্ত প্রলম্বিত হতো কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক।

গান্ধীজীর বরদৌলী যাত্রার উদ্দেশ্য কিন্তু স্বরাজ নয় বা হসরত মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতাও নয়,—শুধুমাত্র বন্দীমুক্তি ও দমনপীড়ন বন্ধের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। দুঃখের বিষয় গান্ধীজী সেটুকুও করতে পারলেন না, বরং জাতীয় আন্দোলনের অগ্নিমুহূর্তে চৌরী-চৌরার ঘটনার উল্লেখ করে পরাধীন ভারতের জাতীয় নেতা শান্তির পূজারী হতে চাইলেন; কিন্তু একথা সত্য বলে আজ প্রমাণিত, গান্ধীজীর নেতৃত্বে এবং ১লা ফেব্রুয়ারির চিঠির ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব উম্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ দেশবাসী যেভাবে গান্ধীজীকে অভিনন্দিত করেছিল এবং তাঁরই আহ্বানে ভারতের সর্বত্র ত্যাগ স্বীকারের —ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রেরণা সাধারণ মানুষ পেয়েছিল তা ভারতের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, চাঁদ মিঞা, মুজিবর রহমান, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ এগিয়ে এসেছিলেন নির্ভীকভাবে। এভাবেই বিহার, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লি, পাঞ্জাব, করাচী, বোম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অসম প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেসের নেতা ও সাধারণ কর্মীরা ধর্মের বিভেদ ভুলে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু চৌরী-চৌরার ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিচলিত গান্ধীজী বললেন 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' (Himalayan Blunder) করেছেন, স্থগিত রাখলেন বরদৌলীর গণ-আইন অমানা আন্দোলন বা কর্মসূচী। কিন্তু ফিরে দেখলেন না— সমগ্র ভারতে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-জৈন স্বরাজ-স্বাধীনতার মহামন্ত্রে কীভাবে মিলিত হয়েছে।

চৌরী-চৌরার গোরখপুরের গ্রামে একটি সুসংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল, তারা স্থানীয় বাজারে ধর্না দিয়েছিল মদ বিক্রি ও চড়া দামে খাদ্যশস্য বিক্রির প্রতিবাদে। পুলিস তাদের নেতা ভগবান আহীরকে পেটালে জনতা থানা ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। পুলিস এই প্রতিবাদী জনতার উপর গুলি চালায়। জনতার আক্রমণে ২২ জন পুলিসের মৃত্যু ঘটে। দায়রা বিচারে ২২৫ জন অভিযুক্তের মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত ১৯ জনের ফাঁসি দেয়া হয় । দুঃখের বিষয় হলো এই যে, ফাঁসি ও দ্বীপান্তরের বিরুদ্ধে সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তেমন জোরালো কোন প্রতিবাদ করেনি; গান্ধীজী মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন অহিংস নীতি মানা হয়নি বলে। প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'ভ্যানগার্ড' এবিষয়ে মানবেন্দ্র রায়ের প্রতিবাদ প্রকাশ করে; উল্লেখ্য 'ভ্যানগার্ডে'র দায়িত্বে ছিলেন মানবেন্দ্র রায় (এম.এন.রায়)।

বরদৌলীর গণ-আইন অমান্য স্থগিত রাখার ব্যাপারে গান্ধীজীর একতরফা সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতৃত্বই হতবাক হলেও—অগ্রগণ্য মাতব্বরেরা অসন্তুষ্ট হলেও গান্ধীজীর সিদ্ধান্তকেই তাদের মেনে নিতে হয়েছিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারির প্রকাশিত 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে আন্দোলন বন্ধ করার সপক্ষে যে যুক্তি উপস্থিত করা হয় তাতে গান্ধীজীর অহিংসার

প্রতি আস্থা এবং কঠিন শৃঙ্খলা রক্ষার পুনরায় উল্লেখ থাকলেও গান্ধীজীর অনুযোগের অন্য কারণগুলি অনেকটাই খেলো—সহজভাবে মেনে নেয়া যায় না।

> গান্ধীর স্বপক্ষে সঙ্গত যুক্তি দেওয়া যায়, তিনি বারে বারে ও প্রভূত পরিমাণে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন যে, তিনি শুধু এক বিশেষ ধরণের নিয়ন্ত্রিত গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত, এবং শ্রেণী সংগ্রাম বা সমাজ বিপ্লবে, তাঁর আদৌ কোনো আগ্রহ নেই। গান্ধী সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন, গোটা আন্দোলনই ভেঙ্গে পড়ল—এর থেকেই তাঁর নিজস্ব মৌল দুর্বলতাও ধরা পড়ে— ১৯১৯-২২-এর ভারতে দাহ্যবস্তু ছিল পর্যাপ্ত, বোধহয় সময় বিশেষে বিষয়গত দিক দিয়ে বিপ্লবী পরিস্থিতিও ছিল, কিন্তু বিকল্প বিপ্লবী নেতৃত্ব বলতে কিছুই ছিল না। জনগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন গান্ধীরাজ সম্বন্ধে এক আবছা মনশ্চিত্র-র মাধ্যমে, সেটিকে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব, বহু বিচিত্র ও কখনও কখনও প্রায়-বিপ্লবীভাবকে বুঝে নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্দেশের জন্যে তখনও অবধি তাঁরা তাকিয়ে থাকতেন শুধু মহাত্মার দিকেই।[২৯]

গণ-আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার হলে সংগ্রাম উন্মুখ স্বাধীনতাকামী সাধারণ কর্মিবৃন্দ এটাকে মেনে নিতে না পারলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই প্রায় সব মুখ্য কংগ্রেসী নেতাকেই সরকার গ্রেপ্তার করলেও গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার সাহস পায়নি, আন্দোলন হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে গেলে ব্রিটিশ শাসকবর্গ এবারে সেই সাহস পেল ; ১০ই মার্চ তারা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে, ১২৪(ক) ধারামতে দোষী বলে ঘোষণা করে ৬ বৎসরের কারাদণ্ড দেয়। গান্ধীজীর প্রকাশিত "Tampering with leyathy," "The puzzle and its salution," "Shaking the Manes," এই তিনটি প্রবন্ধই রাজদ্রোহক বলে বিচারকের রায় লাভ করে। গান্ধীজীর কারাদণ্ডের আদেশের পাশাপাশি নতুন করে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক এবং রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তারের অভিযান শুরু হয়। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন, রাজনৈতিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের বৃহৎ অংশ গ্রেপ্তার হলো ; অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ করেই স্তব্ধ হয়ে গেল। লক্ষণীয়, গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দেশে কোনও প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো না। আপাত দৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, কেন না এই আন্দোলনের মূল খিলাফত সমস্যা, পাঞ্জাবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেও তা প্রতিকারহীন রয়ে গেল ; সর্বশেষ এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ এলো না।

> অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের অপর একটি ত্রুটি হল—গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনকে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।[৩০]

বস্তুত বিশ্বজোড়া ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্গে আবেগতাড়িত উন্মাদনা এই আন্দোলনকে যতোটা গতি দিয়েছিল দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সে তুলনায় অস্বচ্ছ—অপ্রতুল। পরবর্তীতে দেখি তুরস্কের জনগণ কিন্তু ভারতের এই খিলাফত আন্দোলনের আদর্শকে একেবারেই গ্রহণ করেনি, তারা ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাস্তব দিকগুলো উপলব্ধি করেছিল। তবে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ভারতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম সর্বত্র স্থান পায়, কর্মী ও নেতা সব অঞ্চল থেকেই বেরিয়ে আসে ; সর্বস্তরের মানুষ কম-বেশী এই আন্দোলনে

যুক্ত হলে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, যদিও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিকাংশ কর্মী-নেতাই উপেক্ষা করতে পারেনি ; কেবলমাত্র নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে, আত্মনির্ভরশীলতা সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছিল। তাঁরা সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে নিজেদের সংগঠিত করার শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। অসহযোগ আন্দোলন স্বর্ণ-স্বাধীনতা প্রসবিনী হতে গিয়েও বন্ধ্যাত্বের অন্ধকারে নিথর হয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্বের এভাবে আকস্মিক সমাপ্তি ঘটলে ভারতের মাটিতে নতুন করে সাম্প্রদায়িকতার পুনরুত্থানের সুযোগ ঘটে।

সূত্র-নির্দেশিকা

১. সরদার ফজলুল করিম : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ : অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা : সাহিত্য প্রকাশ : ঢাকা : পৃঃ ১৮-১৯

২. জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড : বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) : [নিবন্ধ : রাজনীতির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি, ১৯০৬-১৯৪৭] সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ : ঢাকা :

৩. বশীর আল হেলাল : ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস : ঢাকা : পৃঃ ৬

৪. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : জিন্না/পাকিস্তান/নতুন ভাবনা : কলিকাতা : পৃঃ ১১

৫. জন. আর. ম্যাকলেন : বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) : ঢাকা : পৃঃ ৩৩৫

৬ শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : জিন্না/পাকিস্তান/নতুন ভাবনা : প্রাগুক্ত : পৃঃ ১১-১২

৭. রফিকুল ইসলাম : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম : আগামী প্রকাশন : ঢাকা : পৃঃ ১৯-২০

৮. স্বদেশী আন্দোলনকাবীরা ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দেব ৭ই আগস্ট ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ডাক দিলে ছাত্ররাও এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে, তারাও স্বদেশী পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশে কলকাতা সহ বাংলার কযেকটি বড় বড় শহরে দেশপ্রেমের প্রেরণামূলক গান গায় ('মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নে রে ভাই'...। এই গানটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে)। মিঃ কার্লাইল তখন ইংরেজ সরকারের শিক্ষা সচিব : তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের এই বলে সতর্ক করে দেন, এই ধরনের আন্দোলনে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের শিক্ষাঙ্গন থেকে বিতাড়িত করা হবে। মিঃ কার্লাইলের এই সতর্কবার্তার বিরুদ্ধে প্রতি পদে ছাত্ররা মুখর হয় এবং ১৯০৫-এর ৪ঠা নভেম্বর কলেজ স্কোয়ারে কয়েক হাজার ছাত্রের উপস্থিতিতে 'এন্টি সার্কুলার সোসাইটি' গঠিত হয়।

৯. জন. আর. ম্যাকলেন : বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৪৫

১০. জন. আর. ম্যাকলেন : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৪৮

১১. জন. আর. ম্যাকলেন : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৬১

১২. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধায় : জিন্না/পাকিস্তান/নতুন ভাবনা · পৃঃ ১৭ (শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধায় এই উক্তিটি ব্যবহার করেছেন ডাঃ বি. পট্টভি. সীতারামাইয়ার 'The History of the Congress' নামক গ্রন্থ থেকে)

১৩. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত : পৃঃ ২২

১৪. সীতারামাইয়া : সমগ্রন্থ . প্রথম খণ্ড : পৃঃ ৪৩-৪৪
[শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিন্না/পাকিস্তান/নতুন ভাবনা গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত রয়েছে।]

১৫. সঈদ : Jinnah : পৃঃ ৬৪ [শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের ২৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত]

বাস্তবের মুখোমুখি : ভারতশাসন আইন (১৯৩৫)

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি দিল্লির এক সভাতে লোকমান্য তিলক ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ গান্ধীজী খিলাফত প্রশ্নে মুসলমানদের মনোভাবকে সমর্থন জানান। তিনি নিজেও খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়াসী হন। তিনি ঐক্য স্থাপনে কতখানি সক্ষম হয়েছিলেন বা হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই হয়ে তুরস্কের খলিফার সম্মান, রাজকীয় মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে কতটা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সে প্রশ্ন গবেষকদের। কিন্তু তিনি সক্ষম হয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়কে একই সংগ্রামে অংশীদার করতে, পরবর্তীতে যার প্রভাব কোনো ঐতিহাসিক অস্বীকার করতে পারেননি। বস্তুত তিনি আরো একটি কাজে সক্ষম হলেন, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে মিঃ জিন্নার জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাতে। কেননা ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর উত্তরণের এও এক সিঁড়ি। গান্ধীজী তাঁর অসহযোগের কর্মসূচীতে টেনে আনতে পেরেছিলেন জনাব মহম্মদ আলী, জনাব শওকত আলী, জনাব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান প্রমুখ মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে। তিনি পেরেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের আঙিনা অতিক্রম করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ভারতীয়দের যৌথ প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত করতে। ব্যক্তি গান্ধীজী লাভবান হয়েছিলেন আরো বেশী, কলকাতায় ১৯২০-এর সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেসের মধ্যে থাকলেও মিঃ জিন্নাকে নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতো গুরুত্বহীন প্রমাণ করেছিলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আরো একধাপ এগিয়ে বলেন, এই অধিবেশনেই জিন্না সাহেব চূড়ান্তভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন।[১] কিন্তু ভারতে খিলাফত আন্দোলন চলতে থাকাকালীন তুরস্কে দেখা দিল ধর্ম নিরপেক্ষ এক শক্তির প্রকাশ। ১০ই মার্চ তুরস্কের নবীন নেতা কামাল পাশা 'খলিফা'-র পদ রদ করে দিলে ভারতে খিলাফত আন্দোলন প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং এই আন্দোলনের যৌক্তিকতাও হারিয়ে যায়।

মে (১৯২৩) মাসের ২৪-২৫ তারিখে লাহোরে মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে মিঃ জিন্না সভাপতিত্ব করেন এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য তিনি লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে তিনি সর্বসম্মত হিসাবেই সভাপতি। ইতিমধ্যে কংগ্রেসে তাঁর স্থান দুর্বল হলেও মুসলিম লীগ তাকে বরণ করে নেয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে বলশেভিক চিন্তা-চেতনার বিকাশকে— কমিউনিস্ট প্রচারকে কেন্দ্র করে ১৭ই মে কলকাতার ৫, মৌলভী লেন-এর মিঃ কুতুবুদ্দীনের বাড়ি থেকে মুজফ্ফর আহ্মদকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। বলশেভিক চিন্তাধারা ও আদর্শে বিশ্বাসী সিঙ্গরাভেলু মে মাসে শ্রমিক কিষান পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। পূর্বেই ১৯২২-এর গয়া কংগ্রেসে তিনি প্রকাশ্যেই বিশ্ব কমিউনিস্টদের মহাসঙ্গ সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেন এবং নিজস্ব মতামতের দ্বারা কংগ্রেসের মধ্যকার বামপন্থীদের প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন। এ বছরেই কাপড়ের কলের জন্য বিখ্যাত আহ্মেদাবাদে মালিক পক্ষের মুনাফা লাভের জন্য শ্রমিকদের ২০% মজুরি কমানোর বিরুদ্ধে এপ্রিল নাগাদ যে বিশাল ধর্মঘটে কাপড়ের কলগুলি প্রায় অচলাবস্থায় গিয়ে পৌছায় তার পিছনেও এই বাম ও বলশেভিক চিন্তা-ভাবনা কাজ করছিলো। উল্লেখ্য, ৬৪টি কাপড়ের কলের মধ্যে ৫৬টি এসময়

বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক এর কাছাকাছি সময় অন্ধ্রের উপকূলবর্তী এলাকায় এন. জি. রঙ্গ সাধারণ ও খানিকটা অবস্থাসম্পন্ন কৃষকদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন, গুন্টুরে রায়ত সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় এ বছরে 'লাল বাংলা' নামে একটি প্রচার, পুস্তিকা বিলি হয়, এই পুস্তিকায় প্রতিক্রিয়াশীল পুলিস কর্মচারীদের হত্যা, বিপ্লবী আন্দোলন শুরুর আহ্বান জানানো হয় পুনরায়।

অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে গান্ধীজীর যে ইচ্ছা ছিল ভারতের বৃহৎ দুই সম্প্রদায়কে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে পরস্পর সম্প্রীতির লক্ষ্যে পৌঁছানো তা এবারে কিছুটা আঘাত পেল। ভারতের বহু স্থানে এ বছরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা দাঙ্গা দেখা দিল। মুসলমানেরা যেমন তানজিম ও তাবলিক, হিন্দুরাও সংগঠন ও শুদ্ধি—অর্থাৎ দুই সম্প্রদায়ই নিজেদের মধ্যে উগ্র ধর্মীয় প্রচার বা আন্দোলন চালাতে শুরু করে। গান্ধীজীর অনশনই এই দুই সম্প্রদায়ের সহ-অবস্থানে আসতে আপাতত সাহায্য করে।

নভেম্বর মাসের নির্বাচনের জন্য অক্টোবরের ১৪ তারিখে স্বরাজ্য দল (মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ পন্থীরা) নির্বাচনী ইশতিহার প্রকাশ করে। নির্বাচনে কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গী করে ১০৫টি আসনের মধ্যে ৪৮টি (মিঃ জিন্নার প্রভাবাধীন ইণ্ডিপেন্টরা পেয়েছিল ২৪টি) পেয়েও নেতৃত্বের দৃষ্টি ছিল যাতে জমিদার-পুঁজিপতিরা সংগঠনের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। পার্টির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিধান সভার সদস্যগণ সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি করেন ; কিন্তু ক্রমশ তাদের শ্রেণীচরিত্র ফুটে ওঠে যা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকেই প্রকারান্তরে সাহায্য করেছিল।

১০ই ডিসেম্বরে কোকানাডে (বর্তমান কাকিনাদ) কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মৌলানা মহম্মদ আলী। তিনি আবেগাপ্লুত সভাপতির ভাষণে হিন্দু-মুসলিমের সৌহার্দের বিষয়টি তুলে সম্প্রীতির উপর গুরুত্ব দেন ;খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকাকে দুই সম্প্রদায়ের আন্তরিকতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেন। এই অধিবেশনেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে দুটি প্রস্তাব ওঠে, প্রথমটি ডাঃ আনসারি ও লালা লাজপত রায়ের একটি জাতীয় চুক্তিপত্র (Indian National Pact)। দ্বিতীয়টি চিত্তরঞ্জন দাশের শুধু বাংলার জন্যে একটি চুক্তিপত্র। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি দীর্ঘ চার ঘন্টা তর্ক-বিতর্কের পরে ভোটে হেরে যায়, পক্ষে ভোট ছিল ৪৫৮টি এবং বিপক্ষে ভোট পড়ল ৬৭৮। যদিও উভয় চুক্তিপত্রেই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এসেছিল সমসাময়িক ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার বিভেদ দূর করে সম্প্রীতি আনয়ন। মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশন হলো ৩০-৩১শে ডিসেম্বর আলিগড়ে। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন আলী ভ্রাতৃদ্বয়, ডাঃ কিচলু, আসফ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মিঃ জিন্না এখানে স্বরাজ্য দলের ভূমিকার ও আইন অমান্য আন্দোলনের সমালোচনা করেন; কিন্তু এই অধিবেশনেই দেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন চেয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লোকমান্য তিলক এ বছরে অস্পৃশ্যতা দূর করার আহ্বান জানালেও বাস্তবে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা বা কার্যক্রম তৈরী করতে সক্ষম হননি। কিন্তু এ বছরেই গান্ধীজী কংগ্রেসে এই বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করান যে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে শিক্ষামূলক প্রচার ও জনমত গঠনের মাধ্যমে এই অস্পৃশ্যতা দূর করতে হবে। কেরালায় এই আন্দোলনকে সার্থক রূপ দিতে চেষ্টা করেন

পি. কৃষ্ণপিল্লাই, এ. কে. গোপালন এবং তাঁরা নির্মমভাবে প্রহৃত হন। এই আন্দোলনে বর্ণশ্রেষ্ঠ নাম্বুদিরিপাদ অংশগ্রহণ করে দেশবাসীর কাছে এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন।

জানুয়ারিতে (১৯২৪) নিখিল ভারত ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির অধিবেশনের শুরুতেই পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করেন ব্যবস্থাপক পরিষদে যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মতোই পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হোক। স্বরাজ্য দলের সভাপতির এই প্রস্তাবটি ভারতবর্ষের জাতীয় দাবীর আকারেই ওঠে, কিন্তু সরকার এটাকে মানতে না চাইলেও ডায়ার্কির অবস্থান সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা বা বিচার-বিবেচনার জন্য স্যার আলেকজাণ্ডার মাডিম্যানের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন।

পুলিস বিভাগের বড়কর্তা চার্লস টেগার্টকে হত্যার জন্য গোপীমোহন সাহা ১১ই জানুয়ারি কলকাতায় ভুল করে টেগার্টের পরিবর্তে Ernest Day নামক একজনকে গুলি করে পালানোর সময় ধরা পড়ে। বিচারে তাঁর ফাঁসি হলো ১লা মার্চ, কিন্তু ফাঁসির সময় তিনি বলেন, "আমার প্রতি রক্তবিন্দু ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে। তাঁর এই বীরত্ব ও উপলব্ধিতে বাংলার সর্বত্র বিপ্লবীরা নতুন প্রেরণা লাভ করে।

ভোটের ফলাফলকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভা গঠনে লর্ড লিটন রীতি অনুসারেই প্রথমে চিত্তরঞ্জন দাশকে মন্ত্রিসভা গঠনে আহ্বান জানান। Statesman পত্রিকা এজন্য লর্ড লিটনকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ প্রকাশ করে; European Association ও একই কারণে লর্ড লিটনের উপর ক্ষুব্ধ হল। কিন্তু দেশবন্ধু মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত হলেন না। লর্ড লিটন এ. কে. ফজলুল হক, এ. কে. গজনভি, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এই তিনজনকে মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। অবশ্য অল্প দিনের মধ্যেই আদালতের বিচারে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের নিযুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ২৩শে জানুয়ারি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রস্তাব করেন যে, 'বঙ্গদেশে যেসব লোককে ১৮১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদের সকলকে মুক্ত করা হউক।' এই বিষয়কে অবলম্বন করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বাকী দু'জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব উঠলেও বাতিল হয়ে যায়।

কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম শুনানি হয় ১৭ই মার্চ, ১লা এপ্রিলে অনুসন্ধানকারী মেজিস্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ. ক্রিস্টি তাঁর লিখিত কমিটাল অর্ডারে স্বাক্ষর দেন। শওকত ওসমানী, নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, মুজফ্ফর আহ্মদ, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে— এই চারজন আসামীই দায়রায় সোপর্দ হন। ২২শে এপ্রিল বসে সেশন্স কোর্ট। মিঃ জিন্নাকে ব্রীফ দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু রাজনৈতিক মোকদ্দমা জেনেও তিনি ত্রিশ হাজার টাকার নীচে নামতে সম্মত হননি। মূলত কমিউনিস্ট বন্দীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল । ৩রা নভেম্বরে হাইকোর্টে আপীলের শুনানি আরম্ভ হয় এবং ১০ই নভেম্বরে হাইকোর্ট কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র নামের এই মোকদ্দমাটি নাকচ করে দেন (ডিসমিস)।

মে মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের এক সভায় সংবিধানে স্থান দেয়ার জন্য গুরুত্ব দিয়ে কতগুলো দাবীকে উপস্থাপন করা হয়। দাবীগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে অভিন্ন

কয়েকটি বিষয় কেন্দ্রের উপর ছেড়ে দিয়ে প্রদেশগুলোকে পূর্ণ স্বশাসন দেয়ার কথা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েব জন্য বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়া অর্থাৎ নির্বাচনী কেন্দ্রে কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদেরই ভোটাধিকার থাকার কথা। পাশাপাশি আহ্‌মেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী প্রস্তাব আনেন, কেউ কাউন্সিলে যোগ দিলে তাকে অসহযোগ আন্দোলন বিরোধী বলে গণ্য করা হবে এবং তাবা কংগ্রেসের কোনো কার্যকরী সমিতির সদস্য হতে পারবেন না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু গান্ধীজীর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯২৪-এর মাঝামাঝি সময়েও আমরা দেখি কংগ্রেসের মধ্যবর্তীকার পরিবর্তন বিরোধী এবং স্বরাজীরা ধর্মনিরপেক্ষতা তত্ত্বের দিক থেকে মেনে নিলেও এই নীতি বা আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। উগ্র হয়ে ওঠে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, তাকে থামানো বড়োই মুশকিল, কোহাটে দাঙ্গা লাগলো সেপ্টেম্বরে। এ সময়টা গান্ধীজী মহম্মদ আলীর দিল্লির বাড়িতে থাকেন, ২১ দিন অনশনও করেন; ফলশ্রুতি সাময়িক হলেও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ছাইচাপা পড়ে। উল্লেখ্য, ১৯ মে তারিখের ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় গান্ধীজী গোরুকে বাঁচানোর জন্য মানুষের প্রাণ নেযাকে বর্বরতা বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। তা বলে তিনি যুক্তপ্রদেশের পুরুষোত্তমদাস ঠাকুব-এর মতো কংগ্রেস নেতৃত্ব বা মালবীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ ঘটাননি। মালবীয়ের পরিচয়ের একটি দিক এভাবে তুলে ধরেছেন অধ্যাপক সুমিত সরকার :

> ১৯১৫-য হরিদ্বারেব কুম্ভমেলায় কিছু পাঞ্জাবী নেতাকে নিয়ে মদনমোহন মালবীয় যে হিন্দু মহাসভা শুরু করেছিলেন, অসহযোগের বছরগুলোয় তা কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে। বিরাট (হিন্দু) পুনরুত্থান শুরু হয় ১৯২২-২৩এ। মহাসভার আগস্ট ১৯২৩এর বারানসী অধিবেশনে যেখানে 'শুদ্ধি' কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্তি ও হিন্দু আত্মরক্ষা বাহিনীর ডাক দেওয়া হয়—দেখা দেয় এক সাধারণ সাম্প্রদায়িক মোর্চার জন্যে আর্যসমাজী সংস্কারকদের সঙ্গে সনাতন ধর্মসভা পন্থী রক্ষণশীলদের সমঝওতা। যথারীতি এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মালবীয়। মহাসভার প্রচারে হিন্দু ও হিন্দীব যোগসূত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো।[১]

সন্ত্রাসবাদীদের (বিপ্লবীদেব) দমনের জন্যে বঙ্গদেশে এক নয়া সামরিক আইন (Ordinance) জারি করা হলো অক্টেবরের ২৫ তারিখে; যেন এই আইন হলেই কেউ আর ভাবতে ব্রিটিশ শাসকদের ছায়া মাড়াতে পারবে না। এই আইনে থাকলো (১) সাধারণ বিচারালয়ের পরিবর্তে তিনজন সদস্যের এক কমিটির হাতে বিচার-ভার। (২) কেবলমাত্র সন্দেহ করেই যে-কোনো ব্যক্তিকে জেলের ঘানি টানানোর ক্ষমতা কমিশনের হাতে দেয়া হলো। (৩) ওয়ারেন্ট ব্যতীত যে-কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, যে-কোনো বাড়ি অনুসন্ধানের বেচপ দায়িত্ব এই কমিশনের সদস্যারা পালন করতে সক্ষম হবেন । এই অর্ডিন্যান্সটিকে ৭ই জানুয়ারি (১৯২৫) পাঁচ বৎসর মেয়াদে বাড়ানো হলো। ব্যবস্থাপক সভার ভোটে বিলটি হেরে গেলেও গভর্ণর নিজের ক্ষমতাবলে এটিকে আইনে পরিণত করেন [The Bengal Criminal Law Amendment Bill].

* নভেম্বরের এক তারিখে সত্যভক্ত কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন, ১০ তারিখে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলাটার আপীল হাইকোর্ট খারিজ করে দেয়। সত্যভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি গঠন উপলক্ষে দুটি ইংরেজী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, প্রথমটি The future programme of Indian Communist Parti, দ্বিতীয়টি হলো The First Indian

Communist Conference. হসরত মোহানী কানপুর কমিউনিস্ট কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে বক্তব্য উপস্থিত করেন এবং সভাপতি ছিলেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। মুজফ্ফর আহ্মদের ভাষায় :

> কানপুরে এসে যাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল তারা ছিলেন লাহোরের শামসুদ্দীন হাস্সান, বোম্বের এস. ভি. ঘাটে, কে. এন. জোগলেকর, আর. এস. নিম্বকর, বিকানীরের জানকীপ্রসাদ বাগেরহাট্টা, ঝান্সীর অযোধ্যাপ্রসাদ ও মাদ্রাজের সি. কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার। অযোধ্যাপ্রসাদ আমায় বলেছিল যে কৃষ্ণস্বামী রাজাগোপাল আচারীর ভ্রাতুষ্পুত্র। পরে কৃষ্ণস্বামী নিজেও তা আমায় বলেছিলেন। মাওলানা হস্রৎ মোহানী ও মায়লাপুরম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের সঙ্গে দেখা তো হয়েছিলই। অর্জুনলাল শেঠী ও কুমারানন্দের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। আরও একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর নাম রাধামোহন গোকুলজী।[৮]

এই সম্মেলন সম্পর্কে মুজফ্ফর আহ্মদ বলেন :

> কানপুরের কমিউনিস্ট কনফারেন্সকে আমি একটি লজ্জাকর ব্যাপার মনে করি। এর আগে পেশোয়ারে তিনটি কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়ে গেল, কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হলো, আর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হলো কিনা সত্যভক্তের তামাসা হতে? আমরা কয়েকজন লোক কানপুরে একটি কমিটি গঠন করেছিলেম। আমরা তা করতে বাধ্য হয়েছিলেম। সত্যভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নামটিকে কলঙ্কিত করছিল। সত্যভক্ত এই ব্যাপার না ঘটালে কমিউনিস্ট পার্টি তো গোপন (Underground) পার্টি হতো, ভাঙ্গে হয়তো সে পার্টিতে থাকত না।[৯]

তবুও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এটাই প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন, যা বর্তমান C. P I. (M) এবং C. P. I.-ও সমর্থন করে।

সমসাময়িক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ২৩শে জানুয়ারি গান্ধীজীর সভাপতিত্বে দুটি সাবকমিটি তৈরী হলো। একটির উদ্দেশ্য হলো স্বরাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ছবি তুলে ধরা, যা সাধারণ কর্মী—জনসাধারণকে স্বরাজ সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরী করতে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং দূর করার উপায় উদ্ভাবন করা হল দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য।

গান্ধীজী বাইকোম পরিদর্শন করেন মার্চে, কিন্তু তখন তো এখানে সত্যাগ্রহ চলছিলো। এই সত্যাগ্রহে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ালো ত্রিবাঙ্কুরের একটি মন্দিরের চারপাশের রাস্তার ব্যবহার; এজাভা ও অচ্ছুৎরা গান্ধীপন্থী ধারায় একটা প্রবল আন্দোলন গড়ে তুললো। নেতৃত্ব দেন কে. কেলাপ্পন, কে. পি. কেশব মেনন, টি. কে. মাধবন—এঁরা প্রত্যেকেই কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। মন্নত পদ্মনাভ পিল্লাইও (নায়ার জাতিসভার নেতা) এই আন্দোলনে অংশ নেন। তবে ধাঁধার কথা, গান্ধীজী খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে দূরে থাকার জন্য বিবৃতি দিয়েছিলেন কেন? এটা রহস্যাবৃতই থেকে গেল। ২৮শে জানুয়ারিতে মিঃ জিন্না ঘটালেন আর এক ঘটনা, গত বছরের ২৪শে অক্টোবরের অর্ডিন্যান্সের বিরোধিতা করেন কেন্দ্রীয় পরিষদে। এও বাহ্য, বিপ্লবীদের প্রতি সরকারী নীতির বিরোধিতা করে তীব্র ভাষায় রাখলেন বক্তব্য।

আলওয়ার রাজ্যের কৃষকেরা ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির অস্বাভাবিকতা মেনে না নিয়ে মে মাসেই

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণটা ছিল প্রায় ৫০% ভাগ। রাজ্য পুলিস তো কৃষকদের উপর লাঠি চালালো নির্মমভাবে, পুলিসী অত্যাচারের সব প্রকারের উপকরণ তারা হাজির করলে ১৫৬ জন হত আর ৬০০-এর বেশির হলো আহত। কংগ্রেস তার একটা নীতিকে জড়িয়ে ছিল বলেই এ আন্দোলনে কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারলো না, দেশীয় রাজ্যগুলির আন্দোলনে গেলে তাদের আদর্শটা ভেস্তে যেতে পারে—এমনকি সরকার বাহাদুর এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ কংগ্রেসের উপরতো খাপ্পা হতে পারে। অতএব না যাওয়াই বিধেয়! বস্তুত চাষী বা কিষানদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে কংগ্রেস আন্দোলনে যেতে চায়নি; আন্তরিকতার অভাবের চেয়েও শ্রেণীস্বার্থ-এর পিছনে কাজ করেছে অনেকটাই বেশী। আমরা এ সময়কার শ্রমিক আন্দোলনেও কংগ্রেসের এই নীতির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাব, স্বয়ং গান্ধীজীর উক্তিও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শুধু নয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ফসলরূপেও দেখা গেছে। দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনের পরেই (ফরিদপুর) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলো, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে দার্জিলিং গেলেও ১৬ই জুন দেশবাসী চিরদিনের জন্য দেশবন্ধুকে হারিয়ে বসে।

১৯২৪ এর জানুয়ারি-মার্চে বোম্বাই-এর কাপড় কলগুলোতে যে ব্যাপক ধর্মঘট ঘটেছিল অনুরূপ অবস্থাটা ঘটে ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বর—ডিসেম্বরে। ১৯২৪-এ ছিল বোনাস না দেয়াটাকে কেন্দ্র করে মুখ্যত, তবে প্রায় ১,৫০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট এম. এন. যোশীর উপদেশ-পরামর্শ প্রত্যাহার করলেও অনাহার এসে শ্রমিকদের কারখানাগুলোতে ফেরত পাঠিয়েছিলো। কিন্তু এবারের ধর্মঘটের বিষয়টা খানিকটা অন্য করম, বস্ত্রশিল্পের সঙ্কটকে সামনে রেখে শ্রমিকদের মজুরি ১১.৫% কমানোব বিরুদ্ধে। ধর্মঘট চলতে থাকলে সরকার ১লা ডিসেম্বরে সুতির অন্তঃশুল্ক রদ করলে মিল মালিকরাও মজুরি হ্রাস প্রত্যাহার করে নেয়। উল্লেখ্য, এ বছরের এপ্রিল—জুন মাসেই রেলের জনৈক ইউনিয়ন নেতাকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে উত্তর-পশ্চিম রেলে বড় ধরনের ধর্মঘট হয়। এ বছরেই আহ্মেদাবাদে শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে গান্ধীজীর বক্তব্য "বিশ্বস্ত ভৃত্যারা বিনা পারিশ্রমিকেও তাদের প্রভুর সেবা করে।"[২] তাই হয়তো কংগ্রেস নেতৃত্বকে সেখানে ধর্মঘটী শ্রমিকদের পাশে দেখা গেল না; শ্রেণীস্বার্থ গান্ধীজী তখন পর্যন্ত কি ভুলতে পেরেছিলেন? কংগ্রেসের মধ্যকার জোতদাব জমিদার-শিল্পপতিরা শ্রমিকদের পাশে না দাঁড়ালেও কমিউনিস্টরা পতাকা না তুলেও চিন্তা ও চেতনা দ্বারা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছিল; ক্রমশ শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রসার ঘটে।

যদিও বলা হয় ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজানটস্ পার্টি ১লা নভেম্বর কলকাতায় গঠিত হয়েছিল, তবে একথার মধ্যে আংশিক ভুল থাকে। কেননা পার্টির এই নামটি সরাসরি আসেনি; নাম বদল হয়ে এসেছে। প্রথমটায় নাম ছিল 'দি লেবর-স্বরাজ পার্টি অব দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস', প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুত্বুদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার, কাজী নজরুল ইসলাম, শামসুদ্দীন হুসয়ন। হেমন্তকুমার সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সমাপ্ত না করেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কয়েক মাস জেল খাটেন, তার পরেই কৃষক আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। প্রথমটায় অফিস হলো একটা ভাড়া-বাড়ির দোতলায় (৩৭, হ্যারিসন রোড,

কলকাতা)। ২৫শে ডিসেম্বর লেবর-স্বরাজ পার্টির মুখপত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'লাঙল'-কে দেখতে পাই, পরবর্তীতে যা 'গণবাণী'রূপে আরো পরিচিতি লাভ করে। ১২ই সেপ্টেম্বরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কুমায়ুন পাহাড়ের আলমোড়া জেলা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতায় এলেন, তাঁরই প্রেরণাতে বা নেতৃত্বে লেবর-স্বরাজ পার্টি নতুন নাম নিল ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি; তবে পার্টি প্রতিষ্ঠার দিন ১লা নভেম্বর, ১৯২৫-ই ধরা হলো। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই সংগঠন গঠনের পিছনে মুখ্য কারণ ছিল এটাই যে, একদিকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্য দিকে ব্রিটিশ লেবর পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন স্ব স্ব স্বার্থের—শ্রেণীচরিত্রের বাইরে সাধারণ শ্রমিকদের—বিপ্লবী আন্দোলনের কোনো ছবি তুলে ধরেনি; অথচ কমিউনিস্টরা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যকার বামপন্থীরা—বিশেষত কংগ্রেসের মধ্যকার বামপন্থীরা সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এসে প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ বহনকারী শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করছিল। তাই কমিউনিস্টরা তো থাকলোই, এলো কংগ্রেসের মধ্যকার বামপন্থীরা, অংশ নিলো বিপ্লবী গোষ্ঠীর অনেকেই। এখানে সদস্য হতো সবাই, কিন্তু অগ্রণীর ভূমিকাতে থাকতো কমিউনিস্টরাই।

নির্মম হলেও একটা বিষয়কে সত্যি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করার লক্ষ্যে কিছু কিছু কাজ হলেও দিল্লি, আলিগড়, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত আর্বি, শোলাপুর বিভিন্ন স্থানে ১৬টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গাগুলিতে জীবনহানির চেয়েও সম্পদের ধ্বংস হলো বেশী, অপূরণীয় ক্ষতি হলো হিন্দু-মুসলমানের সহবস্থানের যা কিনা অনেক ধ্বংসের মধ্য দিয়েও নতুন প্রেরণাতে সৃষ্টি হতে চলছিলো।

১৯২৬-এ এসেও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের উন্নতি না ঘটে ববং অবনতি ঘটলো। দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভায় (বাংলা) সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা কেন্দ্রের ন্যায়, এটাই ব্যবস্থাপক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের দিক পরিবর্তন ঘটায়। ১লা মার্চ তারিখে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের বিভিন্ন কাজের প্রতিবাদে ঘোষণা করেন যে তারা (স্বরাজ্য দলের সদস্যরা) কেন্দ্রের সবকারকে আর সাহায্য করবেন না। বাংলাতেও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মতোই যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ১৫ই মার্চ তারিখে সবকারের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপন্থার সমালোচনা করে সদস্যদের নিয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করেন।

সহনশীলতার অভাবে এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করে ৩-৫ই এপ্রিল কলকাতায় মসজিদের সামনে থেকে হিন্দুদের সঙ্গীত সহ শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে। পোড়ানো হলো সংখ্যাতীত মন্দির, মসজিদ; ফলশ্রুতি—নিহতের সংখ্যা ৪৪ এবং আহত হলো প্রায় শ'খানেক মানুষ। কিন্তু ঘটনা তো এখানেই থেমে গেল না। ২২শে এপ্রিল পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৬৬ জন হত ও ৩৯১ জন আহত হলো। ১১ থেকে ২৫শে জুলাই বেশ কয়কটা দিন ধরে পুনরায় চললো দাঙ্গা; হত হলো ২৮ জন এবং আহতের সংখ্যা ২২৬ জনেরও বেশী। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতোই দাঙ্গা শুধুই কলকাতা বা বাংলাতে সীমাবদ্ধ থাকলো না, ক্রমশ দিল্লি, পাটনা, রাওয়ালপিণ্ডিতে ছড়িয়ে পড়লো। উল্লেখ্য ১৮ই আগস্টে বিধানসভায় 'মসজিদের সামনে সঙ্গীত ও শোভাযাত্রা' বিষয়টি আলোচিত হলো, দুঃখের হলেও সত্যি যে কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিধানসভার

সদস্যারা ব্যর্থ হলেন। সেখানে দাঙ্গার ফলে কী পরিমাণে সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে তার হিসেব উল্লেখ করা না হলেও গত তিন বছরে ৭১টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে ২৬০ জনের প্রাণহানি এবং তিন হাজারের বেশী ব্যক্তির আহত হওয়াকে অস্বাভাবিক বলে উল্লেখ করা হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যৌথভাবে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। স্যার আবদুর রহিম 'বাংলা মুসলমান' নামে একটি দল গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের গঠনের ভিত্তি হলো একান্তভাবেই ধর্মীয়। 'মোসলেম দর্পণ' পত্রিকাতে একটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল এই বলে যে মুসলমান সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে সরকারী সাহায্য একান্তই প্রয়োজন, নতুবা হিন্দুরা মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। অবশ্য বাংলাতে হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৭ই মে একটি সভা আহ্বান করেও লর্ড লিটন ব্যর্থ হন।

২২শে মে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে (কৃষ্ণনগর) স্বরাজ্য দলের প্রধান পাঁচ নেতা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' রদ করেন। ২৫শে জুন তাঁরা এক ঘোষণাতে বলেন যে বেঙ্গল প্যাক্টকে কখনোই কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদনের কথা বলেনি। ফলশ্রুতি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির লক্ষ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পক্ষে যে সহনশীলতার প্রস্তাব ছিল তা খারিজ হয়ে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে গড়া এই চুক্তিটি বাতিল হতে চললে দেশপ্রাণ শাসমল চুক্তিটিকে সমর্থন করে বাঁচিয়ে রাখার অন্তিম প্রয়াস চালিয়েও ব্যর্থ হন। শাসমল, যিনি এই চুক্তি সমর্থনের চেষ্টা করেন, তাঁকে তাঁর সহ-কংগ্রেসীরা, 'হিন্দু ধর্মের বিপদ' এই ধুয়ো তুলে পরের বছর মেদিনীপুরের একটি নির্বাচনে হারিয়ে দেন।[৬]

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কিছুটা বিপদ বুঝে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সমঝোতার প্রয়াসে হিন্দু মহাসভার কিছু গোষ্ঠীকে কাছে টানতে ব্যর্থ হন। নির্বাচনটা সামনে দেখেই লাজপত রায় ও সংবেদীর সহযোগীদের নিয়ে মদনমোহন মালবীয় একটি স্বাধীন কংগ্রেস দল গঠন করে বসেন, এব তো কর্মসূচীটাই ছিল উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা। ২৩শে ডিসেম্বরে আর্য সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জনৈক মুসলমান যুবকের ছুরিকাঘাতে মারা গেলে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাস এসে দাঁড়াল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 'সুদ্ধি'কে সামনে রেখে ধর্মান্তরিতদের পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। কেমন সোনায় সোহাগা, ইত্যবসরে আর্যসমাজী সংস্কারকদের সঙ্গে সনাতন ধর্ম-সভাপন্থীদের বা রক্ষণশীলদের একাত্মতা ঘটে। লক্ষণীয় এর পরেই তিলকের পুরোনো দিনের অনুগামী কে. বি. হেডগেবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন ; যা হিন্দুত্বের ধুয়োকে আরো বেশী চকচকে করে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার মোড়ককে। মূলত মুসলিম লীগের বিপরীতে 'হিন্দ-হিন্দী-হিন্দু -ও পরোক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করেছিল বৈকি !

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন গৌহাটিতে হলে স্বরাজ্য দলের গোঁড়া নেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন, এই সময়টাতে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডে ডায়ার্কি প্রথা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ভারত সচিব চেয়েছিলেন ডায়ার্কি প্রথা চালু হোক এবং তার পরেই আসুক স্বরাজাবাদীদের দাবী মোতাবেক স্বরাজ প্রতিষ্ঠার কথা। কিন্তু আয়েঙ্গাব চান আগে স্বরাজ এবং পববর্তীতে ডায়ার্কি। আশ্চর্যের কথা মুসলিম লীগেও

এবারের অধিবেশনের শুরুতেই বিভাজন ঘটে গেল। মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব থেকে স্যার মহম্মদ সফী বেরিয়ে গেলেন। কার্যত মিঃ জিন্না এবারে মুসলিম লীগের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন।

এ বছরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ। ১৯২৫-এর ২৫শে ডিসেম্বরে লেবর স্বরাজ পার্টিব মুখপত্র হিসেবে 'লাঙল'কে দেখি প্রকাশিত হতে ; প্রধান পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (কবি)। কিন্তু ১৯২৬-এর ১২ই আগস্ট 'লাঙল' হলো 'গণবাণী'। পত্রিকার কভারে লিখে দেয়া হয়েছিল 'লাঙল' 'গণবাণী'র সঙ্গে মিশে গেল। মুজফ্ফব আহ্মদের মতে :

> নাম পরিবর্তনেব কাবণ ছিল। 'লাঙল' নাম হতে বহু লোক মনে করতেন যে 'লাঙল' শুধু কৃষকদেরই কাগজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের কাগজ ছিল শ্রমজীবী জনগণের কাগজ।[৭]

ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমায় সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে জমিদার মহাজনদেব এক বিরোধে কৃষকদের হাত থেকে ধনিক শ্রেণী জমি কেড়ে নেয়। চাষী কিষানের স্বার্থে ঘীওরহাটে এক প্রজা সম্মেলনে (মূলত গরিব ভূমিহীন চাষীদের প্রতিবাদী সভা) ফজলুল হক সভাপতির জ্বালাময়ী ভাষণে আন্দোলনে কী কর্মপন্থা হবে তা ব্যক্ত করেন। জমিদার-মহাজনেরা কৃষক-প্রজার দাবী মেনে নিয়ে জমি ফেরত দিয়ে আপস করে। পূর্ব বাংলাতে ফজলুল হকের এই প্রচেষ্টা তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে।

২০শে মার্চ (১৯২৭) দিল্লির মুসলিম সম্মেলনে মিঃ জিন্না সভাপতিত্ব করেন, মুসলমানদের দাবীসমূহের এখানে চূড়ান্ত রূপ পেল, এটাই পরবর্তীতে দিল্লি মুসলিম প্রস্তাব নামে খ্যাতি লাভ করে। ২৯শে মার্চ মিঃ জিন্না সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, দিল্লী প্রস্তাবে গৃহীত যৌথ নির্বাচন প্রথার তাৎপর্য অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারছেন না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই বোম্বেতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ঐ প্রস্তাবগুলি অনুমোদন কবে। যৌথ নির্বাচন প্রথার প্রস্তাবকে সমর্থন করার শর্ত হিসেবে দেখা যায়—(ক) স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসেবে সিন্ধুর দাবী, (খ) সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে গুরুত্ব দেয়ার কথা, (গ) জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব হতে হবে বাংলা ও পাঞ্জাবে, (ঘ) কেন্দ্রীয় পরিষদে কোনো অবস্থাতেই এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না মুসলমান প্রতিনিধিত্ব। তবুও এ বছরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরতি ছিলো না। বরিশালের কুলকাঠী গ্রামে হিন্দুদের এ শোভাযাত্রাকে উপলক্ষ্য করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিসকে গুলি চালাতে হয়, এতে হত হলো ১৭ জন মুসলমান এবং আহত হলো ১২ জন। এক বছরে ৩১টি দাঙ্গা প্রমাণ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা কতো তীব্র আকারে প্রকাশ পেয়েছিল।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর মাঁসে বাংলার খড়গপুরে রেল কর্মচারীরা ধর্মঘট করে ; এর পরিচালনায় কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিলো উল্লেখযোগ্য। বলতে হবে ভি. ভি. গিরি, সি. এফ. অ্যাণ্ডরুজের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকদের আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। অধ্যাপক সুমিত সরকার বলেন :

> ১৯২৭ ছিল নিঃসন্দেহে এক নতুন শ্রমিক অভ্যুত্থানের সূচনা। এই বছরে নষ্ট-হওয়া শ্রম দিবসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০২ লাখ, আর কিছু কিছু কেন্দ্রে অনেক বেশী র‍্যাডিকাল ও ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট নেতৃত্ব উঠে আসে। ১৯২৬-এ ট্রেড ইউনিয়নগুলি সর্বপ্রথম কিছু

> আইনি নিরাপত্তা পায় এমন একটি আইনের মাধ্যমে অন্যথায় সেটি ছিল যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক-স্বার্থ-বিরোধী—অ-নথিবদ্ধ ইউনিয়নগুলির তহবিল সংগ্রহ কার্যত বেআইনি করে দেওয়া হয়, ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের মধ্যে 'বহিরাগত'-র উপস্থিতির ঊর্ধ্বসীমা ৫০% এ বেঁধে দেওয়া হয়, আর পৌর ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন তহবিল ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় (এটি ব্রিটিশ প্রথার একেবারে বিপরীত, ব্রিটেনে লেবর পার্টির বড় আর্থিক সহায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি)।[৮]

অধ্যাপক সরকারের বক্তব্যকে সামনে রেখে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে নতুন গড়া কমিউনিস্ট পার্টিও শিল্প-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে চলেছে; পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাব ভারতে তৃতীয় শক্তি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির স্থান দখল। শুধু শ্রমিকদের লড়াই নয়, কৃষক এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর লড়াইও এসময় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিজোলিয়ায় বিজয় সিং পথিক, মানিকলাল বর্মা, হরিভাউ উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নয়া আবওয়াব ও বেগারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম শুরু হয়। এ বছরেই অস্পৃশ্য বলে পরিচিত মাহাররা তাদের প্রথম মাহার রাজনৈতিক সম্মেলনের সময়ই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে নিজেদের অবস্থানকে তুলে ধরে ডঃ আম্বেদকরের কিছু অনুগামী 'মনুস্মৃতি' পোড়ায়।

ভারতের বড়লাট ৮ই নভেম্বরে ঘোষণা করে দিলেন, ভারতের জন্যে স্যার সাইমনকে চেয়ারম্যান করে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৬ জন সদস্যের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এক কমিটি তৈবী হচ্ছে; উদ্দেশ্য হলো ভারতীয়দের হাতে সীমিত ক্ষমতা হস্তান্তর। এই কমিশনে কোনো ভারতীয় থাকলো না বলেই জাতীয় কংগ্রেস একে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি; মিঃ জিন্নাও একই কারণে সাইমন কমিশনকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন এবং তারবার্তায় ইংলণ্ডে শ্রমিক দলকে সে কথা তিনি জানিয়েও দেন। উল্লেখ্য, মুসলিম লীগকেও তিনি এই কমিশনকে সমর্থন না করার কথা জানিয়ে দেন। তিনি মুসলিম লীগের ১৯তম বাৎসরিক অধিবেশনে (৩০শে ডিসেম্বর—১লা জানুয়ারি, ১৯২৮) সভাপতির ভাষণে বলেন :

> পণ্ডিত মালব্যকে আমি স্বাগত জানাই এবং কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মঞ্চ থেকে হিন্দু নেতারা আমাদের প্রতি যে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছেন, তা আমি পরম সমাদরে গ্রহণ করছি। আমার কাছে তাঁর এই প্রস্তাব ব্রিটিশ সবকারের প্রদেয় তাবৎ-সুযোগ সুবিধার চেয়ে অধিক মূল্যবান। সুতরাং তাঁদের বন্ধুত্বের হাত যেন আমরা গ্রহণ করি।[৯]

মিঃ জিন্নার এই ভাষণ প্রমাণ করে যে তিনি এবং মুসলিম লীগ জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলতে চলেছেন এবং কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বীকার করে নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মিঃ জিন্না এবং লীগ সু-সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে মহম্মদ আলী আন্সারীর সভাপতিত্বে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হলো : (১) সাইমন কমিশন বর্জনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানানো হবে ; (২) স্বরাজের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র প্রণয়ন প্রয়োজন ; (৩) জওহরলাল নেহরু উত্থাপিত 'পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা' (Complete National Indipendence) প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা। সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্তও এখানে গৃহীত হলো।

পুরোনো রাজভক্ত হয়েও পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ব্রিটিশ নীতির দ্বারা ভারতীয় পুঁজিপতিদের ক্ষতির সম্ভাবনা (ব্যবসাক্ষেত্রে) অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য

বিষয়কে মিশিয়ে ব্রিটিশ শাসককুলের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের প্রতিবাদ করেন (টাকার অতিমূল্যায়ন, ১ টাকা = ১শিঃ ৬ পেঃ)। 'মানিকে মানিক চেনে' প্রবাদের মতোই ঠাকুরদাসের সঙ্গে স্ব-শ্রেণীর বিড়লাও যুক্ত হলো, গড়ে তুললো ব্রিটিশ পুঁজিবাদের 'অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার'-এর অনুকরণে 'ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এবং ইণ্ডাষ্ট্রি', সংক্ষেপে এফ. আই. সি. সি. আই.।

পূর্বেই বাংলাতে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি গঠিত হলেও কাছাকাছি সময়েই বোম্বাই (মুম্বাই), পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশেও এই পার্টি গড়ে ওঠে। কমিউনিস্টদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল এই পার্টি বলেই তাদের লক্ষ্য ছিলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব ছোট ছোট বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো এবং কংগ্রেসের ভেতরকার বামপন্থীদের একটা নির্দিষ্ট প্লাটফর্মে এনে দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটালো। আর এরই সঙ্গে সামাজিক বৈষম্যকে তাদের সামনে তুলে ধরা। এ বছরে বোম্বাইয়ে এ. আই. সি. সি উপলক্ষে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির প্রস্তাবগুলোতে দেখা যায় কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণাটা আদৌ সন্তুষ্টির নয়, তাদের মত হলো কংগ্রেস নেতৃত্ব সংগঠনটাকে এমনভাবে সাজিয়ে নিয়েছে যাতে নেতৃত্ব এবং তাদের মদতপুষ্টদেরই লাভালাভ নির্ণীত হয় ; কংগ্রেসের উচিত সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থকে উপেক্ষা করে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করা—আর সাম্রাজ্যবাদী ঘেরাটোপ থেকে সংগঠনকে টেনে এনে জাতির মুক্তির দিশারী করা। বয়স্ক ভোটের ভিত্তিতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ণ স্বাধীনতাকে তাদের অগ্রাধিকার দেয়াই তো উচিত। কেননা সাম্রাজ্যবাদের প্রজা হয়ে থাকা গ্লানিকর, এই অবস্থার উত্তরণ ঘটাতেই কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন বা সরাসরি নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামতে পারে; এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভিত হিসেবে গণজাগরণের জন্যে এদেরই অনতিবিলম্বে কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যিক।[১০]

ই এম. এস. নাম্বুদিরিপাদের এই প্রসঙ্গের বক্তব্যে দেখা যায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর কাছে কৃষক-শ্রমিকের সমস্যাগুলোর আশু সমাধান যেমন কাম্য সেভাবেই এসেছে স্বাধীনতার প্রশ্নটি, কেননা কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের পূর্বেই ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি স্বাধীনতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলো। বস্তুত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক পূর্বেই চেয়েছিলো জাতীয়তাবাদীদের নিয়ে ভারতে একটা সম্মিলিত বিপ্লবী গণ-আন্দোলন গড়ে উঠুক ; আর এর বাস্তবায়নের প্রচেষ্টাটা শুরু করেছিলো ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টির মধ্যকার কমিউনিস্টরা। তাঁরা কংগ্রেসের মধ্যকার বামেদের সঙ্গে একাত্মতা গড়ার যে প্রচেষ্টা চালায় তার আদর্শটা এখান থেকেই আসা। কলকাতার অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলাল নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেন; শ্রমিকদের বিশাল অভিযান তো প্রমাণ করেছিলো কংগ্রেসের মধ্যবর্তী বামেদের আর ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির সৌভ্রাতৃত্বের জোর কতোটা হতে পারে।[১১]

একটা জাগরণ—গণজাগরণ এসে আছড়ে পড়লো ১৯২৮-২৯, দেশের মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখলো আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার স্বাধীনতার প্রশ্নে আত্মাহুতির প্রতিজ্ঞা, কথাটাকে অন্যভাবেও বলা চলে—এই ভাগ্যান্বেষণে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করলো। একদল

নবীন কি বাংলা, ভারতের সর্বত্রই যেন শপথের কোলাহলে নিজেদের জানান দিলো। দেশের সীমানা অতিক্রম করে তাঁরা দেখলো দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন—শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে জোটবদ্ধ মানুষের দল ; ভারতও তার ঐতিহ্যে ফিরে এলো সংগ্রামী চেতনায়। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তার সঙ্গে সোচ্চারে ধ্বনিত হলো স্বাধীনতার দীপ্ত শপথ ; পুরনো দলের মধ্যে নবীনের প্রাণশক্তি বয়ে চললো নতুন স্রোতে।

ফেব্রুয়ারি (১৯২৮) মাসের প্রথমটাতে ব্রিটেন থেকে সাইমন কমিশন ভারতে আসে, উদ্দেশ্য ভারতের সংবিধানকে সংস্কার করা। কিন্তু ভারতীয়রা তো এটাকে মেনে নেয়নি, না মিঃ জিন্না, না গান্ধীজী—তবে? বলা হলো, সাইমন কমিশন ফিরে যাও। আর এদেরকে বয়কটের উদ্দেশ্যে সারা ভারতে হরতাল পালিত হলো। কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক প্রমোদ ঘোষালের উপর পুলিস লাঠি চালায়। হরতাল এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতা উত্তাল হয়ে ওঠে। কলকাতায় ছাত্রীদের কোনো মিছিলে অংশগ্রহণ সম্ভবত এই প্রথম।

এই কমিশনটা নিয়োগের কর্তাব্যক্তি লর্ড বার্কেনহেড। তিনি যে সেক্রেটারি অব স্টেট-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ; তাঁর ভাবনাগুলোর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল এমনতরো যে, ভারতীয়রা—ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ কখনোই সহমতের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কারের পথে যাবে না এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণে ক্ষমতাহীন। তাঁর এ জাতীয় ভাবনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলো ফেব্রুয়ারি-মে-আগস্টে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। প্রবীণ মতিলাল নেহরু পরিকল্পনাটা দাঁড় করালেন বলেই এটি নেহরু রিপোর্ট নামে পরিচিত হলো। কিন্তু কাজের কাজ এগোলো কতদূর ?

> ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ভাগের প্রতিনিধিগণ এবং তেজবাহাদুর সাপ্রু, আলী ইমামের মতো উদারপন্থী নেতারা যোগ দিয়েছিলেন। আগস্ট মাসে এই সম্মেলন নেহরু রিপোর্ট নামে পরিচিত একটা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে ভারতবর্ষের সংবিধানের একটা ছক দেওয়া হয়েছিল। স্বশাসিত ডোমিনিয়নের ভিত্তিতে সংবিধান তৈরীর কথা এই ছকে বলা হয়েছিল। নেহরু রিপোর্টে নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বপ্রকার অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছিল। সমাজবাদী এবং বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এই পরিকল্পনার সমালোচনা করে বলেন যে এতে স্বাধীনতার লক্ষ্য পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং জমিদারী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মালিকানার স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১২]

আগস্টের সর্বদলীয় সম্মেলনে রিপোর্টটি গৃহীত হলেও সেটি ছিল সংখ্যার দিক দিয়ে কম প্রতিনিধির। সিদ্ধান্ত হলো এই রিপোর্টকে আরো বেশী প্রতিনিধির মতামতের লক্ষ্যে উপস্থিত করানো; আর এজন্যেই কলকাতায় ডাকা হলো সর্বদলীয় সম্মেলন ডিসেম্বর মাসে। সভাপতিত্ব করলেন মুসলমান জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ এম. এ. আন্সারী। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিলো মুসলিম, শিখ, হিন্দু-মহাসভার প্রতিনিধিদের আপত্তিতে। নেহরু রিপোর্টের মূল-সংক্ষিপ্তকে এভাবে তুলে ধরা যায় :

(১) অবিলম্বে ডোমিনয়ন স্ট্যাটাস ঘোষণা ; (২) যৌথ নির্বাচন কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন সভায়

এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ; (৩) লোকসংখ্যার ভিত্তিতে অমুসলিম প্রদেশে মুসলিম আসন সংরক্ষণ; (৪) ওয়েটেজ প্রথা বিলোপ; (৫) সীমান্ত, বালুচিস্তান ও সিন্ধুকে আলাদা প্রদেশ রূপে স্বীকার; (৬) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও বয়স্ক ভোটাধিকার ঘোষণা; (৭) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র; (৮) কেন্দ্রে দায়িত্ববান সরকার (যার হাতে রেসিডুয়ারি ক্ষমতা থাকবে; (৯) পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও সংরক্ষিত বিভাগ লোপ এবং (১০) রাজন্যবর্গের ওপর কর্তৃত্ব।[১৩]

কলকাতা সম্মেলনে রিপোর্ট পেশের পূর্ব পর্যন্তও মতিলাল নেহরুর মনে আশা ছিলো যদিও রিপোর্টে বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম আসন সংরক্ষণের বিষয়টি বাদ পড়েছে, তবুও তা মিটিয়ে নেয়া সম্ভব হবে বাংলাতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মাধ্যমে এবং পাঞ্জাবে প্রাদেশিক কমিটির সাহায্যে; কিন্তু কার্যত তা হলো না, বরং উলটো গেয়ে চললেন মুসলিম লীগের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিখ সদস্যরা। উগ্র হিন্দু মতবাদের ধারক হিন্দু মহাসভার সদস্যরা তো সহনশীলতার পাঠ পড়েননি—তাই তারা আক্রমণ করলেন উভয় সম্প্রদায়কেই। মিঃ জিন্নাও এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তবে তাঁর দায়িত্বটাও ছিল অনেক বেশী; তিনি জানতেন যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত এগোনো যাবে না। অথচ মুসলিম লীগের মধ্যকার কট্টরপন্থীদের বোঝানও সম্ভব নয়—আবার হিন্দু মহাসভার সদস্যদের আক্রমণ যতোটাই অযৌক্তিক ঠিক ততটাই তাঁর পক্ষে মেনে নেয়া অসম্ভব।

> Between the time of the drafting of the Nehru Report, and its presentation at the conference in Calcutta, the Muslim League had drawn up a series of amendments which had been sent to the Nehru Committee The main proposals were that, under any future Constitution, a minimum of one-third of the elected representatives in both houses of the Central Legislature should be Muslims, also that 'residuary powers' should be vested in the Provinces - thus ensuring that the Muslim-majority Provinces should be autonomous, and not menaced by a Hindu-majority Centre
>
> These moderate proposals had been ignored by the Nehru Committee, who had instead adopted the 'principle' that, 'wherever such reservation has to be made for the Muslim minority, it must be in strict proportion to its population.'
>
> In a long speech, during which he repeated the demands of the Muslims, with fine emphasis, Jinnah expressed his grief, and disgust, over the short-sighted policy of the Nehru Committee's recommendations, which would oust the Muslims from any fair part in India's political future. Jinnah said, "I am exceedingly sorry that the Report of the Committee is neither helpful nor fruitful in any way whatsoever. .I think it will be recognized that it is absolutely essential to our progress, that a Hindu-Muslim settlement shoud be reached, and that all communities should live in a friendly and harmonious spirit in this vast country of ours "
>
> He then spoke of majorities, "apt to be oppressive and tyrannical," and of minorities, with their "dread and fear that their interests and their

> rights " might "suffer and be prejudiced " Then, with great skill, which is apparent even in the cold printed record of his speech, he repeated his demands—justice for the Muslim minority, and, above all, unity He warned the Conference of the dangers of a Constitution under which minorities felt insecure, of the inevitable result "revolution and civil war "
>
> This formidable prophecy, which came true nineteen years later, did not impress his listeners The first speaker to follow him, Sir Tej Bahadur Sapru, dragged Jinnah's appeal and warning into the dust of personalities · although he was for giving him what he wanted, "and be finished with it," he talked of him as "a spoilt child, a naughty child "[১০]

মিঃ জিন্না বাধা পেলেন, মুসলিম লীগ সভা বর্জন করলো। মিঃ জিন্না ব্যথিত হলেন কিন্তু সমঝোতার কোন পথ খুঁজে পেলেন না, কেননা প্রতিটি সম্প্রদায়ই আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে নিজ নিজ পরিধিতে গোঁজ গেড়ে বসে আছেন। অথচ ভারতের সামনে সুযোগ এসেছিল স্বাধীনতার লক্ষ্যে—সৌভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টির।

শুধু সম্প্রদায়গত কারণেই এই সম্মেলন সার্থক হতে পারেনি তা তো নয়, কংগ্রেসের মধ্যেও ছিল এর প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে নরমপন্থী ও বামেদের ভিন্ন মত, একদল পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে, আর একদল ডোমিনিয়ন মর্যাদায় তুষ্ট। কতগুলি ক্ষেত্রে মুসলমানদের দাবী-দাওয়া রিপোর্টে স্থান পেলেও মুসলমান সম্প্রদায় এই রিপোর্টকে মেনে না নেয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচেষ্টাটা বাধা পেল। তবে একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই, জাতীয় কংগ্রেস আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মতোই নেতাদের মতামত অগ্রাহ্য করে রাজনীতিতে সুবিবেচনার পরিচয় দেয়নি ; কেননা মিঃ জিন্নারও ফিরে আসার পথ এই সম্মেলনে বন্ধ হয়ে গেল। যথার্থই বলেছেন প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় :

> ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলন জিন্না তথা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে গতি-পরিবর্তন ঘটায় এবং এর পর থেকেই জাতীয় কংগ্রেস মুসলমান জনগণ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে আসতে লাগল। তাই নেহরু রিপোর্ট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে ব্যর্থ হল ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে আরও প্রকট ও ব্যাপক করে তুলল।[১১]

এই রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো সব দল এবং সম্প্রদায়ই যে ভারতে দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন চান তার বহিঃপ্রকাশ, তবে সে তো পর্বতের মূষিক প্রসবের মতোই, আর যা আমরা পেলাম তা হলো বিচ্ছিন্নতাবাদ নামক এক বিষাক্ত সাপকে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়া হলো ; ভবিষ্যতে এরই প্রতিফলন ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতাকে তীব্র করে ছোবল মারবে।

১৯২৮-এর শেষে কলকাতায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হলো। বামঘেঁষা জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যমূর্তির দাবী ছিল পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণার, কিন্তু গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু এবং প্রবীণদের চাহিদা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কাছে তাঁদের হার মানতে হলো। তবে সিদ্ধান্ত একটা হলো, সরকার যদি 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' এক বছরের মধ্যে মেনে না নেন তা হলে পরবর্তীতে পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে কংগ্রস এগোবে। ১৯২৯-এর শুরুতে গান্ধীজীর

ইউরোপ সফরের সূচী বাতিল হলে, এ বিষয়ে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাতে ৩১শে জানুয়ারি তিনি লিখলেন :

> আমি যদি এখন ইউরোপে চলে যাই তা হলে আমার মনে হবে পালিয়ে যাচ্ছি। ...আমার অন্তরের মানুষটি আমাকে বলছে পথে যা কিছু আসুক না কেন তার মোকাবিলা করার জন্যে আমাকে সব সময় শুধু তৈরী থাকলেই চলবে না, আমার কাছে সেটা বিরাট কর্মসূচী তা নিয়েও পর্যন্ত আমাকে ভাবতে হবে ও তা কার্যকর করার উপায় খুঁজে বের করতে হবে। সর্বোপরি আমাকে তৈরী থাকতে হবে আগামী বছরের সংগ্রামের জন্যে, তা রূপ যাই হোক না কেন।[১৮]

গান্ধীজী নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়েছিলেন গোটা ভারত ঘুরে বেড়ানোর, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ-এর মাধ্যমে মত বিনিময়ের কিন্তু ভবিষ্যৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অথবা পূর্ণ স্বরাজ এর কোনোটার প্রতিই কংগ্রেসকে পরিকল্পনা মাফিক পরিচালিত করতে চাননি। তাঁর নিজের জনসংযোগ বৃদ্ধি হলো বটে, কংগ্রেসকেও বললেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য তৈরী হতে। কলকাতার একটা পার্কে ৪ঠা মার্চ বিদেশীর বস্ত্রে আগুন ধরিয়ে বহ্ন্যুৎসবের সূচনা করলেন, কিন্তু পরিকল্পনা মাফিক ধারাবাহিক রাজনৈতিক উত্তরণের সিঁড়ি প্রস্তুত করতে মূলত তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন; তাই মানুষ খেপানোর কাজ বেশী হয়েছিল। সংগঠিতভাবে শক্তি বৃদ্ধি ঘটেনি। 'বিভিন্ন স্তরে কংগ্রেসের প্রস্তুতি ছাড়াও'—কংগ্রেসের এই সময়ের 'প্রস্তুতি'র ব্যাখ্যা করেননি বিপান চন্দ্র তাঁর 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে।

> About half-past eight next morning, Mr. Jinnah left Calcutta by train, and I went to see him off at the railway station He was standing at the door of his first-class coupé compartment, and he took my hand. He had tears in his eyes as he said, 'Jamshed, this is the parting of the ways.'[১৯]

কলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলন (ডিসেম্বর, ১৯২৮) থেকে মিঃ জিন্না ফিরে যাচ্ছেন, একবুক হতাশা সঙ্গী করে ক্লান্ত করুণ এক চেতনার শিকার হয়ে; তিনি তো ছিলেন 'হিন্দু-মুসলমান মিলনের অগ্রদূত', অথচ দেশের সার্বিক উন্নতিব জন্য—স্বায়ত্তশাসনের জন্যে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না। নিজ সম্প্রদায় ও দলের মুখপত্র হয়েও সর্বদলীয় সম্মেলনে স্থান লাভে বঞ্চিত এবং ক্ষুব্ধ তিনি। মুসলিম লীগও দ্বিধা-বিভক্ত, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একাংশের নেতারা তো কংগ্রেসে থেকেও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভবিষ্যাত নিয়ে হিন্দু সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদের ভয়াবহ শাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে অপারগ। একদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের হিত-চেতনা, অন্যদিকে আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের লড়াই-এ পরাভব স্বীকারে অনিচ্ছুক মিঃ জিন্না মাত্র তিন মাস সময় নিলেন। অন্যদিকে শফি-লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও অবস্থাটা খতিয়ে দেখতে সচেষ্ট হলো, মূলতঃ জিন্না-শফি বিরোধ মুসলমান সম্প্রদায় এবং দেশকে কি আর কতোটা দিতে পেরেছে। বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অল্প সময়েই মধ্যস্থদের প্রয়াসে জিন্না-শফি উভয় লীগের সদস্যদের কাছাকাছি আসার প্রবণতা দেখা দিল ও প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করলো। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রীর মৃত্যুতে মিঃ জিন্না শোকার্ত হলেও ভুলে গেলেন না সম্প্রদায়ের কথা, ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার উচ্চাশার পাশাপাশি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পবিবেশকে। একশ' ভাগ ধর্মীয় আলখেল্লায় জড়িত আগা খাঁ-

এর সঙ্গে পুনরায় হলো যোগাযোগ, আগা খাঁও হলেন উল্লসিত। মার্চে দিল্লীতে লীগের সম্মেলনে বিবদমান মুসলিম গোষ্ঠীগুলো এলো কাছাকাছি। অল্প সময়ের মধ্যেই লীগের এই অধিবেশনে ভারতের ভবিষ্যত সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা অপরিহার্য বলেই মেনে নিলেন উপস্থিত প্রতিনিধিগণ; অনুমোদন পেল চৌদ্দ দফা। চৌদ্দ দফা সম্পর্কে জামালুদ্দীন আহমদের মতামত প্রণিধানযোগ্য :

> দফাগুলি খুঁটিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে কোন না কোন প্রকারে ওগুলিতে পরবর্তীকালে পাকিস্তান সৃষ্টির বীজ অন্তর্নিহিত ছিল।...কায়েদ-এ-আজম যেমন সাবলীল এবং যুক্তিযুক্তভাবে চোদ্দ দফা থেকে পাকিস্তানের দাবীতে উত্তরণ করেন এবং এর ফলে যেভাবে সমগ্র উপমহাদেশের জন্য এক অদ্বিতীয় রাজনৈতিক কাঠামো খাড়া করার ব্যাপারে ব্যর্থতার দায়িত্ব হিন্দু নেতাদের উপর বর্তায় তা প্রবল রাজনৈতিক ভূয়োদর্শনের দ্যোতক।[১৮]

এই চৌদ্দ দফাগুলি হলো :

(1) The form of the future constitution should be federal with the residuary powers vested in the provinces

(2) A uniform measure of autonomy shall be granted to all provinces

(3) All legislatures in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality

(4) In the Central Legislature, Muslim representation shall not be less than one-third

(5) Representation of communal groups shall continue to be by means of separate electorates as at present : provided it shall be open to any community, at any time, to abandon its separate electorate in favour of joint electorate

(6) Any territorial redistribution that might at any time be necessary shall not, in any way, affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and N.W.F. Province

(7) Full religious liberty, i.e., liberty of belief, worship and observance, propaganda, association and education, shall be guaranteed to all communities

(8) No bill or resolution or any part thereof shall be passed in any legislature or any other elected body if three fourths of the members of any community in that particular body oppose such a bill, resolution or part thereof on the ground that it would be injurious to the interests of that community or, in the alternative, such other method is devised as may be found feasible and practicable to deal with such cases

(9) Sind should be separated from the Bombay Presidency

(10) Reforms should be introduced in the N. W. F. Province and Baluchistan on the same footing as in other Provinces.

(11) Provision should be made in the constitution giving Muslims an adequate share along with the other Indians, in all the Services

of the State in local self-governing bodies having due regard to the requirements of efficiency.

(12) The constitution should embody adequate safeguards for the protection of Muslim culture and for the protection and promotion of Muslim education, language, religion, personal laws and Muslim charitable institutions and for their due share in the grants-in-aid given by the State and by the self-governing bodies

(13) No cabinet, either Central or Provincial, should be formed without there being a proportion of at least one-third Muslim Ministers

(14) No change shall be made in the constitution by the Central Legislature except with the concurrence of the States constituting the Indian Federation.[১৯]

২০শে মার্চ সরকার পূর্ব পরিকল্পনা মাফিক অভিযান চালিয়ে ৩১জন শ্রমিক নেতাকে আটক করে উত্তর প্রদেশের মীরাটে পাঠায়। লক্ষণীয়, ১৯২৮-এর গোটা বছরটা এবং ২৯-এর প্রথম দু'মাস ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক অসন্তোষ প্রবল আকার ধারণ করেছিল। বিভিন্ন কল-কারখানাতে ধর্মঘট-হরতালের ফলে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল অতীতের থেকে রেকর্ড পরিমাণে। ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যাও বেড়েছিলো অতি দ্রুত লয়ে।

১৯২৮ সালে ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করে।

১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দেব সরকারী রিপোর্টে এই উক্তি দেখা যায়। (ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট "India in 1928-1929"-এ বলা হয়,"The industrial life of India was far more disturbed than during the preceding years") ভারতের শিল্প জীবন ছিল পূর্ববর্তী বৎসরগুলির তুলনায় অনেক বেশী অশান্ত। অর্থনৈতিক দুর্দশার ফলে একদিকে জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করল, অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতিতে এই সময় থেকে সাম্যবাদী আন্দোলন সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কমিউনিস্ট দল ও নেতাদের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।[২০]

দেশের সর্বত্র যখন বিপ্লববাদীদের কর্মতৎপরতা ও শ্রমিক আন্দোলনের বৃদ্ধি ঘটেছে এমনি সময় ১৫ই জুলাই কংগ্রেস কার্যনির্বাহিক সমিতি ব্যবস্থাপক সভা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু ২৬শে জুলাইয়ের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক ঐ সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেয়। গান্ধীজী পুনরায় কংগ্রেসের হাল ধরেন। ১৩ই সেপ্টেম্বরে বিপ্লবী যতীন দাস লাহোর জেলে ৬৮ দিন অনশনের পরে মারা গেলে ভারতের সর্বত্রই গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর এই মৃত্যুতে ভারত সরকার বিচলিত হলো, সারা ভারতে—বিশেষত বাংলাতে ছাত্র-যুবদের উত্তেজনা ও আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। পরিতাপের বিষয়, গান্ধীজী এবং তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' উভয়ই মূক ও বধির, তাঁর এই আচরণের একটি কারণ সহজেই অনুমান করা যায়—রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রতি অনীহা ; বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনের মৃত্যু প্রসঙ্গে তার নীরবতা হঠকারী আচরণ মাত্র। আগস্ট মাসে পাঞ্জাবের 'নওজোয়ান ভারত সভা' শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করে বোঝাতে চায় 'বিপ্লব জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য'। শুধু পাঞ্জাব নয়, ভারতেব প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই কল-কারখানাগুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নতুন মাত্রা

লাভ করে। বিশেষত বোম্বাইয়ের (মুম্বাই) সুতাকলগুলিতে মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন গিরনি কামগার ইউনিয়নের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর নেতৃত্বে ছিলেন মীরাজকর, ডাঙ্গে, জোগলোকর, সহযোগিতা করেন বেন ব্রাডলে (Ben Bradley)। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে গিরনি কামগার ইউনিয়ন এপ্রিল-আগস্টে দ্বিতীয়বার সাধারণ ধর্মঘট করে ; নেতৃত্ব দেন দেশপাণ্ডে, বি.টি. রণদিভে—তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। এই সময়ে জুলাই-আগস্টে বাংলার চটকলগুলিতে প্রথমবার সাধারণ ধর্মঘট হলো বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের তদারকিতে। অবশ্য ১৯২৮ সালের অন্য একটি ধর্মঘটও কংগ্রেস ও বাংলার প্রশাসনকে ভাবিয়ে তুলেছিল, হাওড়া ও কলকাতার মেথর, ঝাড়ুদারদের ধর্মঘট। এর মূলেও ছিলেন ওয়ার্কাস অ্যাণ্ড পেজাণ্ট পার্টির সদস্যারা, নেতৃত্বে কমিউনিস্টরাই। কলকাতাতে এদের নিয়ে দুটি ধর্মঘট হলো, আর এদের নিয়ে কাজ করতে হবে বলে 'দি স্ক্যাভেঞ্জার্স ইউনিয়ন অব বেঙ্গল' (The Scavenger's Union of Bengal) গঠন করা হলো। এ দুটি ধর্মঘটের মূল নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ববর্তী বলশেভিক মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। মোদ্দা কথা ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে কমিউনিস্টরা যে একটা বড় ধরনের শক্তিতে পরিণত হচ্ছে এবং তারা সূতাকল, চটকল, সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে অন্ত্যজ শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যেও বলশেভিক চিন্তা-ভাবনা প্রচারে সক্ষম হচ্ছে—এটাকে সরকার খুব সাধারণ বিষয় হিসেবে দেখতে পারেনি। ১৯২৮-এর মাঝামাঝি থেকেই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে, যাঁরা কমিউনিস্ট নয় অথচ এই ধরনের শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ও নেতৃত্বে রয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার ষড়যন্ত্র মামলার প্রস্তুতি শুরু করে।

প্রাথমিকভাবে ভারত সরকাবের হোম ডিপার্টমেন্টের বিশেষ কর্মরত অফিসার মিঃ আর. এ. হারটন ১৫ই জানুয়ারি যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে বাংলা থেকে ছিলেন—(১) মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, (২) ডি. কে. গোস্বামী, (৩) শিবনাথ ব্যানার্জি, (৪) শামসুল হুদা, (৫) এস. এন ঠাকুর। ১৫ই মার্চ তারিখে মীরাটের D M. মিঃ ই. এইচ. এইচ. এডির আদালতে আসামীদের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার স্বাক্ষর হয়। মীরাটের সেশনস্ আদালতে অভিযুক্তদের বিবৃতি দেয়া শুরু হয়েছিল ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মার্চে ; রাধারমণ মিত্র প্রথম বিবৃতি দিয়েছিলেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের আলোচনার সূত্রপাত ধরেই এই মামলার অভিযুক্তরা (বাংলা সহ অন্যান্য প্রদেশের অভিযুক্তরাও) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা তাঁদের নীতি ও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে আদালতকে ব্যবহার করবেন ; এই নীতি ও আদর্শ একান্তভাবেই বলশেভিক চিন্তা-ভাবনায় লালিত ছিলো।

ভারতে শিল্পগত বিষয় এবং বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরতদের জন্য ব্রিটিশ সরকার পরিকল্পিতভাবেই 'হুইটলি কমিশন' গঠন করেন। এই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য হলো এ. আই. টি. ইউ. সি.-র বিভাজন সৃষ্টি করা ; উল্লেখ্য, ১৯২৮-য়ে সংগঠনটি আদর্শ হিসবে বেছে নিয়েছিল সমাজতন্ত্রকে। হুইটলি কমিশন প্রথমটাতেই কংগ্রেসের মধ্যকার বামঘেঁষা আর নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ ঘটাতে চেষ্টা করে, এ. আই. টি. ইউ. সি.-র মধ্যেও বিভাজন সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদের সুবিধাকল্পে—ট্রেড ইউনিয়নকে পরিচালিত করা এবং নতুন ট্রেড

ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে। শ্রমিক নেতা এন. এম. যোশী ও দেওয়ান চমনলাল হুইটলি কমিশনে ভারতীয় হিসেবে স্থান পান; অতঃপর এ বছরের এ. আই. টি. ইউ. সি.-র নাগপুর সম্মেলনে প্রতিনিধিদের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও বিভাজন দেখা দেয়। ক্ষুব্ধ পরিবেশেই হুইটলি কমিশনকে বয়কটের সিদ্ধান্তের পরে দুটি প্রস্তাব পাশ হয়: (১) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের মুক্তির দাবী ও (২) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগের সঙ্গে এ. আই. টি. ইউ. সি-র সংযুক্তি। প্রস্তাব নিয়ে ভোট হলো, এবং ভোটে পাশও হলো। কিন্তু নরমপন্থী বা দক্ষিণপন্থীরা সম্মেলন ছেড়ে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করলেন ; ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বিভাজন নীতিকে প্রয়োগ করে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করে।

বছরের মাঝামাঝিতে ব্রিটেনে শ্রমিক দল (Labour Party) মন্ত্রিসভা গঠনের পরেই প্রধানমন্ত্রি র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay MacDonald) ভারত বিষয়ক আলোচনার জন্য বড়লাট লর্ড আরউইনকে লণ্ডনে ডেকে পাঠান, আরউইন ভারতে ফিরলেন ২৬শে অক্টোবর। ৩১শে অক্টোবরে তিনি ভারত শাসন সম্পর্কে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' সম্পর্কিত এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে ভারতের সর্বদলীয় সদস্যদের নিয়ে এক গোলটেবিল সম্মেলনের আহ্বান জানান। অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আরউইনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে জানতে চান যে আলোচনাটা কি 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'-এর শাসনতন্ত্রের মতোই বা উপযুক্ত হবে কি না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এই বিবৃতিতে মিঃ জিন্নাও স্বাক্ষর করেন। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বড়লাটের বিবৃতি বিরোধীদের কঠিন সমালোচনার সম্মুখীন হলে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এবং ভারত সচিব ওয়েজ উডবেন পার্লামেন্টে যে বক্তব্য রাখেন তাতে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতাশ হয়ে পড়েন ; তাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বে ২৩শে ডিসেম্বরে বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন গান্ধীজী, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালবীয়, মিঃ জিন্না প্রমুখ ; কিন্তু বড়লাটের বক্তব্য তাঁদের হতাশ করে। লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা ও শক্তি-বীরত্বের কথা অকপটে প্রকাশ করেন, ইতিপূর্বে গান্ধীজীও বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোনো উপায়· নেই।

জওহরলাল নেহরু এই অধিবেশনে সভাপতি এবং এখানেই গত ডিসেম্বরে কলকাতার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়ে এভাবে প্রস্তাব পাশ হলো (১) 'নেহরু রিপোর্ট' আর চলবে না, পূর্ণ স্বাধীনতাই এখন কংগ্রেসেব লক্ষ্য ; (২) পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম হবে তাতে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে বলেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় থাকা চলবে না, সরকারী কমিটিগুলিতেও থাকা চলবে না। সভাগুলি থেকে পদত্যাগ যেমন করতে হবে তেমন করেই নতুন অংশগ্রহণ চলবে না। এখন থেকে গুরুত্ব দেয়া হবে গঠনমূলক কাজের প্রতি এবং অসহযোগ আন্দোলনও সংগঠিত করতে হবে, মায় খাজনা বন্ধ পর্যন্ত যেতে পারে।

১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রি ১২টার পরে বিপুল লোকজন সহ লাহোর অধিবেশনের সভাপাতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাভী নদীর তীরে ত্রিবর্ণরঞ্জিত স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। কেননা গত বার্ষিক অধিবেশনের (কলকাতা) পরে একটা বছর তো অতিক্রান্ত এবং এখানে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা আর চলে না। লাহোরে কংগ্রেসের

বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবকে সামনে রেখে এবং স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন পরবর্তী বিষয়কে বিশ্লেষণ করে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতামতকে আমাদের স্বীকার করতে হয়, পতাকা উত্তোলনের এই আবগ-উচ্ছ্বাস জাতীয় জীবনে মূল্য বহন করলেও এর মধ্যেই কতগুলি ঘাটতি ছিলো—ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়; আর বাংলার রাজনীতিতে এর প্রভাবটা হয় সুদুরপ্রসারী। গত জুলাই মাসের কংগ্রেস কার্যনির্বাহিক সমিতির প্রস্তাবের মধ্যে অসহযোগ ছিলো এবং ব্যবস্থাপক সভা বর্জনের কথাও ছিলো, যা বাংলার যতীন্দ্রমোহন এবং সুভাষচন্দ্র দুজনেই মেনে নিতে পারেননি। আইন অমান্য আন্দোলন কোথায়, কিভাবে হবে তা নির্ধারিণ করা হলো না—গান্ধীজীর উপর নির্ভরতা বাড়লো; বস্তুত এ সময়ে গান্ধীজী-ই কংগ্রেসের সর্বেসর্বা এটা খোলাখুলি স্বীকার করা হলো। এও বাহ্য, মূল বিষয়টা হলো সাম্প্রদায়িকতাব বিরোধ নিরসনের প্রচেষ্টা নিয়ে। পূর্বেই নেহরু রিপোর্ট খুশি করতে পারেনি বা সমাধান দিতে পারেনি মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের, এবারে কংগ্রেসের আশ্বাস হলো ভবিষ্যতে সংখ্যালঘুদের মতামত নিয়েই সংখ্যাগুরুরা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান ঘটাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সংখ্যালঘুরা ব্যবস্থা সন্তোষজনক মনে না করবে ততক্ষণ কোনো প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে এর ফলেই মুসলমান সংখ্যালঘুদের দাবীটা পরোক্ষে 'পাকিস্তান' পর্যন্ত পৌঁছতে প্রাথমিক পথ খুঁজে পেয়েছিলো।[২১]

গত ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টার পরে রাভী নদীর তীরে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হলো, ১লা জানুয়ারির (১৯৩০) প্রভাতে ভারতবর্ষ নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত। কংগ্রেসের নেতৃত্ব, সমগ্র জাতির ভবিষ্যত নির্ধারিণের প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন গান্ধীজী। তিনি দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন একাধিপত্যে।

২রা জানুয়ারি কংগ্রেসের নতুন কার্যনির্বাহিক কমিটির প্রথম অধিবেশন বসে, সিদ্ধান্ত হলো ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে পদত্যাগ করতে হবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো সদস্যই অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্ত মেনে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বাংলা প্রদেশের ৩৪ জন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদত্যাগ করেন। ২৬শে জানুয়ারি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহিক সমিতির স্থিরীকৃত 'পূর্ণ স্বরাজ দিবস' পালিত হলো; গ্রাম-গঞ্জ-শহর সর্বত্র পাঠ করা হয় গান্ধীজীর ঘোষণাপত্রটি ; এখানে কি অর্থনৈতিক—কি রাজনৈতিক—কি সাংস্কৃতিক— এমনি কি আধ্যাত্মিক বিষযের উল্লেখ করে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করা হয়। লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ—তাই আইন অমান্য আন্দোলন, রাজস্ব বন্ধের নির্দেশও কংগ্রেসের নামে প্রচারিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও গান্ধীজী ভাইসরয়কে ২রা মার্চে (১৯৩০) নিঃশঙ্ক থাকতে বলেন, কেননা এই ধরনের স্বাধীনতা প্রশ্নে ইংরেজের বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর আন্দোলন—সেটাও তিনি বন্ধ করতে পারেন স্বায়ত্তশাসনের সারবস্তুর প্রাপ্তি ঘটলে, তিনি ১১ দফা দিলেন। তাহলে লাহোরে 'স্বাধীনতা' নামে কি একটা প্রহসন ঘটেছিলো? এই ১১ দফাতে কিন্তু ব্রিটিশের শাসন থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্তির কোনোই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়নি।[২২]

বামপন্থী রাজনীতিবিদ ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ গান্ধীজীর এই ১১ দফাকে আরো কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাঁর মনে হযেছে গান্ধীজী পরোক্ষে এমন একটা শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার

কথা এখানে উল্লেখ করেছেন যা ব্যবসায়ী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর ও পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের জন্য কাম্য সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আর্থিক দিকগুলো এখানে তেমন করে স্থান পেলো না; অথচ সাধারণ মানুষ—শ্রমিক-কৃষক, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষই তো কংগ্রেসকে শক্তিশালী করেছে। এটা বললে কি অন্যায় হবে যে, স্বাধীনতার প্রশ্নটা ওঠার পরেই গান্ধীজী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপসে যেতেই ১১ দফা উত্থাপন করেছেন। পূর্বে অর্থাৎ লাহোর প্রস্তাবে আগে বা অল্প পরেও কংগ্রেস চাইলেও সাধারণের—ভারতীয়দের দাবীর কাছে মিটমাটের প্রশ্নটা অবান্তর ছিলো। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকবর্গ তো সহজ পথে হাঁটে না, তারা প্রচেষ্টা চালালো ধর্ম আর জাতপাতের ভিত্তিকে টেনে এনে নিজেদের সুবিধে মতো প্রয়োগ করতে। গান্ধীজী পড়লেন বিপদে, ব্রিটিশরা যে আপসে আসতে চাইছে না। এবারে পুরোদস্তুর কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামতে হবে, তবে অহিংস হতে হবে অবশ্যই। আর এজন্যে তো কংগ্রেসের জোতদার-জমিদার, এলাকার মোড়ল, ছোট থেকে মাঝারি-বড়ো শিল্প-কারখানার মালিকরা থাকছেই যাতে একটা জোরদাব আন্দোলন করা চলে এবং জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে যোগ দেয়। কংগ্রেসের একদল মাতব্বর তো তাকিয়ে থাকলো ব্রিটিশের সঙ্গে আলোচনার দরজাটা খুললেই তাকে যেন উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়।[২৩]

কার্যনির্বাহক সমিতির ১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে আইন অমান্য প্রস্তাবটা অনুমোদন পেল, অবশ্য এটা হতোই—কেননা এর জনক তো স্বয়ং গান্ধীজী। সমিতি আরো এগিয়ে সিদ্ধান্ত নিল গান্ধীজী-ই নেতৃত্ব দেবেন এই আন্দোলনের। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী বলেন:

> .....১৯৩০-এর ফেব্রুযাবি পর্যন্ত গান্ধী-হৃদয়ের পরিবর্তন হবে আশা করছিলেন। তা হল না। আপোসের সূত্র হিসাবে এগাব দফা দাবি পেশ করলেন তিনি। আরুইন ভুল করলেন তাঁর বাড়ানো হাত গ্রহণ না করে। এই সব দাবি কতকগুলি নির্দিষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং প্রায় সকল শ্রেণীর স্বার্থে রচিত। তিনি যেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য বিনিময়হার পরিবর্তন, স্বদেশী পণ্য সংরক্ষণ ও কোস্টাল টরিফ বেজার্ভেশন চান, তেমনি কৃষকদের জন্য খাজনার হার ৫০% হ্রাস এবং সকলের জন্য মাদক-বর্জন ও লবণ-কর লোপ। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি, মামলা প্রত্যাহার, পেনাল কোডেব ১২৪ এ ধারা, ১৮১৮-র ৩নং রেগুলেশন প্রভৃতি দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, গোয়েন্দাবিভাগ বিলোপ এবং আত্মরক্ষার্থ আগ্নেয়াস্ত্র রক্ষার অধিকার সন্ত্রাসবাদী ও কম্যুনিস্ট সকলের সুবিধার জন্য। সামরিক ও উর্ধ্বতন চাকুরির বেতন হ্রাসের ফলে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য টাকা বাঁচত।[২৪]

আমরা সহজভাবেই বুঝতে পারি জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজীর ১১ দফা ব্রিটিশ ভারতের কর্মকর্তাদের বিশেষত বড়লাটকে একটা আপসের সুযোগ দিয়েছিল। তাঁর দেয়া ১১ দফা পূর্ণ স্বাধীনতা বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা না বললেও সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের কম-বেশী হিতার্থেই ছিলো। —শ্রী ত্রিপাঠী 'সন্ত্রাসবাদী' ও 'কম্যুনিস্ট' উল্লেখ করে কী ধরনের খোঁচা দিলেন তা এখানে পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গান্ধীজীর ১১ দফা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন :

> ... এই কয়েকটি সংস্কার সাধন করিলেই আর আইন অমান্য আন্দোলনের প্রশ্ন উঠিবে না এবং গভর্ণমেন্টের কনফারেন্সে কংগ্রেস যোগ দিবে। গান্ধীর অন্ধভক্ত ব্যতীত সকলেই

তাঁহার ঘোষণা ও উপরোক্ত উক্তির মধ্যে যে অসঙ্গতি বিদ্যমান তাহা লক্ষ্য করিলে বিস্মিত হইবে যে, গান্ধী ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি না পাইলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন তাঁহার মুখে এই কথা! যিনি পূর্ণ স্বরাজের দাবি করেন ও তাহার জন্য অহিংস সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাঁহার পক্ষে শাসন সংস্কারের আবেদন করা কি ভূতের মুখে রামনামের মত শোনায় না?[২৫]

সত্যিই তো গান্ধীজীর ১১ দফাতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সুবিধের প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল, কিন্তু তার থেকেও অনেক গুণ বেশী জড়িয়ে ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর—স্বদেশী বুর্জোয়াদের। জীবন-যুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষদের লবণ-কর-এর মতো কিছু ছাড় দিতে চেয়েই গান্ধীজী রাভী নদীর তীরের উত্তোলিত পতাকাকে—পূর্ণ স্বাধীনতার স্পৃহাকে পাশে ঠেলে রাখতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব কংগ্রেস এবং জনতা মেনে নিল বটে কিন্তু গান্ধীজী বা জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এবং উদ্দেশ্য জনগণ জানতে পারেনি। ফলে এক কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে দেশবাসী তাকিয়ে থাকলো। কংগ্রেসের কর্মসূচী এবং তা রূপায়ণ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বসু জানতে চেয়েও বিফল হন, জওহরলাল নেহরুও বুঝে উঠতে পারেননি ভবিষ্যৎ অবস্থানটা কোথায়। আজকে সাধারণভাবেই প্রশ্ন ওঠে, গান্ধীজী নিজেও কি কোনো সিদ্ধান্তের নিশ্চিত রূপরেখা তৈরী করতে পেরেছিলেন নাকি পরিস্থিতির উপর নির্ভরতাই তাঁর বেড়েছিল শুধুমাত্র?

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলনকে বিস্তৃত করতে গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিযান করবেন এই সিদ্ধান্ত হলো। ১২ই মার্চে তিনি ৭৯ জন আশ্রমিক সঙ্গী সহ ডাণ্ডির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৬-১৩ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহ পালনের প্রথম দিনেই অর্থাৎ ভারতীয়দের কাছে বেদনার্ত স্মৃতিতে ভরা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের একাদশ বার্ষিকীতে লবণ আইন ভঙ্গের কথা ঘোষিত হয়। গান্ধীজীর এই ডাণ্ডি যাত্রার প্রভাব পড়ে বাংলাদেশেও। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত স্বেচ্ছাসেবক সহ মহিষবাথানে লবণ তৈরী শুরু করেন; বাংলার মহিষবাথান গৌরবের স্থান পেলেও পুলিস ও প্রশাসন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক ও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করতে দ্বিধা করেনি। একই কারণে জেলের ভেতরেও পুলিস অত্যাচার শুরু করে, অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর ওপরও অভাবনীয় নিষ্ঠুর আচরণ করে তারা। গান্ধীজী ধবশনার লবণের গোলা অধিকার করবেন বলে পত্র দিয়ে বড়লাটকে জানান। ৫ই মে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন; এই গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে দেশে হরতাল হলো, আব্বাস তায়েবজী ১২ই মে গ্রেপ্তার হলেন গান্ধীজীর পথকে অনুসরণ করতে গিয়ে। অতঃপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে স্থির হলো আইন অমান্যের কর্মসূচীকে আরো বিস্তৃত করা হবে। কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে পাশ হওয়া প্রস্তাবগুচ্ছ জনতাকে আরো বেশী আন্দোলনমুখী করে তুললো, সত্যাগ্রহে উদ্বেলিত জনতা আপসহীন দৃঢ়তা দেখালো। কিন্তু সরকার দ্বৈত-শাসন নীতির মাধ্যমে উৎপীড়ন চালাতে থাকে আন্দোলনকারীদের উপর।

১৪ই জুলাই তারিখে ব্যবস্থাপক পরিষদে এক প্রশ্নের মুখে সরকারের প্রতিনিধির উত্তর হলো—এপ্রিল-জুন এই তিন মাসে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে প্রশাসনকে ২৩ বার গোলাগুলি ছুড়তে হয় এবং এতে ১০৩ জন মারা যান এবং ৪০০-এর বেশী আহত হন।

সরকার ২৩শে এপ্রিল এক অর্ডিন্যান্স জারি করে সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ; কেননা আন্দোলনগুলির চরিত্র ও ব্যাপকতা সংবাদপত্রগুলি তুলে ধরছিলো। এই আইনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলিও প্রতিবাদ জানালো। দেশে জরুরী আইনেব দোহাই দিয়ে সরকার ১৩১খানা সংবাদপত্রের কাছ থেকে ২,৪০০০ টাকা জামিন আদায় করে। এ হেন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে বাংলাতে আনন্দবাজাব পত্রিকার ভূমিকা ছিলো গৌরবোজ্জ্বল, ইতিহাস সৃষ্টিকারী।

গান্ধীজীর আন্দোলনটার (অহিংস) পাশাপাশি অন্য রকমের সংগ্রামেরও প্রস্তুতি দেশের কোথাও কোথাও চলছিলো ; কেউ আখ্যা দিয়েছেন একে সন্ত্রাসবাদী বলে, কেউবা বলেছেন মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবী প্রচেষ্টা। এপ্রিলের ১৮ তারিখে বাংলায় বিপ্লবীদের এক কর্মতৎপরতা ভাবত সরকাবকে উদ্বিগ্ন করে তোলে, যুগপৎ স্বাধীনতাকামী মানুষ মাস্টারদা সূর্য সেনকে নায়কের মর্যাদায় এনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে।

গান্ধীজীর আহ্বানে ভারতবর্ষের সর্বত্র, শহর থেকে গ্রাম, পাহাড় থেকে সমতল, মরুভূমির ঊষর অঞ্চল থেকে শ্যামলিমা ঘেরা পরিবেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অহিংস সংগ্রাম বিস্তৃত হচ্ছে তবু তার ব্যতিক্রমী হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামে (সহিংস) নেতৃত্ব দেন ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মির নায়ক মাস্টারদা সূর্য সেন। আত্মোৎসর্গের মন্ত্রে নিবেদিত, সুসমন্বিত কর্মপ্রয়াসে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মির সদস্যবা (সংখ্যায় যাঁরা শতাধিকও নয়) চট্টগ্রামে দখল করে নিলেন পুলিস ছাউনি, শহরের পুলিস ফাঁড়িগুলো, শহরে তৈরী করলেন ব্যারিকেড ; সৈন্য বোঝাই ট্রেন তাঁরা আপাতত থামিয়ে দিতে পারলেন। কিন্তু পরিকল্পনা আর রসদের অভাবে সংগ্রামকে দীর্ঘস্থায়ী করতে ব্যর্থ হলেন। চট্টগ্রাম বন্দরকে তাঁরা জয় করতে পারেননি বলেই সে পথেই নেমে এলো ব্রিটিশ ফৌজেব আক্রমণ। পুলিস ছাউনিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাঁরা আশ্রয় নিলেন জালালাবাদ পাহাড়ে, অবশেষে সেখান থেকেও পালাতে হলো ; ধৃত হলেন ৩০ জনের মতো বিপ্লবী। কিন্তু গর্বের বিষয় হলো এই, কয়েকটা দিন ধরে গোটা শহরটা বিপ্লবীদের হাতের মুঠোয় ছিলো ; সে সময় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে তাঁরা স্বাধীনতার জয়গান গেয়েছেন। মুখোমুখি যুদ্ধে ১২ জন বিপ্লবী মাবা গেছেন কিন্তু সংগ্রামী চেতনায় আজও তাঁরা বাঙালীদের কাছে জীবন্ত—প্রেরণার উৎস। রফিক্‌ল ইসলাম যথার্থই বলেছেন :

> চল্লিশ বছর পর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছিল এই চট্টগ্রামেই, ক্যাপ্টেন রফিকেব নেতৃত্বে ই. পি. আর. এবং মেজর জিয়ার নেতৃত্বে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করল, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ও মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারিত হল। বিশ্ব জানল বঙ্গবন্ধুর ডাকে বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রামের কথা। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা সফল হয়নি, কিন্তু ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে বাঙ্গালী সৈনিকেরা স্বাধীনতাব জন্যে যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল, তা ব্যর্থ হয়নি।[১৬]

ইণ্ডিয়ান রিপাবলিক আর্মির সদস্যদেব আত্মত্যাগ, দুঃসাহসিক অভিযান ও কর্মসূচী রূপায়ণের প্রচেষ্টা উপমহাদেশের বিপ্লবীদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে ওঠে। তবে একথাও স্বীকার করে নিতে হয় যে রণকৌশলের দিক দিয়েই শুধু নয় একটি বিপ্লবী পার্টির রাজনীতিগত ত্রুটিও তাঁদের মধ্যে ছিলো; তাঁরা চারপাশেব শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষদের সঙ্গে

মিশে আস্থা অর্জনে সক্ষম হননি। পারেননি তাঁরা শহর-শহরতলীর সাধারণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক স্থাপন করতে যাতে শহর দখলে এলে তাঁরা বিপ্লবীদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারত। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে (বর্তমান পাকিস্তানে) সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফার খান পাঠান, আফ্রিদি, মোমানদিও অন্য সব উপজাতি মানুষদের একত্রিত করে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ফলে সমগ্র জনসমষ্টিই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল এককাট্টা হয়ে— যা গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। গাড়োয়ালী সৈন্যরা স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করলে তাঁদের যেমন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তেমনি পেশোয়ার শহর জনগণের দখলে ছিল ২৫শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত। সোলাপুরের পরিস্থিতি ছিলো আরো ভিন্ন ধরনের। এখানকার অধিকাংশই কলকারখানার শ্রমিকদের মধ্য থেকে উঠে আসা, তাঁরা কিন্তু জনগণের অন্যান্য অংশকেও সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিলেন। গান্ধীজী চৌরী-চৌরার ঘটনায় অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করেছিলেন এবং তাঁর 'Young India' এ বিষয়ে যথেষ্ট লেখালেখি করেছিল ; কিন্তু চট্টগ্রাম, গাড়োয়াল, এবং সোলাপুরের ঘটনাগুলি গান্ধীজীর হৃদয়কে ব্যথিত করেছিল কি না সে বিষয় আজ অবান্তর, কিন্তু তাঁর 'Young India' কিসের সাক্ষ্য বহন করে চললো। গাড়োয়ালী সৈন্যদের সম্পর্কে গান্ধীজীর মন্তব্য কি স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের কাছে মর্মান্তিক পরিহাস নয়! সবটাই কি শ্রেণীগত অবস্থানের বিষয়কে ব্যাখ্যা করে!

ভারতের সর্বত্র অসহযোগ-আইন অমান্য আন্দোলন বিস্তৃত রূপ পরিগ্রহ করলে প্রশাসন দমন-পীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে একে ঠাণ্ডা করতে চাইলো। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে বৃহত্তর জনগণকে অভিন্ন কর্মসূচী ও কর্মপন্থায় উজ্জীবিত করে রাজনৈতিক চেতনারও কিছুটা বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়েছিলো ; যেহেতু তাদের মধ্যে বিশেষত কৃষক-শ্রমিক-নিম্নমধ্যবিত্তদের মনে নতুন নতুন আশার সঞ্চার ঘটেছিলো। সত্যাগ্রহে স্ত্রী-পুরুষ এমন কী কিশোররাও অংশগ্রহণে এগিয়ে এসেছিলো। চারদিকে আইন অমান্য আন্দোলন, সত্যাগ্রহে জনতা উদ্বেলিত ; সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন পুলিসী তৎপরতা বৃদ্ধি করেও অনিশ্চয়তায় শঙ্কিত, ব্রিটিশ সরকার তখন নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে। জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ পেলে খেলাটা জমে ওঠে। ইতোমধ্যে কংগ্রেস ও সরকারের আপস ঘটাতে এগিয়ে এলেন 'ডেইলি হেরাল্ড' পত্রিকার ভারতস্থ সাংবাদিক মিঃ শ্লোকোম্ব, স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, মুকুন্দ রামরাও জয়াকর একই সঙ্গে সক্রিয়তা দেখান। তবে সরকার তো তখনও দ্বৈত শাসননীতির উপর নির্ভর করে সত্যাগ্রহী আইন অমান্যকারীদের ওপর উৎপীড়ন সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। একই সময়ে সরকার নিজেদের মনোনীত ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে সম্মেলন আহ্বান করে নিজেদের সদিচ্ছাকে প্রমাণ করতে চাইলো। এটাই তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের প্রেক্ষাপট। তবে মিঃ জিন্নাও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে ইতিপূর্বেই এক বড় চিঠি মারফত এ ধরনের একটা কিছুর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এখানে তাদের কোন প্রতিনিধি থাকলো না, গান্ধীজী তাই প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহণ করেননি। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কিন্তু কংগ্রেসের প্রতিনিধিহীন অবস্থার সুযোগটা কাজে

লাগালেন ভারতীয় সদস্যদের ভেতর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে একটু বেশী মাত্রায় উসকে দিয়ে। যদিও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন কংগ্রেসবিহীন এই গোলটেবিল বৈঠক পূর্ণাঙ্গ নয়।

মুসলিম লীগের অধিবেশন হলো ডিসেম্বর মাসে, এলাহাবাদে। সভাপতিত্ব করলেন দার্শনিক ও কবি মহম্মদ ইকবাল। তিনি তো মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় এককাট্টা। মিঃ জিন্না ইতোপূর্বে ১৯২৮-এ কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলনে নিজের প্রস্তাবগুচ্ছ পাশ করাতে না পেরে ক্ষুব্ধ ছিলেন, ১৯২৯-এও সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে নিজের মতের সপক্ষে সভার মতামত টানতে ব্যর্থ হয়েও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিজ নিজ স্বার্থকে রক্ষা করতে সহবস্থানের চেষ্টা চালান। কিন্তু স্যার মহম্মদ ইকবাল তাঁর সভাপতির দীর্ঘ ভাষণে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

> In December 1930 the All-India Muslim League met at Allahabad for its plenary session under Allama Iqbal who had also been, for some time past, anxiously studying the possibilities of a communal settlement, and, during the course of his presidential address, he put forward the principle of partition from the authoritative Muslim platform "To base a constitution," said he, "on the conception of a homogeneous India or to apply to India the principles dictated by British democratic sentiments is unwittingly to prepare her for a civil war"
>
> Iqbal said that the national idea was racialising the outlook of Muslims and thus materially counteracting the humanising work of Islam The construction of a policy on "national" lines, if it meant displacement of Islamic principles of solidarity, was simply unthinkable to a Muslim The unity of the Indian nation, therefore, must be sought not in the negation but in mutual harmony and cooperation of the many He was pained that the attempts of the Indian leaders to discover such a principle of internal harmony had failed so far He asked : "Why have they failed ? Perhaps we suspect each other's intentions and inwardly aim at dominating each other" He, for his part, held that events seem to be tending in the direction of mutual harmony, and declared that if the principle that the Indian Muslim was entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homelands was recognised as the basis of a permanent communal settlement, he would be ready to stake his all for the freedom of India
>
> To achieve this idea Iqbal believed that communalism in its higher aspects was indispensabel to the formation of a harmonious whole in a country like India The Muslim demand for the creation of Muslim India within India was perfectly justified. "Self-government within the British Empire or without it, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to be the final destiny of Muslims at least of North-West India" This centralrsation of the most living portion of the Muslims of India whose military and police service had (notwithstanding unfair treatment from the British) made British rule possible would eventually

solve the problem of India as well as of Asia Thus possessing full opportunities of development within the body-politic of India. the North-West Indian Muslims would prove the best defenders of India against foreign invasion both of ideas and bayonets "I, therefore, demand the formation of a consolidated Muslim State in the best interests of India and Islam For India it means security and peace resulting for an internal balance of power; for Islam an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian Imperialism was forced to give it, to mobilise its laws. its education, its culture. and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of modern time."[২৭]

তাঁর দীর্ঘ ভাষণের একটা অংশ জুড়ে মুসলমানদের জন্য পরিকল্পিত রাষ্ট্রের একটা চিত্র উপস্থিত হয়েছিল, সেখানে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের নাম থাকলেও বাংলাকে একইভাবে তুলে ধরা হয়নি। বাংলার মুসলমানদের কথা তাঁর বক্তব্যে ছিল না এমন নয়, তবে সেটা উল্লিখিত প্রদেশগুলির মতো মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তির বিষয় হিসেবে নয়।

১৯৩০-এর জানুয়ারিতেই গান্ধীজীর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঘোষিত হলো :

এই সুদীর্ঘ ঘোষণাপত্রে দফায় দফায় অর্থনীতিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইংরেজ সরকার যে সকল কুকর্ম দ্বারা দেশের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে তাহার বর্ণনা করিয়া পরে গান্ধী যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম 'এই চতুর্বিধ দুষ্কৃতির উৎস ব্রিটিশ শাসন মানিয়া চলিলে আমরা ঈশ্বর ও মানুষের কাছে অপরাধী হইব। আমরা বিশ্বাস করি যে, হিংসাত্মক কার্যের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে না। সুতরাং গভর্ণমেন্টের সহিত সমস্ত প্রকার সহযোগিতা বর্জন করিব, আইন-অমান্য আন্দোলন ও রাজস্বপ্রদান বন্ধ করিব এবং পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করিব'।[২৮]

কিন্তু স্বল্প বিরতিতেই গান্ধীজী Young India পত্রিকাতে প্রকাশিত ১১ দফায় পূর্বোক্ত ঘোষণাটির প্রাণ-ভোমরার দফা-রফা করেন ; ঘোষণা আর ১১ দফাতে অসঙ্গতি ; তবে কি গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার এও এক প্রচেষ্টা?

মিঃ জিন্না লীগ ও অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করেন ; আলোচ্য বিষয়টা হলো ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক। জাতীয়তার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ। অবশ্য সংখ্যালঘু মানসিকতায় সংশয় স্বাভাবিক ঘটনা হলেও তাকে রাজনৈতিক ভিত্তিদানে তাঁর প্রাচেষ্টা। স্ব-জাতীয়দের (স্ব-ধর্মীয়দের বলাই ভাল) স্বার্থ-রক্ষায় নির্দিষ্ট অধিকারসূচী প্রণয়নকে সামনে রেখে আইন-অমান্য আন্দোলনকে বিশ্লেষণের দ্বারা মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে উজ্জীবিত করা-ই এ সময়ে যেন মিঃ জিন্নার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। যদিও দাবীর ক্ষেত্রে তিনি স্বাতন্ত্র্য চাইলেন, কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে সহ-অবস্থানে তিনি ঐকমত্য। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত প্লেনারি সেসনে কবি ও দার্শনিক ইকবালের বক্তব্যে আমরা দেখেছি, তিনি সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনাকে প্রচারের মাধ্যমে এনে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের সহ-অবস্থানের প্রশ্নে অবশ্যই মুসলিম নেতৃত্ব নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবেন। নতুবা ব্রিটিশের গণতন্ত্রীকরণের কথা ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু ভারতীয় জাতি-সত্তাকে

তিনি বিনষ্ট করার পক্ষপাতি নন, তবে এটা তো সিদ্ধান্তে একান্তই উপনীত হওয়া দরকার যে, ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থানটা কী হবে!

১৯৩১-এর মার্চ মাসটি ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে নানা কারণেই। নিখিল ভারত শ্রমিক ও কৃষক দলের করাচী সম্মেলনে কতকগুলি কর্মসূচী ঘোষিত হল : (ক) সর্বপ্রকার শোষণের হাত থেকে শ্রমিক ও কৃষকদের রক্ষা করা বা মুক্ত করা, (খ) সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসানের লক্ষ্যে ও স্বাধীনতা অর্জনকে সামনে রেখে কৃষকদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, (গ) বিবিধ ঋণ মকুব ও শিল্পগুলিকে জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়া ও বাস্তবায়নের জন্য দলকে অভিমুখী করা। অনেকে মনে করেন 'ঠেলায় পড়ে বাপের নাম'-এর মতোই বিপ্লবীরা এ সময় বিপ্লববাদ ছেড়ে অথবা সন্ত্রাসবাদ ছেড়ে শ্রেণীসংগ্রাম সমন্বিত সমাজতন্ত্রী আদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তবে একথা সত্য যে, এ সময়ে বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র আত্মীক পর্যায় গিয়ে পৌঁছাতে পারেনি বা শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমেও সহ-অবস্থানে পৌঁছায়নি; কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এটা ছিলো প্রস্তুতিপর্ব। আদর্শবাদী যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজ বিশ্লেষণের আদর্শ স্থান লাভ করে যা পরবর্তীতে ভারতের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থায় নেতৃত্বের প্রশ্নে তৃতীয় শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ শাসকবর্গের কাছে স্থান দাবী করে। উল্লেখ্য, বাংলার বাইরের বিপ্লবীদের অবস্থান কিন্তু বাংলা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি বললেই চলে, তাঁরা পুরনো ভাবধারাতেই প্রায় ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাটিয়ে 'কমিউনিস্ট সংহতি' গঠন করেন। এই ভাবধারায় উজ্জীবিতদের অধিকাংশই হলেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুব সম্প্রদায়।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস বা গান্ধীজীর অনুপস্থিতি প্রমাণ করেছিল ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগঠন ও তার নেতৃত্বকে বাদ দিয়ে বৈঠক পূর্ণাঙ্গ নয় এবং বৃহত্তর কোনো সিদ্ধান্ত ভারতের জন্যে নেয়া সম্ভব নয়। এ অবস্থাকে সামনে রেখেই ব্রিটিশ সরকার উদ্যোগী হয়েছিল কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বে থাকা গান্ধীজীর সঙ্গে আপস করতে। ব্রিটেনে শ্রমিকদল ক্ষমতায় এলে ওয়েজ উডবেন ভারত সচিবের দায়িত্ব পেলেন, তিনি বড়লাট লর্ড আরউইনকে বললেন গান্ধীজীর সঙ্গে আপস আলোচনা চালাতে। বড়লাটও ১৭ই জানুয়ারি আইনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে বসেন, ২৬শে জানুয়ারিতে গান্ধীজী সহ অনেক কংগ্রেস নেতাই জেল থেকে মুক্তি পেলেন; কংগ্রেসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞাটাও প্রত্যাহার করে নিলেন 'প্রত্যাশা'র নিদর্শন রেখে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে লর্ড আরউইনের আলোচনা শুরু হলো, ৪ঠা মার্চে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সামনে গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবের খসড়া ফেলে দিলে দ্বিধাহীনভাবে পাশ হলো, কেননা গান্ধীজীর প্রস্তাব—আটকে দেবে কে? কিন্তু ফলটা কিছু অদ্ভুত, এই চুক্তির ফলে কংগ্রেসের বিপ্লবীয়ানাতে ঘা খেলো, তবে দেশীয় পুঁজিপতিরা এখন স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলছে।

প্রশ্নটা এমনধারা যে গান্ধীজী আপস-রফার পক্ষপাতী যদি না হন তবে আপোসে গেলেন কেন? তিনি কি দেশীয় শিল্পপতিদের ইচ্ছেটাকেই বাস্তবে রূপ দিলেন মাত্র, নাকি অন্য কিছু? তবে এটা অনুমান করা অসংগত হবে না, ১৯৩০-এর শেষটায় গণমুখী জঙ্গী আন্দোলন পুঁজিপতিদের স্বস্তি দিচ্ছিলো না; অন্যদিকে গান্ধীজীও সাধারণের এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত মারমুখী

ও প্রসূতির জন্য ছুটি—অধিবেশনে প্রগতির প্রতীক বলে চিহ্নিত হয়ে ওঠে ; সঙ্গে যে থাকলো শ্রমিক-কৃষকদের ইউনিয়ন গড়ার সপক্ষে কথা। এর পাশাপাশি আর যা হলো :

> করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে (২৯শে মার্চ, ১৯৩১) গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হইল। সভাপতি সর্দার প্যাটেল লাহোর অধিবেশনের প্রস্তাব বিসর্জন দিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের গুণগান করিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কংগ্রেস যে-প্রস্তাবে গান্ধী-আরউইন চুক্তির অনুমোদন করিল, সেই প্রস্তাবেই বলা হইল যে 'কংগ্রেস ইহা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিতেছে যে আমাদের পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্য অটুট ও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।' যে-চুক্তিতে অর্থনীতি, বৈদেশিক সম্বন্ধ, সৈন্য-বিভাগ—এ সকলের উপরই ব্রিটিশের ক্ষমতা অব্যাহত রহিল সেই চুক্তি গ্রহণ করিয়াও আমাদের পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ কি রূপে অক্ষুণ্ণ রহিল—'মহাত্মা' বা মহাত্মার শিষ্যগণ ব্যতীত আর কাহারও তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এইরূপ অদ্ভুত ও অসংগত প্রস্তাব কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত করিতে সম্মত হন নাই। তিনি বলিলেন, ইহা তাঁহার মত ও যুক্তির বিরোধী (It went against his grain)। পরে অবশ্য যথারীতি তিনিই শেষ মুহূর্তে (গান্ধীর আজ্ঞায় বা অনুরোধে?) এই প্রস্তাব আনিলেন এবং তখন বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে কংগ্রেস সদস্যগণ গান্ধীজীর জয়ধ্বনিতে সভামণ্ডপ সচকিত করিয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।[৩১]

করাচী কংগ্রেসের আলোচিত এবং গৃহীত সামগ্রিক ধারা-উপধারা বা প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো আর একটা বড়ো সত্য এর মধ্যে গূঢ়ভাবে স্থাপিত রয়েছে। গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে এখানে স্বীকার করে নেয়া হলো পাকাপাকিভাবে, আর স্বীকার করে নেয়া হলো দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (প্রস্তাবিত) কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধীজীকে ; অর্থাৎ কর্তাব্যক্তিরূপে মনোনীত হলেন তিনি। সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—কংগ্রেসের ভেতরকার বামপন্থী বলে পরিচিত নেতৃবর্গ চুক্তিটাকে যে-ভাবেই দেখুন না কেন গান্ধী এবং কংগ্রেস এ সময় একই অর্থ বহন করতে থাকে। এর বিরূপ ছায়াও অবশ্য কোথাও কোথাও পড়ে, বাংলাতে লেখাপড়া জানা যুবকদের বৃহত্তর একটা অংশ কংগ্রেস আন্দোলন এবং গান্ধীজীর অহিংসবাদী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করে. প্রকৃতপক্ষে দিল্লি চুক্তি তাঁদের আরো বেশী হতাশ করে। ১৯৩১ সালে সন্ত্রাসবাদ বেশ জাঁকিয়ে বসে বাংলাতে, এপ্রিলে মেদিনীপুরের জেলা শাসক মিঃ পেডি খুন হলেন, ত্রিপুরায় ডিসেম্বরে খুন হলেন মিঃ স্টিভেন্স, ৯টি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল আর হত্যার চেষ্টা হলো ৯২টি। এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, স্কুল ছাত্রী শান্তি ও সুনীতি চৌধুরী স্টিভেন্সকে হত্যা করেন ; বস্তুত মহিলাদের এ ধরনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ এই প্রথম হলো এবং তা জনজীবনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো। চট্টগ্রামের ৫২টি গ্রামকে ঘোষণা করা হলো বিপজ্জনক বলে—উপদ্রুত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হলো। ১৬ই সেপ্টেম্বরে হিজলী জেলের বন্দীদের উপর চললো গুলি, এখানে মৃত্যুও ঘটলো কয়েকজনের। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ সভায় ভাষণ দিলেন। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে কোনো যোগসূত্রে হদিস পেলেই পুলিস তাদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করলো, ২৯শে অক্টোবরে এ সম্পর্কে একটি নগ্ন আদেশবিধি জারি করা হলো সরকারের পক্ষ থেকে। সরকার এও বলতে শুরু করলো যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খুদা-এ-খিদমতগারদের কংগ্রেসে ঢুকিয়ে দিল্লি চুক্তিকে লঙ্ঘন করা হয়েছে।[৩২]

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন শুরু হলো ৭ই সেপ্টেম্বরে। ব্রিটেনের রাজনৈতিক

অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই গোলটেবিল বৈঠকের মধ্যবর্তী সময়ে, প্রধানমন্ত্রীর আসনে একই ব্যক্তি মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড; কিন্তু ঘটেছে তাঁর দলগত পরিবর্তন। তিনি লেবর পার্টি ছেড়ে দিয়ে টোরির সমর্থনে সরকার গঠন করেছেন, ভারত সচিব হয়েছেন স্যার স্যামুয়েল হোর। রাজনৈতিক দল বদলের সঙ্গেই ঘটেছে সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ক আদর্শ ও নীতিতে অনেকটাই রদ-বদল। স্যার স্যামুয়েল হোর ভারত বিষয়ক চিন্তাভাবনায় আন্দোলনমুখী ভারতকে তরঙ্গক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে সামাল দিয়ে ব্রিটেনের ব্যবসায়ীদের (বিশেষভাবে বস্ত্রকলগুলির মালিকদের) আশ্বস্ত কবার চেষ্টা করেন এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক মন্দাকে কাটিয়ে ওঠার প্রয়াসী হন। ভারতের মধ্যে অবস্থাটা হলো আরো বে-কায়দায় পড়ার মতোই, কেননা আমদানি শুল্ক, আয়কর, রেলপথ থেকে উপার্জন—সব জায়গা থেকেই তো রাজস্ব হ্রাসমান। প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার তুলোর শুল্ক ৫% বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন, আর মিঃ হোর চেষ্টা চালালেন অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারটা ব্রিটিশের হাতে পুরোটা-ই রাখতে; ব্রিটেন বা ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থটা এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা চেয়েছেন ভারতে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে সরকার পুরোটাই রক্ষা করুক, অন্তত রক্ষার প্রতিশ্রুতিটা এই সময় দিয়ে দিক।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের কোনো প্রতিনিধি ছিলো না, গান্ধীজীরও অংশ গ্রহণের প্রশ্ন ওঠেনি; দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কিন্তু অংশগ্রহণ করেই তিনি পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তাঁর এই বক্তব্য তো ব্রিটিশ সরকার মেনে নিতে পারে না, কেননা তখনও তারা এদেশ ছেড়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনায় ছিলো না, বরং নিজেদের স্বার্থ ও ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন পদ্ধতি ছিলো তাদের চিন্তা-চেতনায়; তাই দেশরক্ষা বা আর্থিক বিষয়টা সম্পূর্ণ ভারতীয়দের হাতে তারা দিতে পারে না। প্রশ্ন ওঠে তাহলে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা কী ছিলো? মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তো ভারতকে স্বাধীনতা দেয়ার অঙ্গীকার করেনি, প্রধানমন্ত্রীর যে আগ্রহ ছিলো এমন কথাও শোনা যায়নি। তবে? ভারতে সমস্যা তো একটা রয়েছেই। ভারতে হিন্দু-মুসলিম, হিন্দু-খ্রিস্টান, হিন্দু-শিখ, উন্নত-অনুন্নত সম্প্রদায়—এই সবগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে ওঠে মুখ্য আলোচ্য বিষয়। রাজনীতি, কূটনীতিতে অভিজ্ঞ মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সমর্থ হলেন আগত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এই মর্মে লিখিয়ে নিতে যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আসন বাটোয়ারার যে ফর্মুলা দেবেন আগত বিভিন্ন ধর্মের এবং শ্রেণীর প্রতিনিধিরা তা মেনে নেবেন। অবশ্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের পরস্পরের প্রতি নমনীয়তা এবং সহনশীলতারও যথেষ্ট অভাব ছিলো এ কথা স্বীকার করেই বলতে হয় যে, সেই সুযোগটাই ব্রিটিশ সরকার পাকাপাকি কাজে লাগালো।

> The second Round Table Conference failed the harmony in which the delegates had met in 1930 was shattered in 1931. The rival leaders merely transplanted their fierce domestic squabbles from India to London, and they stirred up unreasonable scenes whenever the communal problem was discussed. The closing sessions met in an atmosphere of suspicion and contempt : the suspicion of the Indians for each other, and their common contempt for Britain. The Confer-

ence ended with a rebuke from Mr. Ramsay MacDonald Ôe said

> We shall soon find that our endeavours to proceed with our plans are held up-- indeed they have been held up already -if you cannot present us with a settlement acceptable to all parties as the foundations upon which to build In that event, His Majesty's Government would be compelled to apply a provisional scheme, for they are determined that even this disability shall not be permitted to be a bar to progress.

The delegates went home. with their angers. leaving the British Government to apply Thier own provisional scheme for communal representation. later included in the Government of India Act of 1935 [৩৩]

নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও রাজনৈতিক উচ্চাশার সঙ্গে মুসলমান জাতিসত্তার বিকাশ ও স্থায়িত্বের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েও মিঃ জিন্না এ সময় পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন ভারতীয় জাতীয়তাবোধে। তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন অখণ্ড ভারতের মধ্যে মুসলমানদের জন্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে। তাঁর পরবর্তী মানসিকতা গঠনে অন্যান্যের সঙ্গে স্যার মহম্মদ ইকবালের বন্ধুত্ব ও প্রেরণা, আদর্শ ও চিন্তাভাবনা কাজ করেছিল। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ইকবালও একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের বিষয়টি নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে ভাবলেন :

> Iqbal advocated partition : he even demanded, and defined the frontiers of a proposed "consolidated Muslim State", which, he believed would be "in the best interests of India and Islam." He said, "I would like to see the Punjab, the North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan, amalgamated into a single state ... the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India." Jinnah met Sir Muhammad Iqbal many times in London, and they were good friends. But, despite his disillusionment, Jinnah did not yield to Iqbal's arguments. Almost a decade was to pass before he admitted that he had "finally been led to Iqbal's conclusions, as a result of careful examinations and study of the constitutional problems facing India." [৩৮]

সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফলই নোতুন ঢোঙ্গায় উপস্থিত হলো। কেননা ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে সমঝোতাহীন অবস্থাকে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের প্রতিনিধির (গান্ধীজী) সামনেই প্রমাণ করলো। বস্তুত, দারুণ আর্থিক মন্দার মধ্যেও মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও টোরি স্বদেশের প্রতি নিজেদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে পার্লামেন্টকে দেখালেন। গান্ধীজীর এই বৈঠকে যোগ দেয়া এবং পূর্বের বৈঠকে যোগ না দেয়া প্রায় একই অর্থ বহন করলো ; তাঁর চেষ্টার কোনো সুফল ভারতে এসে পৌঁছালো না। বরং কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে আমরা দেখি কিছুটা গুরুত্ব হ্রাসের শিকার হতে, লাঞ্ছনার অংশীদার হতে।

আমরা দেখেছি গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে গান্ধীজী পূর্ণ স্বরাজ থেকে পিছিয়ে 'Young India' তে প্রকাশিত ১১ দফাতে অবস্থান করছিলেন, তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ

সরকার গান্ধীজীর হাতে বা কংগ্রেসকে কোনো প্রাপ্তিযোগ দেখতে দেয়নি। ভগৎ সিং এবং তাঁর সাথীদের ফাঁসি থেকে বাঁচানো তো দূরের কথা, জেলবন্দী অসংখ্য কংগ্রেস কর্মীদেরও তিনি মুক্ত করতে পারেননি; সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে বিপ্লবীদের হয়ে সওয়াল করাও। সর্বোপরি গোলটেবিল বৈঠক থেকে শূন্যহাতে প্রত্যাবর্তন সচেতন কংগ্রেস কর্মীদের মনে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা জাগ্রত করার সুযোগ তৈরী করে দেয়। কিন্তু গান্ধীজী যেহেতু গান্ধীজী—তাই তিনি দেশে ফিরে শূন্যহাতেও কংগ্রেসের সামনে দাঁড়ান; ২৮শে ডিসেম্বরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকবর্গের দুরভিসন্ধি—ভারতে তাদের নতুন করে অত্যাচারের পরিকল্পনার কথা। এ সময় তো কংগ্রেস-ই পারে দৃঢ়তায় দাঁড়িয়ে থাকতে। গান্ধীজী ভারত সরকারের নয়া দমন-পীড়নের কথা জানাবার জন্য বড়লাট উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন তিনি। এবার গান্ধীজী কী করবেন?—অথচ দেশবাসীর বৃহত্তর অংশ এতটা অত্যাচার-দমন-পীড়নকে সহ্য করেও গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থাশীল। এবার আবার আইন-অমান্য আন্দোলন, কংগ্রেস কার্যনিবাহী কমিটির সামনে এই একটা মাত্র পথ যা আরো বেশী উৎপীড়ন-অত্যাচারের সামনে দাঁড়াতে বলে। ২৯শে ডিসেম্বরের তারবার্তায় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স, সংযুক্ত প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশে সরকারী অত্যাচারের কথা তিনি উইলিংডনকে জানান এবং এ অনুরোধও তিনি করেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস তাঁর পরামর্শ প্রার্থনা করে। ৩১শে ডিসেম্বরে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি এক তারবার্তায় গান্ধীজীকে জানান, গান্ধীজীর আবেদন সরকার গ্রহণ করতে পারছে না, বাংলা সহ অন্যান্য প্রদেশের উপর যে অত্যাচাব চলছে তাকেও সরকার সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে করে। এর পরে কংগ্রেস পড়লো বিষম ফ্যাসাদে; একটা আন্দোলন শুরু করা ব্যতীত উপায় কী! কিন্তু যদি একটা আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু হয় তার একটা কারণ জনসাধারণকে, সরকারকে জানাতে হবে। ১লা জানুয়ারিতে (১৯৩২) গান্ধীজী পুনরায় তারবার্তা পাঠালেন বড়লাটকে ; বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্পর্কে সরকারের অভিযোগের একটা উত্তর থাকলো। তিনি বললেন বাংলাতে সন্ত্রাসবাদীরা যে হিংসার পথ নিয়েছেন তা তিনি অনুমোদন করেন না এবং তাদের সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের তিনি নিন্দার যোগ্য বলেই মনে করেন। এবং সরকার এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তাঁর কিছুই বলার থাকবে না। কিন্তু সরকারের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হবে প্রশাসনে, উদাহরণ হিসেবে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের কথা তিনি ব্যক্ত করেন, কেননা তার মধ্যেই সরকারী সন্ত্রাসবাদ নিহিত রয়েছে। বাংলা বা অন্যান্য প্রদেশের সমস্যাগুলি নিয়ে যেহেতু সরকার আলোচনাতে বসতে অনিচ্ছুক, তাই বাধ্য হয়েই তিনি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে উপদেশ দিচ্ছেন অহিংস পথে আইন অমান্য করতে সরকার যদি বিকল্প পথের সন্ধান দিতেন তবে নিশ্চিত তাঁকে এপথে পা দিতে হতো না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও যে প্রস্তাব নিয়েছে তাতে রয়েছে যে দিল্লি চুক্তিটা সরকারের তরফ থেকে বাতিল বলে বিবেচিত হওয়ায় এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কমিটি জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে তারা যেন ট্যাক্স না দেন

এবং কতগুলি শর্ত মেনে আইন অমান্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। গান্ধীজী বড়লাটকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মূল সিদ্ধান্তটিও জানিয়ে দিলেন।

আন্দোলন চালানোর ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং কমিটির প্রধান শর্ত হলো অহিংস আন্দোলনের সারবস্তুটা বুঝে নিয়েই অহিংস পথেই আইন অমান্য আন্দোলনটা চালাতে হবে, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতাও তাঁদের অর্জন করতে হবে। মূলত আত্মক্লেশের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া বজায় রেখে অত্যাচারীর মানসিক পরিবর্তন ঘটানোটাই হবে এই আন্দোলনের সার্থকতা। অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কটা জড়িত নয়, তাই যা যা করতে হবে সব নিজেদের দায়িত্বেই সম্পূর্ণ করতে হবে; তবে ব্রিটিশ অফিসার, পুলিস বা অন্যান্যদের কোনভাবেই ক্ষতি করা চলবে না। বিদেশী কাপড় বর্জন করতে হবে, হাতে বোনা খদ্দর আন্দোলনকারীদের পরিধান করতে হবে। লাঠি ও গুলির সামনে দাঁড়ানোর মত ব্যক্তিদেরই এই আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা উচিত। ব্রিটিশ পণ্যকে সর্বতোভাবে বর্জন করতে হবে। যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করে জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর আইন বা বিধি ভঙ্গ করা যাবে। আর অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আসা সব অন্যায় আদেশ ভদ্রভাবে ভঙ্গ করা যাবে।[৩৫] কিন্তু ৪ঠা জানুয়ারি জারি হলো কিছু অর্ডিন্যান্স, সরকার বাংলা, সংযুক্ত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সরকারী কর্মচারীদের প্রশাসনের হাতে এমন সব ক্ষমতা দিয়ে দিলো যাতে কারণ দর্শানো ব্যতীতই তারা যা খুশি তাই করতে পারতো; এমনি কি জেল জরিমানাও। গান্ধীজীর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে দেশে ফেরার আগে-ভাগেই এই সব অর্ডিন্যান্স সরকার তৈরী করতে উদ্যোগ নিয়েছিলো। এগুলোই ৪ঠা জানুয়ারি জরুরীভিত্তিতে দেয়া হলো। ফলশ্রুতি, কংগ্রেস হলো নিষিদ্ধ, গ্রেপ্তারী আদেশ বহাল হলো উচ্চ-মধ্য-নিম্ন সব রকমের কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর ; বিপ্লবীদের জন্যে তো পোয়া-বারো। বোঝা গেল ব্রিটিশের পরিকল্পনা, কংগ্রেস সহ ভারত থেকে সমস্ত বিপ্লবীদের অকেজো করার বাসনা। ভারত সচিব স্যার হোর থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রকাশ্যেই বলেও বেড়াতে থাকলেন নানাবিধ, আর সেগুলো কখনো বা হুমকির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছালো :

> এইবার আর যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকবে না, ঘোষণা করলেন হোর। প্রথম দিনেই শুধু বাংলাতেই নিদেনপক্ষে ২৭২টি সংগঠন নিষিদ্ধ করা হলো।[৩৬]

বিভিন্ন প্রদেশে সরকার ঢেঁড়া পিটিয়ে চণ্ডলীলা চালাতে শুরু করলে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতিও গেল খানিকটা বদলে। জাতীয় পতাকা তোলা, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে পোস্টার মারা বা পুস্তিকা ছাপিয়ে গোপনে প্রচার করার সঙ্গে অন্যান্য সব আনুষঙ্গিক ব্যাপার-স্যাপার ঘটলেও গণ-আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থাতে আরো দু' একটি বিশেষ বিষয় উল্লেখযোগ্য থাকে। এই আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান ছিলো তেমনি তো বিদেশী সাংবাদিকরা যাতে সরকারের কার্যকলাপের কালো দিকগুলো—অপশাসনের দিকগুলো উদাহরণসহ বিশ্ব জনমতের সামনে তুলে ধরতে পারে প্রচ্ছন্নভাবে তারও চেষ্টা হতো। কেননা গত আন্দোলনে সংবাদপত্রগুলি (দেশীয়) যে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলো তা বর্তমানে সম্ভব হবে না ; তাদের ওপরেও চলছে যে অভিনবত্বে ভরা

চণ্ডনীতি। আর কংগ্রেস—সে তো কাজের সুবিধের জন্য সভাপতির পদটা তুলে দিয়ে ডিক্টেটর প্রথা আনলো। প্রাথমিক পর্বে এই আইন অমান্য আন্দোলন বহু রকমের কাজকর্মের সঙ্গী হয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিলো তার গতি গত আন্দোলনেব ধারা থেকে তীব্র হলেও কংগ্রেস শেষমেষ ধরে রাখতে পারেনি, জনসাধারণের অনিচ্ছায় না হলেও নানা কারণে আন্দোলন ঢিমেতালে চলতে থাকে। কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এমন কোন সুযোগ সৃষ্টি হলো না যে এই আন্দোলনের তীব্রতাকে দিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনকে আপসে সম্মত করাতে পারে। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক, শ্রমিকদের মধ্যে বা ইউনিয়নগুলি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েও অনেকটা আপসমুখী হওযায় আন্দোলনের চরিত্রে ঘটলো হেরফের।

১৭ই আগস্ট, ১৯৩২-এ সরকার গান্ধীজীর চিঠিপত্র, অনুবোধ উপেক্ষা করে সংখ্যালঘু ও অনুন্নত শ্রেণীর স্বার্থে একতরফাভাবে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বা Communal Award ঘোষণা করেন। অবশ্য দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধিরা উপসংহারে সরকারের সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে এই রোয়দাদ মেনে নেয়া বস্তুত কঠিন বলে মনে হলো। যদিও বলা যায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর এটা একটা প্রচেষ্টামাত্র অনুন্নত শ্রেণীর মানুষদের সন্তুষ্ট করার এবং বিশেষ করে মুসলমানদের জন্যে। প্রশ্ন দেখা দেয় মিঃ জিন্না কি এটাকে মেনে নিতে পেরেছিলেন

> Mohammad Ali Jinnah was 'not satisfied' with the Award But, in a speech made in the Assembly, in February 1935, he said that he was prepared to accept it, because—having 'done everything to come to a settlement'—no 'scheme of constitution' would otherwise be 'possible' [৩১]

মিঃ জিন্না এবং গান্ধীজী—উভয়ের কাছেই এই রোয়েদাদ মনঃপূত হয়নি, অবশ্য এর কারণটাও ভিন্নতর।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের একটা সভাতে গান্ধীজী বলেছিলেন, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টানদের অর্থাৎ সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ যদি শাসনতন্ত্র দিতে পারে তবে তাতে তাঁর আপত্তি নেই; কিন্তু অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আলাদা ব্যবস্থাকে তিনি মেনে নিতে অনিচ্ছুক। এবং অনুন্নত শ্রেণীর জন্য যদি আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা হয—তবে তা তিনি প্রাণ দিয়ে হলেও প্রতিরোধ করবেন। আইনসভাতে অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধি থাকার তিনি পক্ষে কিন্তু এই নির্বাচন প্রথা যদি তাদেরকে হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে তবে তা অনুন্নত শ্রেণীর উপকার না করে বরং অপকার সাধন করবে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে মিঃ হোরকে ১৭ই আগস্টের পূর্বেই চিঠি লিখেছিলেন গান্ধীজী, ১৮ই আগস্টে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিলেন, অনুন্নত জাতিদের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা না করলে এর প্রতিবাদেই তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করবেন। গান্ধীজীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দেশে-বিদেশে শুরু হলো উদ্যোগ; ধূর্ত ম্যাকডোনাল্ড জানিয়ে দিলেন, অনুন্নত জাতিগুলিকে নিয়ে এ বিষয়ে ভারতীয়দের সর্বসম্মত যে কোনো প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার বিবেচনা করতে সম্মত।

গান্ধীজীর অনশনের ষষ্ঠ দিনে (২৫শে সেপ্টেম্বরে) অনুন্নত শ্রেণী আর বর্ণহিন্দুদের

কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় নেতার মধ্যে একটা চুক্তি হলো, এটাই বহুল আলোচিত পুনা চুক্তি। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট সব দলগুলো মিলেমিশে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করার কারণেই পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ব্রিটিশ সরকারকে মেনে নিতে হলো ; ফলশ্রুতি পূর্ব থেকেও বেশী আসন দেয়ার প্রস্তাব করা হলো অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে।

প্রদেশের নাম	১৯৩১ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো অনুন্নত জাতিগুলোকে যতগুলি আসন দিতে চেয়েছিল	১৯৩২ সালে আগস্ট মাসে সরকারের প্রস্তাবিত আসনসংখ্যা	পুনা চুক্তি অনুসারে প্রস্তাবিত আসনসংখ্যা
১. মাদ্রাজ	৪০	১৮	৩০
২. বোম্বাই	২৮	১০	১৫
৩. পাঞ্জাব	১০	০	৮
৪. বিহার ও ওড়িশা	১৪	৭	১৮
৫. সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস	২০	১০	২০
৬. অসম	১৩	৪	৭
৭. বাংলা	৩৫	১০	৩০
৮. সংযুক্ত প্রদেশ	২০	১২	২০
মোট	১৮০	৭১	১৪৮

(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ) থেকে নেয়া হয়েছে—পৃঃ ৪৯৫)

ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, এম. সি. রাজা প্রমুখ অনুন্নত শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ দেখলেন ১৯৩১ সালের সংখ্যালঘুদের প্রস্তাবিত আসনের চেয়ে বেশী আসন না হলেও সরকারের প্রস্তাবিত আসনের চেয়ে তো বেশী। অতএব, এক ঢিলে দুই পাখি মারা হলো—গান্ধীজীর জীবন বাঁচানোর চেষ্টাও হলো আর অনুন্নত শ্রেণীগুলির স্বার্থও অধিকমাত্রায় এভাবে সিদ্ধ হলো। খালিদ বি. সাঈদ এ বিষয়টির ব্যাখ্যার পাশাপাশি জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের আসনসংখ্যা একটি সারণির মাধ্যমে দেখিয়েছেন :

> According to this Pact, seats were reserved for Depressed Classes in various Provinces on a more generous scale than those awarded by the Communal Award. For each of these seats, a panel of four Depressed Class candidates would be elected by the Depressed Classes These four members would be candidates for election to each such reserved seat and the candidate from these four would be elected by the general non-Muslim electorate. In this way, Gandhi was successful in avoiding what he considered the defection of Depressed Classes from the Hindu community.

Province	Muslim Percentage of Population	Total Number of Seats	Number of Seats Reserved for Muslims
Madras	7·9	215	29
Bombay excluding Sind	9·2	175	30
Bengal	54 7	250	119
The United Provinces	15 3	228	66
The Punjab	57 0	175	86
The Central Provinces	4 7	112	14
Assam	33·7	108	34
Sind	70 7	60	34
N.W. F. Province	91·8	50	36
Bihar and Orissa	10 8	175	42

> Another conflict was concerning the powers of the Centre The Muslim position was that the residuary powers, that is, the domain over subjects not explicitly allocated to the Centre or the Provinces or to the concurrent jurisdiction of both, should rest with the Provinces. The Hindus were in favour of such powers being vested in the Centre. It may be noted that according to Section 104 of the Government of India Act, 1935, the residuary powers were vested in the Governor-General to be exercised in his discretion.[৩৮]

পুনা চুক্তির মর্মমূলে গান্ধীজীর আমরণ অনশন হলেও দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ—বিপ্লবীরা কি এটাকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছিলেন, এ প্রশ্ন সেদিনও ওঠে—আজকেও অবান্তর নয়। দেশের মধ্যে যেখানে সংখ্যাতীত কংগ্রেস সদস্য বিনা বিচারে আটক, বিপ্লবীরা কারারুদ্ধ, আইন অমান্য আন্দোলন প্রায় গোত্তা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে, ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস বা পূর্ণ স্বাধীনতা এর কোনটাকে নিয়ে অনশন নয়; হলো কিনা অনুন্নত শ্রেণীর অবস্থান নিয়ে। গান্ধীজী অনুন্নত শ্রেণীর বিষয়টি নিয়ে সফল হলেন বটে, জনসাধারণের দৃষ্টিটা কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলন (পূর্ণ স্বরাজ) থেকে গেলো সরে, এলো অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে নির্বাচনী আসন রফা, তাদের উন্নতির কর্মসূচী। আন্দোলনটা নেতিয়ে পড়লো যেন উঠে যাবে বলে অপেক্ষা করছে। গান্ধীজী জেলে থেকে ৮ই মে (১৯৩৩) আত্মশুদ্ধির জন্যে আর একটা অনশন শুরু করলেন, আর আইন অমানা আন্দোলনটাও কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থগিত হলো। বোঝা গেল যে কোনো অবস্থাতেই গান্ধীজী সরকারের সঙ্গে আপসে যেতে চাইছেন; সরকারও ঠায় দাঁড়িয়ে—কংগ্রেস শর্তহীন আত্মসমর্পণ করুক তবে তো! ভিয়েনা থেকে যুক্ত বিবৃতি দেখা গেল বিঠলভাই প্যাটেল এবং সুভাষচন্দ্র বসুর, তাঁরা সরাসরি বলেই বসলেন যে গান্ধীজী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ব্যর্থক নন—কংগ্রেসে দরকার এখন নতুন নেতৃত্ব। গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনটা যে স্থগিত রেখেছেন সেটা তো সরকারের কাছে হার স্বীকারের নামান্তর।

এমন যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (কংগ্রেসের মোড়ল এবং গান্ধীজীর বিশ্বস্ত চেলা) তিনিও সহজভাবে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেননি আন্দোলনটাকে স্থগিত রাখার বিষয়টি, এর ফলে আন্দোলনটা মরে গিয়ে কাগজে-কলমেই যাহোক কিছুটা দিন ছিলো।

১৯৩৩-এর মার্চে ব্রিটিশ সরকার ফেলে আসা গোলটেবিল বৈঠকগুলির সারবস্তু নিয়ে নিজেদের ইচ্ছের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন হোয়াইট পেপার দাখিল করে। এবং এপ্রিলে সংসদের উভয় সভার সদস্যদের নিয়ে ভাবতে নয়া সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার একটা যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হলে বিভিন্ন দল তাকে সমর্থন জানায়, মিঃ এটলি ব্যতিক্রম। তিনি ভারতীয়দের ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ সংসদের উভয় সভাতে ২রা আগস্ট ভারত শাসন আইন অনুমোদন পেলো।

ভারত শাসন আইনে (১৯৩৫) মুখ্য বিষয় ছিলো দুটি—প্রথমত একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন (Federal Government), দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হলেও মূল ক্ষমতা থাকছেই গভর্ণর জেনারেলের হাতে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করে শুধুমাত্র প্রাদেশিক গভর্ণর শাসিত প্রদেশগুলি, চীফ কমিশনারের প্রদেশ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ১১টি প্রদেশ এই আইনের আওতায় এসে স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে আমরা দেখব 'সাধারণ' ও 'সাম্প্রদায়িক'—এই দুই শ্রেণীতে তারা বিভক্ত। প্রদেশগুলোর অবস্থাটা হবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে প্রদেশগুলিতে, তবে নোতুনভাবে প্রদেশগুলি শাসিত হবে, শুধু মন্ত্রীরা বিভাগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন ; কিন্তু গভর্ণরের হাতেই থাকছে প্রধান ক্ষমতা। তিনি প্রয়োজনেই ভেটো দিতে পারবেন, আর তাহলেই হলো বিষয়টির চূড়ান্ত, এমনকি প্রাদেশিক প্রশাসন চালানোর তাগিদ বোধ করলে অনির্দিষ্টকালের জন্য তিনি সে ক্ষমতাও গ্রহণ করতে পারবেন। মূল স্থানটা ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের হাতেই থাকলো। কেননা ভারতের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ব্রিটিশরা ত্যাগ করার মানসিকতায় নেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতের অবস্থানটা যেমন ছিলো ভবিষ্যতেও যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করেই এই আইন।[৩১]

বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধনও ভারত শাসন আইনের (১৯৩৫) এক মুখ্য বিষয়, হাইকোর্ট ইতিপূর্বে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ছিলো; অতঃপর ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিল শেষ কথা বলতো। কিন্তু এখন ভাবতে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় স্থাপনের মাধ্যমে ভারতেই সর্বোচ্চ বিচারালয় স্থাপিত হলো।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকরী হলো ১লা এপ্রিল ১৯৩৭ থেকে, কিন্তু সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন বিষয়ক দিকটি এখানে দেশীয় রাজন্যবর্গের অনুৎসাহ ও অন্যান্য কারণে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এরাও যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই নিজেদের মতামত দেয়। ১৯৩৩-এর মার্চেই মুসলিম লীগ এ ধরনের ভাবনায় ভয় পেয়েছিল বলেই তাদের All India Muslim Conference Executive Board-এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল :

> But the chief Muslim objection was that it created a strong centre. The Muslims urged that the Provinces should be granted maximum fiscal, administrative and legislative autonomy Further, they demanded a slightly increased proportion of the British Indian seats in the federal upper chamber

over the one-third they had originally asked for, as no effective means were available for securing the necessary seats among the states to make up the proportion They also wanted the provincial governments to control the public services adequately [৮০] (Resolutions of the All India Muslim Conference Executive Board of 26 march 1933 The Times, 27 March 1933)

পরবর্তীতে আমরা দেখি .

The federation set up by the Act of 1935 was the closer rather than the looser type Hindu unitarianism had prevailed, particularly in the composition of the federal legislature (R Cupland, India A Re-Statement, 1945, P 144) The Muslims objected to it because, to them, a strong centre meant an increase of Hindu strength. They were also opposed to the central government having the power of interference in the criminal administration of the provinces, as this would have enabled a congress cabinet in the centre to paralyse the administration of a Muslim province. (William Barton, 'The State and the White Paper', Empire Review, January 1934, p 21)

The Muslim League found the federal scheme to be 'fundamentally bad,' 'most reactionary, retrograde, injurious and fatal ' and rejected it, However, it undertook to work the provincial part of the constitution 'for what it is worth ' [৮১] (Resolution No 8 of the All India Muslim League of 11-12 April 1936, Resolutions of the All India Muslim League from May 1924 to December 1936, Delhi, N d., pp 66-67)

বস্তুত ১৯৩৬-এর এপ্রিলে মুসলিম লীগ স্পষ্টই বলে দিলো এ আইনটা হলো অগণতান্ত্রিক, প্রতিক্রিয়াশীল, রাজন্যবর্গকে দিয়ে অহেতুক হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রচেষ্টা মাত্র।

সবকার ১৯৩৫-এর আইনটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে দৃঢ়সংকল্প, আর এতেই জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পড়লো মহা ফ্যাসাদে ; নির্বাচনে যাওয়া এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যেই দ্বিমত প্রকাশ পেল। কিন্তু আইনটা উপযোগী হয়নি——এ প্রশ্নে সবাই একমত হলেও ডানপন্থী বা উদারনৈতিক নেতারা মনে করতেন নিয়মতান্ত্রিক পথে গিয়ে তো উদ্দেশ্য পূরণ বা নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ মিলতে পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং কংগ্রেসের ভেতরকার বামপন্থীরা মনে করতেন নির্বাচনে জিতলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পথটাই বেছে নেয়া হবে। ভবিষ্যতে কংগ্রেসের অতীত নীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা এক্ষেত্রে থাকছে 'সাড়ে পনেরো আনাই'! জনগণের বিগত দিনের সব আন্দোলন ও ত্যাগ স্বীকারকে উপেক্ষা করা হবে ; সাধারণের সঙ্গে মিশে নেতৃত্বের আন্দোলনের স্পৃহাটাও ক্রমশ থিতু হবে—ভুলে যাবে স্বাধীনতা লাভের মূলমন্ত্র। তবে বিধানসভায় যাওয়া যেতে পারে একটা উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে আরো বিব্রত করা, পাশাপাশি দায়িত্ব হবে কৃষক শ্রমিকদের সংগঠনগুলিকে অধিকতর জোরদার করে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করা। মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে সমাজতন্ত্র অবশ্যই থাকবে এবং পবিকল্পিতভাবে নতুন গণ-আন্দোলন গড়ার এটাই হবে উপযুক্ত পটভূমি। কিন্তু অনেকেরই বক্তব্য যেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ যুক্তিজাল বিস্তারের মাধ্যমে নেহরুকে ডিসেম্বরে জানান :

'আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, কেউই নিজের স্বার্থে মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে চাইছেন না। সবকারের

মর্জিমত সংবিধান কার্যকর করতেও চাইছেন না কেউই। আমাদের কাছে প্রশ্নটা একেবারে আলাদা। এই সংবিধান নিয়ে আমরা কি করব? আমরা কি একে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের পথে চলব? তা করা কি সম্ভব? আমরা কি এটা দখল করে নিজেদের পছন্দমত ব্যবহার করব, না কি সে এভাবে যতটা ব্যবহৃত হতে দেবে ততটা পরিমাণে ব্যবহার করব। ...এটা তথাকথিত পরিবর্তন-সমর্থক বা পরিবর্তন-বিরোধী, সহযোগী বা বাধাসৃষ্টিকারী প্রভৃতি পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার ভিত্তিতে, বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়াই, কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াব ব্যাপার নয়।' এবং তিনি নেহরুকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলেন, 'আমি মনে করি না কেউ অসহযোগ আন্দোলনের আগেকার মানসিকতায় ফিরে গেছেন। আমি মনে করি না আমরা ১৯২৩-২৮ সালে ফিরে গেছি । আমরা ১৯২৮-২৯ সালের মানসিকতায় রয়েছি। আমার সন্দেহ নেই অচিরেই শুভ দিন আসবে।' (জওহরলাল নেহরু—'এ বাঞ্চ অব ওল্ড লেটারস রিটেন মোস্টলি টু জওহরলাল নেহরু', বোম্বাই, ১৯৫৮, পৃঃ ১৫৬ ও ১৫৭।) অনুরূপভাবে, কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে জে. বি. কৃপালনি বলেন : 'বিপ্লবী আন্দোলনে পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে পারে। এরকম সময়ে যে কর্মসূচীই নেওয়া হোক না কেন তা সংস্কারমূলক কাজ বলে মনে হলেও সেগুলো সমস্ত বিপ্লবী রণনীতির এক প্রয়োজনীয় অংশ।' (এ. এম. জাইদি এবং এস. জি. জাইদি, 'দা এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস', খণ্ড ১১ : ১৯৩৬-১৯৩৮, নয়া দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ৪৮) সমাজতন্ত্রের প্রশ্নও এই বিতর্কের অংশ ছিল না। অন্ধ্রের টি. বিশ্বনাথন বিষয়টিকে উপস্থিত করেছিলেন এভাবে : 'আমার সোস্যালিস্ট কমরেডদের কাছে আমি বলতে চাই, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা বর্জন সমাজতন্ত্রের ব্যাপার নয়। আমি তাদের অনুধাবন করতে বলব এটা রণনীতির প্রশ্ন।'[৪১] (এ.এম.জাইদি এবং এস. জি. জাইদি, 'দা এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস', খণ্ড ১১ : ১৯৩৬-১৯৩৮, নয়া দিল্লী, ১৯৮০, পৃঃ ৪২)

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের অন্যানারাও নিজেদের মতামত দিতে কার্পণ্য করেননি ; ডান-বাম উভয়েই আলোচনা-সমালোচনা, গ্রহণ-বর্জনের পক্ষে-বিপক্ষে থেকে শেষটাতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করছিলেন। কী হতে পারে আব কী হতে পারে না ইত্যাদিতে উত্তপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রস রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে ৭০৬টি পেতে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগ নির্বাচনে ১০৩টি আসনে জয়ী হলো।

নির্বাচনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী ফলাফল এভাবে দেখতে পারি।

প্রদেশের নাম	মোট আসনসংখ্যা	কংগ্রেস	% আসন লাভ	মুসলিম লীগের ফলাফল
উত্তর প্রদেশ	২২৮	১৩৪	৫৯%	২৬
অসম	১০৮	৩২	৩০%	৪
বাংলা	২৫০	৫৪	২২%	৪০
বিহার	১৫২	৯১	৬৫%	—
বোম্বাই	১৭৫	৮৫	৪৯%	১৮
মধ্যপ্রদেশ	১১২	৭০	৬২.৫%	৫
মাদ্রাজ	২১৫	১৫৯	৭৪%	৯

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৫০	১৯	৩৮%	—
ওড়িশা	৬০	৩৬	৬০%	—
পাঞ্জাব	১৭৫	১৮	১০%	১
সিন্ধু	৬০	৮	১২%	
মোট ১১টি প্রদেশ	১৫৮৫	৭০৬		১০৩

*প্রণবকুমাব চট্টোপাধ্যায়ের 'আধুনিক ভারত' থেকে সংকলিত (পৃঃ ১৩৭)

পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হলো, কিন্তু মুসলিমদের দাবী করা মুসলিম লীগ কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলো না। ৪৮২টি মুসলিম আসনে তারা লাভ করে মাত্র ১০৩টি, মুসলমান প্রধান বাংলাতে তাদের অবস্থান হলো :

বিধানসভাতে মোট সদস্য সংখ্যা-২৫০

কংগ্রেস	নির্দলীয় মুসলমান	মুসলিম লীগ	কৃষক প্রজা পার্টি	ইউরোপীয়	নির্দলীয় অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু	নির্দলীয় বর্ণহিন্দু	নির্দলীয় অতিরিক্ত
৬০	৪১	৪০	৩৫	২৫	২৩	১৪	১২

সর্বমোট সংখ্যা—২৫০

বিধান পরিষদ সদস্য সংখ্যা-৬৩

নির্দলীয় মুসলমান	নির্দলীয় হিন্দু	মুসলিম লীগ	কংগ্রেস	ইউরোপীয়	বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর
১৩	১২	১১	১০	৬	১১

সর্বমোট সংখ্যা—৬৩

এই সারণি দুটো থেকে এটা পরিষ্কার হলো বাংলা মুসলিম অধ্যুষিত হয়েও মুসলিম লীগ আশানুরূপ আসন দখল করতে পারেনি। অবশ্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান সেখানে মুসলিম আসনে মুসলিম লীগ আসন দখলের লড়াইয়ে অগ্রবর্তী। কিন্তু বাংলাতে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মুসলমানদের নেতৃত্বে এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি ৩৫টি আসন দখল করে মুসলিম লিগের আধিপত্যে জুৎসই ভাগ বসিয়েছে। কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে ঘটে বিপত্তি।

নির্বাচনে কংগ্রেস ভাল ফল করার পরে মন্ত্রিসভা গঠন করবে কি করবে না এই বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে পূর্বের জের চলতে থাকে। সভাপতি জওহরলাল নেহরুর ইচ্ছে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা পাওয়া না পাওয়ার কথা সামনে রেখে সর্বক্ষেত্রে শাসকবর্গকে অসহযোগ প্রদর্শন অর্থাৎ এই ভারত শাসন আইনকে (১৯৩৫) আগাগোড়া ঝেড়ে ফেলে বা প্রত্যাখ্যান করে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো। কিন্তু রাজাগোপাল আচারী সহ বেশ কিছু কংগ্রেস

নেতৃবৃন্দ সরকার গঠনের আবশ্যিকতা প্রমাণ করতে তৎপর। এই মতাবলম্বীদের সঙ্গে সাজাত্য প্রমাণ করলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যই, গান্ধীজীও মন্ত্রীসভা গঠনের পক্ষে। ১৩ই মার্চের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত হলো, তবে যেখানে যেখানে কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা রয়েছে সেখানেই মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। কংগ্রেসের দাবী দেখে বড়লাট ২১শে জুলাই ঘোষণা করলেন অহেতুক গভর্ণরগণ মন্ত্রিসভার দৈনন্দিন কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না, তবে জরুরী অবস্থা হলে কথাটা স্বতন্ত্র। এবারে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনের শেষ বাধাও দূর হলো ধরে নিয়ে ৫ই জুলাই (১৯৩৭) ওয়ার্কিং কমিটি মন্ত্রিসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিলো। তবে কি আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হলে কংগ্রেস নমনীয় হয়ে তার বৈপ্লবিক চেহারাটা বদল করতে চলছে? অনেকের ধারণা জনস্বার্থে অধিক কাজের আশায় কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ, দু' এক জন অবশ্য মনে করেছেন কংগ্রেসের বেশীর ভাগ সদস্যই এই ধরনের আন্দোলনে এখন বিমুখ—তাঁদের আন্দোলন করার প্রবণতাই নষ্ট হয়ে গেছে ; অতএব, মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণটাই তাঁদের কাছে কাম্য। ৭ই জুলাই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ৭টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করে কার্যভার বুঝে নেয়, চারটি প্রদেশে গঠিত হলো অ-কংগ্রেসী সরকার, এদের মধ্যে অন্যতম বাংলা। বাংলাতেও ফজলুল হকের সঙ্গে মিশে কোয়ালিশন সরকারে যেতে পারতো কংগ্রেস, কিন্তু তা হলো না, ফজলুল হক বাধ্য হয়েই মুসলিম লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ার মাধ্যমে মন্ত্রিসভা গঠন করেন ; এবারে সুযোগ পেল বাংলার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তি নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের।[৮] সিদ্ধান্ত হলো কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেই সরকার গঠন করা হবে এবং কোয়ালিশন করে মন্ত্রিসভা গড়া সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়, কেননা সেক্ষেত্রে আদর্শচ্যুতি ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন সম্ভবপর নাও হতে পারে। ৭ই জুলাই সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তকে সামনে রেখেই মন্ত্রিসভা গড়লো। কিন্তু বাংলার অবস্থাটা ত্রিশঙ্কু। কংগ্রেস সহযোগীদের নিয়ে ৬০টি আসন পেলেও ২৫০ আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় মন্ত্রিসভা গড়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে। গভর্ণর ডাক দিলেন কৃষক প্রজা পার্টির এ. কে. ফজলুল হককে। কিন্তু এখানেও বিপত্তি!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টি মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনো আঁতাত করেনি, বাংলার প্রায় সর্বত্রই মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে। নির্বাচনকে সামনে রেখে মিঃ জিন্না বাংলাতে প্রচারে এলেন, কিন্তু ফজলুল হকের নির্বাচনী ইশতেহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপের নিশ্চিত আশ্বাস এবং আমূল কৃষি সংস্কারের উল্লেখ থাকায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কৃষক সম্প্রদায় উজ্জীবিত হয়। এই সময়ে কৃষক সভাও কৃষক-প্রজা পার্টিকে সমর্থন জানায় ; আর গাঢ় আন্তরিক একাত্মতা ঘোষণা করে কংগ্রেস। কেননা সহজভাবেই কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতৃত্বের কাছে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক ছিলো যে বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করে ঐক্য প্রচেষ্টায় সহায়ক হবে। এ বিষয়কে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নিয়ে নিলো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, কিন্তু সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক কমিটির প্রস্তাবকে বাতিল করে দেন। মূলত, কংগ্রেস সভাপতি বা সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাংলার বিষয়টি

সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি, তাই তাঁদের বিবেচনাও বাংলার রাজনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাঁদের এই সময়োচিত যথাযথ সিদ্ধান্তের অভাব বা একগুঁয়েমি প্রবণতার ফলে বাংলাতে যে রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসের ব্যর্থতা সূচিত হলো তার প্রভাব হলো সুদূরপ্রসারী। বাংলাতে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থান ঘটলো। কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভা গড়তে কংগ্রেসের আপত্তিকে অধ্যাপক সুমিত সরকার এভাবে দেখেছেন :

> বাঙলায় মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ও ঘটনা একইভাবে গড়াল যা বোধহয় আরও কম ন্যায়সঙ্গত। আবুল মনসুর আহ্‌মেদ, শামসুদ্দীন আহ্‌মেদ ও নৌশের আলী প্রমুখ তুলনায়-র‍্যাড়িকাল লোকেদের চাপে পড়ে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি (কে. পি. পি.) এপ্রিল ১৯৩৬-এ একটি নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিনদারি লোপ ও অবিলম্বে খাজনা কমানো আর আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তোলা হয়। জমিনদারি লোপের বিষয়টিই ছিল নির্বাচনের আগে জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার আংশিক কারণ। প্রমাণ হয়ে যায় যে কে. পি. পি লীগের জোরালো প্রতিপক্ষ। পটুয়াখালি আসনে মর্যাদাব লড়াই-এ খাজা নাজিমুদ্দীনকে হারিয়ে দেন ফজলুল হক। বাংলার কংগ্রেস নেতারা অবশ্য বাক্যচ্ছটা বিস্তারের জন্যেও ভূমিসংস্কারের কথা বড় একটা বলতেন না। তার কারণ মনে হয়, এখানকার জমিনদারদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু, অবধ-এর তালুকদাবদের মধ্যে মুসলমান ছিলেন প্রচুর। বাংলার সঙ্গে যুক্তপ্রদেশের এটাই ছিল তফাত। কে পি. পি-র সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভার আলোচনা ভেস্তে যায়। কারণ কংগ্রেস জিদ ধরেছিল অবিলম্বে বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে আর আবুল মনসুর আহ্‌মেদ বলেন, মন্ত্রিসভার রায়তি সংস্কার কর্মসূচির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, কারণ বন্দীমুক্তির প্রশ্নে ছোটলাট শেষ অবধি ভেটো দিতে পারেন আর তার ফলে পদত্যাগ করতে হতে পারে। এইভাবে লীগের সঙ্গে জোট বাঁধতে ফজলুল হককে মোটামুটি ঠেলেই দেওয়া হলো।[৪৫]

একই বিষয়কে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার আরও পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থিত করার পাশাপাশি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রাপ্তি, বাংলার ভাগ্যে কেমন করে সাম্প্রদায়িকতার ও চিরস্থায়ী বিভেদের প্রাচীর তুলতে সাহায্য করেছিলো তার উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনের ফলশ্রুতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অনুসারে বাংলায় নির্বাচনের পরে মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতৃত্বের চিন্তাধারাকে উপেক্ষা ; সর্বোপরি সর্বভারতীয় নেতৃত্বের চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত বাংলাকে দ্বিতীয় দফা ভাগের শিকার করে। অর্থাৎ পূর্ব বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলকে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্তিতে চমৎকার সাহায্য করেছিল তার উৎকৃষ্ট উল্লেখ তিনি করেছেন :

> ...বঙ্গদেশে অন্যান্য দল অপেক্ষা কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেও মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করিল না। অতঃপর কৃষক-প্রজা দলের নেতা ফলজুল হককে গভর্ণর মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি কংগ্রেস দলের নেতা শরৎচন্দ্র বসুকে তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী শরৎচন্দ্র এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে না পারিয়া মৌলানা আজাদকে লিখিলেন যে, এই সুযোগ গ্রহণ করাই উচিত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াও কোন ফল হইল না। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অবিচলিত রহিলেন। এই সুযোগে মুসলিম লীগ প্রস্তাব করিল, যদি ফলজুল হক মুসলিম

লীগের সঙ্গে যোগদান করেন তবে এই উভয় দল মিলিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিতে পারেন। ফজলুল হক এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন এই শর্তে যে, তাঁহাকে এই যুক্ত দলের নেতা নির্বাচিত করিতে হইবে। মুসলিম লীগ ইহাতে সম্মত হইলে দুই দলে মিলিয়া মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। ইহার ফলে বঙ্গদেশে মুসলিম লীগের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং পরিণামে প্রধানত ইহারই ফলে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল—কংগ্রেসের অদূরদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতাই যে তাহার জন্য প্রধানত দায়ী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।[৭৭]

লীগের 'লাহোর', কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো'

কংগ্রেসের কোনো বার্ষিক অধিবেশন হলো না ১৯৩৭ সালে, কংগ্রেস তো মন্ত্রিসভা গঠন নিয়েই ব্যস্ত। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরেও কংগ্রেসের মোড়লরা সমস্যায় পড়লো 'বন্দী মুক্তি'র প্রশ্নটি ঘিরে। একদিকে অহিংসবাদীদের হাজার হাজার জেলে থাকলেও তাদের মুক্তির বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছিলো, অন্যদিকে বিপ্লবীদের প্রতি মনোভাবটা ছিলো পুরোপুরি নেতিবাচক। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিপ্লবে-আন্দোলনে-সংগ্রামে যাঁরা দেশের জন্য মানুষের অধিকারের প্রশ্নে নিজের ব্যক্তিসুখ বর্জন করেছেন তাঁদের জেলে থাকাটা বরদাস্ত করতে পারছিলো না, কি অহিংস কি সহিংস সবার মুক্তি চাইছিলো। কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি কৃষকরাও নারাজ হয়ে ওঠে, কেননা কৃষকদের স্বার্থবাহী তেমন কোনো আইন কংগ্রেসী সরকারগুলো করে উঠতে পারেনি;উপরন্তু মধ্যস্বত্বভোগকারী কংগ্রেসের স্থানীয় মাতব্বরদেব সঙ্গে কৃষকদের ঝুট-ঝামেলা তো বরাবরের মতোই বিরাজ করছিলো।

১৯৩৮-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারি গুজরাটের হরিপুরায় কংগ্রেসের ৫১তম বার্ষিক অধিবেশন হলো, আর এখানেই তরুণদের বামপন্থীদের আস্থাভাজন সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতি হলেন সর্বসম্মতিক্রমে। অথচ এ বছরেই সমাজতান্ত্রিক শক্তিসমূহের উপর দমন চালাতে গিয়ে মাদ্রাজে রাজাগোপালাচারী সমাজতান্ত্রিক নেতা বাটলিওয়ালাকে জেলে ঠেলে দেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের শেষটায় ছিলো আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করে কংগ্রেসরই চিন্তা-ভাবনার কথা, অর্থাৎ আসন্ন যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে অংশী করলেও ভারতীয়দের কর্তব্যটা কেমন হবে এটা নিরূপণ করা। সিদ্ধান্তটা এমনি, নিশ্চিত ভারতকে যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া সমীচীন হবে না। সুভাষচন্দ্র এখানেই থামতে রাজি নন, কেননা শত্রুর শত্রু তো আমাদের মিত্র ; বস্তুত এখান থেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে তরুণ সুভাষচন্দ্রের মতদ্বৈধতা শুরু। কেননা কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র তো আপসে বিশ্বাসী নন, আপসহীন সংগ্রামে দেশকে স্বাধীন করার পক্ষপাতী, কিন্তু গান্ধীজী তাঁর পূর্বের অবস্থানেই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে। সুভাষচন্দ্র জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করলেন—ভারতের শিল্প সুনির্দিষ্ট পথে এগোবার চেষ্টা করুক, ভারতীয়দের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা নিরূপণে এই কমিটি সহায়ক হোক। গান্ধীজী দেশের অগ্রগতি চাইলেও এই পরিকল্পনা কমিটির মধ্যে বলশেভিক বিপ্লবের আভাস খুঁজে পেলেন। আসলে গান্ধীজীর পক্ষে সুভাষচন্দ্রকে—বিপ্লবের বহ্নিতে ঢাকা নতুন প্রজন্মকে মেনে নেওয়াও তো একটা যুদ্ধের সমান। মিউনিখ চুক্তিটার পরে ভারতে সুভাষচন্দ্রের আহ্বান কংগ্রেসের মধ্যকার অনেকেই সহজভাবে নিতে পারেননি। শ্রেণীগত অবস্থানের দিক দিয়ে বিচার করলে তারা মুখ্যত আমলাতান্ত্রিক, মন্ত্রিত্ব ও পার্লামেন্টারী ছাঁচে ইতোমধ্যেই রূপ নিতে চলেছেন। ১৯৩৯-এর কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীজী পট্টভি সীতারামাইয়াকে লাঠি বানিয়ে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইলেন, কিন্তু পরোক্ষ যুদ্ধে তিনি ব্যর্থ হলেন। পুনরায় সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু বড্ডো বেশী লেগেছে আত্মাভিমানী গান্ধীজীর, তিনি চ্যালা-চামুণ্ডাদের ডেকে প্রকাশ্যেই

বলে দিলেন পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয়টা তাঁর নিজেরই পরাজয়। ত্রিপুরাতে ১০-১২ই মার্চের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গান্ধীজী পেলেন 'ডিক্টেটরে'র ক্ষমতা, হৈ চৈ হলো প্রচুর— গণতন্ত্র-ফনতন্ত্র উধাও, গোবিন্দবল্লভ পন্থ যে একখানা নয়া পথ আবিষ্কার করে বসেছেন। আর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরাও এবারে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে চলে গেলেন এবং গান্ধীজীকে সমর্থন করে বসেন। সুভাষচন্দ্র তাদের আচরণকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বললেও তারা কিন্তু মনে করতো কংগ্রেসের সংহতি ও শক্তি তো বর্তমানে গান্ধীজীকে সামনে রেখেই। গান্ধীজী তাঁর এতোদিনকার 'অসহযোগিতা-সহযোগিতা-অসহযোগিতা' খেলাটা খেলতে শুরু করেন, ২৯শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন ; এ কাজটা তাঁকে বাধ্য হয়েই করতে হলো। সভাপতির চেয়ারটা নিয়ে নিলেন গান্ধীজীর একান্ত অনুগত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সুভাষচন্দ্র তো তরুণের সাধনাকে দাঁড় করাতে ব্যর্থ হলেন, এমন কী নীতি ও আদর্শকে ভাগ করে নেয়ার দাবীদার জওহরলাল নেহরুও তাঁর পাশে থাকলেন না : ব্যাপারটা সেরকম 'ঝোপ বুঝে কোপ মেরে' দিয়েছেন তিনি। গান্ধীজীর পোয়াবারো, সুভাষ আউট!

প্রসঙ্গক্রমে অতীত স্মরণ করা য়ায়, গান্ধীজী পাকাপাকিভাবে দেশে ফেরার পরে এককালের 'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত' মিঃ জিন্না তাঁকে নেতা হিসেবে মেনে নিলেও গান্ধীজী কিন্তু জিন্নাকে তেমনটি গ্রহণ করতে পারেননি। কংগ্রেসের যতো উঁচু পর্যায়ের নেতৃত্বেই থাকুন না কেন, ১৯২০-২২-এর খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজীর 'গেঁয়ো মতলব', 'মানুষ খেপানো' কর্মসূচীকে কেন্দ্র করেই মিঃ জিন্নাকে কংগ্রেসের মধ্যেই অপাঙ্‌ক্তেয় হতে হয়, পরবর্তীতে এই ধূর্ত রাজনীতিবিদ আর নিজেকে কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি, অথচ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন একাধিকবার। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ তাঁদের লিখিত অভিমতে মিঃ জিন্না সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলেও একথা কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে নেতৃত্বের ঠোকাঠুকির খেলাটা যদি প্রকট না হতো এবং গান্ধীজী ভারতে হিন্দু-মুসলমানের ঐকমত্য সৃষ্টিতে খিলাফত আন্দোলনের মতো সহজ পন্থা বেছে না নিতেন তা হলে মিঃ জিন্নাও দ্ব্যর্থহীনভাবে গান্ধীজীর সমালোচনা করতেন না। আমাদের তো স্বীকার করতেই হয়, গান্ধীজীর সেই 'বুজরুকি' টিকে থাকেনি, কেননা ১৯৩০ পর্যন্ত ভারতে কম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেনি ; বিশেষত ১৯২৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সে-সময়কার সব শুভ প্রচেষ্টাকে ঢেকে দিয়েছিলো। বস্তুত মিঃ জিন্নার বক্তব্যের সারমর্ম পরে সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছে। কেননা গান্ধীজীর মধ্যে আন্তরিকতা থাকলেও বাস্তব সমস্যা নিরসনের নামমাত্রই প্রচেষ্টা ছিলো, কেবলমাত্র সহজ উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন এবং পরোক্ষভাবে কংগ্রেসের প্রধান স্থানে মুসলমানদের অন্যতম নেতৃত্বকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনায় রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার প্রচেষ্টামাত্র। ১৯২২-এর পরে মিঃ জিন্না আর কখনোই সেভাবে কংগ্রেসে স্থানলাভ করেননি, সুভাষচন্দ্র বসুও ত্রিপুরী কংগ্রেসে (বিপুল সমর্থন থাকার পরেও) গান্ধীজীর রণকৌশলে (নাকি অপরিণামদর্শিতা ও হঠকারিতায়) পরাজিত এবং কংগ্রেসের সিংহভাগ সদস্যের সমর্থন হাবিয়ে বসেন। অমলেশ ত্রিপাঠী বলেন :

> অন্তত এই ঘটনায় আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তিনি মহাত্মার যোগ্য কাজ করেননি। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ কি পটেলের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণ হবেন? তিনি আসলে গ্রিক ট্রাজেডির নিয়তির

ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২৯শে এপ্রিল কলকাতার অধিবেশনে সুরাটের পুনরভিনয় হয়েছিল। ক্যাবিনেটে নিজের দু-একজন বেশি লোক পেলেই সুভাষ আর পদত্যাগ প্রস্তাবে জোর দিতেন না। সভাপতি সরোজিনী নাইডু তা ভাল করে আলোচনা না করেই ঘোষণা করেন পদত্যাগ গৃহীত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম প্রস্তাব করেন।[১]

মিঃ জিন্না তো উগ্র সাম্প্রদায়িক আগা খাঁ-এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন মুসলিম লীগের নেতৃত্বে এসে, কংগ্রেসকে বলেছিলেন হিন্দুদের দল ; রাজনৈতিকভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মিঃ জিন্নার এ ভিন্ন উপায়ই বা কী ছিলো। আর ত্রিপুরী অধিবেশনের পরে নিজের অস্তিত্ব এবং স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে স্বতন্ত্র পথে চলতে বাধ্য হলেন সুভাষচন্দ্র।

আগস্ট মাসের (১৯৩৮) শুরুতেই মিঃ জিন্না তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে পত্র মারফত জানিয়ে দেন যে ভারতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে একমাত্র মুসলিম লীগ এবং হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসনে কংগ্রেস যদি আগ্রহী হয় তবে মুসলিম লীগের সঙ্গেই আলোচনা করতে হবে ; আর এই আলোচনায় কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অবশ্যই যেন কোনো মুসলমান সদস্য না থাকেন। পরোক্ষভাবে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কংগ্রেসের এই প্রতিনিধি দলে থাকলে লীগের আপত্তি থাকবে ; বস্তুত জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনাব আজাদই ছিলেন অগ্রগণ্য। পুনরায় এই বক্তব্যকে বিস্তৃত করে মিঃ জিন্না ১৯৩৯ সালে পত্র মারফত কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জানান। মিঃ জিন্নাব অভিপ্রেত অনুসারে একটা তদন্তও হলো কিন্তু হিন্দু মহাসভা এই সময়ে ক্রমাগত অভিযোগ করে যায় এই বলে যে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিগণ নিরপেক্ষতা বজায় না রেখে মুসলমান সম্প্রদায়কে তোষণ করে যাচ্ছেন।

কংগ্রেসের সাংগঠনিক এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থায় রদবদল হলেও গান্ধীজী নিজেকে জুতসই অবস্থায় রাখতে সক্ষম হলেন, মিঃ জিন্নাও লীগকে নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় একটা অবস্থানে দাঁড়িয়ে তখন কমিউনিস্ট পার্টিও তাঁর বলশেভিক চিন্তা-চেতনাকে কার্যে রূপ দিতে তৎপর। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৯-৩৩) আসামীপক্ষ (কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ) যে সত্যি সত্যি ব্রিটিশরাজের এই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাটা পালটে দিতে চায়—সেকথা তাঁরা স্বীকার করলেন এবং আদালতে জবানবন্দীর মাধ্যমে সরকারী খরচায় অর্থাৎ 'যার দাঁত তারই মুগুর' পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রচার করলেন জনসমক্ষে। মোটামুটি তাঁদের প্রচারটা জুতসই হয়েছিলো, সাধারণের মধ্যে পার্টি এবং তার কাজকর্ম সম্পর্কে একটা ধারণা তাঁরা গড়ে দিতে পারলেন। অবশ্য পরিকল্পনাটা ছিলো মুজফ্ফর আহমদের, এমনিতেই দীর্ঘস্থায়ী জেল যখন হবেই তাহলে যতটুকু পারা যায় প্রচারটা সেরে নেয়া যাক ; কেননা এটাই তো পার্টির জন্য বাড়তি হবে। হলোও তাই। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দেখা গেল সমস্যা তাঁদের পিছু পিছু ছুটছে, তবু নেতৃবৃন্দ শ্রমিক আন্দোলনকে অধিকতর জোরদার করতে চাইলেন, ১৯৩৪-এ বয়নশিল্পে সাড়া জাগানো একটা ধর্মঘট ঘটে গেল। ভারতে ব্রিটিশ সরকার এটাকে ছোট করে দেখতে পারেন না, অতএব কমিউনিস্টদের পুনরায় ধরপাকড়ের আয়োজন চললো। কমিউনিস্টরা চাইলো নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে জনসংযোগ বাড়াতে, কেননা গণভিত্তিই তো ভবিষ্যতে বাঁচার পথ—আদর্শ তো তাদের মাধ্যমেই পল্লবিত হবে।

কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিগত, আদর্শগত প্রভেদটা গোড়া থেকেই ছিলো,

তাছাড়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব কখনোই কমিউনিস্টদের সাচ্চা দেশপ্রেমিক বা স্বাধীনতার সৈনিক ভাবতে চায়নি ; বিশেষত বলশেভিক চেতনা তো তখনো সামন্ততান্ত্রিক কংগ্রেস নেতৃত্বকে স্পর্শ করলেও অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। তার একটা প্রধান কারণ হয়তো এই যে কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতারাই (ওজনের মাপকাঠিতে যাই হোক না কেন) এখনো সামন্তপ্রভু, জোতদার, কোথাও কোথাও ছোট-বড়ো মিল-মালিক, সবচেয়ে বড়ো কথা তাদের একটা বৃহত্তর অংশ মধ্যস্বত্বভোগকারী ; তাদের ব্যক্তিস্বার্থ এখনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ আসন দিতে পারেনি, সাধারণ-সর্বহারা মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া তো তাদের কাছে কল্পনার চাষ করা। বরং উলটো দিকেই তাদের মতিগতি নিবদ্ধ। কিন্তু কমিউনিস্ট নেতৃত্বের নতুনভাবে উপলব্ধি হলো, ক্রমাগত সরকারী আক্রমণ কার্যক্রম রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করছে এবং এটাকে অতিক্রম করে এগোনো বর্তমানে খুবই কঠিন হবে। অতএব, পার্টির এখন নতুন পথের অনুসন্ধান করাটা অবশ্য করণীয়। ভারতব্যাপী কংগ্রেসের যে গণভিত্তি তাকে কাজে লাগালে কেমন হয়, আর কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও সমর্থন থেকেই পিছিয়ে থাকতে হবে। এভাবে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে (জয়প্রকাশ নারায়ণ) যুক্তফ্রন্ট গড়ে, মূলত এরাই তো কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল। তাই এদের মাধ্যমে সদস্যপদ গ্রহণ করে কমিউনিস্টরা, সরকারীভাবে যে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী। ১৯৩৭-এর গোড়ার দিকে কোনো কোনো কমিউনিস্ট নেতা তো নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য পর্যন্ত হয়েছিলেন। 'লক্ষ্ণৌ বোঝাপড়া'-র মাধ্যমে দুয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটলেও ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে কমিউনিস্টদের বোঝাপড়ায় ঘাটতি হলো, তবে ইত্যবসরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা নিজেদের সুবিধেগোছের একটা জায়গায় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন, পূর্বের নড়বড়ে ভাবটা অনেকটাই কেটে গেছে। গভর্ণমেন্ট কিন্তু কমিউনিস্টদের ছেড়ে দিতে পারে না, তাদের নিয়েই যত্তোসব দুশ্চিন্তা ; কমিউনিস্টদের ছোট-বড়ো সব গ্রুপগুলোই তো বলশেভিক মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে কংগ্রেসে না ঢোকা সহিংস বিপ্লবীদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের বিরুদ্ধ সংগঠিত করতে চলছে। এতদ্ব্যতীত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান এদের ক্রিয়াকলাপ ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে অচিরেই ক্ষুণ্ণ করতে পারে, বিশেষত এই সময়কার আর্থিক মন্দার মধ্যে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতিবাদী ভূমিকাকে আর সহ্য করা সম্ভব নয়। ১৯৩৫-এ বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিমিনাল ল' অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্টের বলে (১৬ নং ধারা কার্যকরী করে) ১৩টি কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট প্রভাবিত সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৩৬ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা সব মুক্তি পেলে বিপ্লবীদের মধ্যে, যুবাদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ আরো বেশী যুক্তিগ্রাহ্য ও স্বাধীনতা লাভের পাথেয় বলে মনে হয়। বস্তুত ভারত সরকারের মীরাট ষড়যন্ত্র নামক অপকর্মের ফলে দেশবাসী এতোদিনকার কমিউনিস্ট-বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে অসারতা বা মিথ্যার অভিব্যক্তি খুঁজে পেল। সুস্নাত দাশ এক প্রবন্ধে নথিপত্রের উল্লেখ করেই কলকাতা পুলিসের চিন্তাকে তুলে ধরেছেন :

> কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের তৈরী (স্পেশাল ব্রাঞ্চেস রিভিউ অন রেভিলিউশনারী ম্যাটার ৯-১-৩৬) নোটের ভিত্তিতে হোম মেম্বার, হেনরি ক্রেইক (দিল্লী) হোম মেম্বর (বেঙ্গল) রবার্ট রেইডকে ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ তারিখে যে চিঠি লেখেন তাতে বলা

হয় 'প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা অনুযাই গণ-সংগঠন গড়ার পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্দামান সেলুলার জেল থেকে পাওয়া খবর হলো একটি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বহরমপুর বন্দী নিবাসের খবর হলো সেখানে রাজবন্দীরা কমিউনিস্ট লাইনে তাদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করছে। ....সি. আই. ডি.-র ডেপুটি ইন্সপেক্টর কমিউনিজমের দিকে এই ঝোঁক দেখে খুশি হয়েছেন কিন্তু তরুণ যুবকরা যেভাবে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করে কমিউনিজমকে গ্রহণ করছে, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় আগামী দিনে আজকের থেকেও তা বেশী মাত্রায় বিপদ ঘটাতে সাহায্য করবে।[১]

তাহলে কি ১৯৩৬ সাল থেকেই ভারত সবকার কমিউনিজমের ভূতে ভীত হচ্ছিলো? বিভিন্ন ধরনের দমন পীড়ন আর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলার অন্তর্নিহিত রহস্য কি শুধুই ভারতের জন্য? আর একটা প্রশ্ন থাকে, 'দি স্টেট্সম্যান' পত্রিকা কোন স্বার্থে কমিউনিস্ট আদর্শ-বিরোধী প্রচার তুঙ্গে তুলেছিল? সব প্রশ্নের নিশ্চিত সংক্ষিপ্ত উত্তর হতে পারে, আন্তর্জাতিকভাবে কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক ক্ষমতা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ ব্রিটিশের স্বার্থ যথাযথ ভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে ; আর উন্মোচিত হতে পারে ব্রিটিশ স্বার্থের নগ্নরূপ।

ত্রিপুরা সরকার যতোটা ভীত হয়েছিল বাংলা সরকার তার তুলনায় অনেক বেশী, তাই কমিউনিস্ট-বিরোধী কার্যকলাপে পুলিস ও প্রশাসনকে ব্যবহার করলো দ্বিধাহীনভাবে, সেখানে নৈতিকতা বা মানবতা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিলো। কংগ্রেসের মধ্যে তারা বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলো।

উল্লেখ্য বিষয় হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুব সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলার অকংগ্রেসী সরকারগুলো যুদ্ধের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করে, কিন্তু কংগ্রেস তো সমর্থনের দিকে নেই। মুসলিম লীগ ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যকারী হতে সম্মত হলো শর্ত পূরণের অঙ্গীকার চেয়ে, অবশ্যই ভারতে ব্রিটিশ সরকারেব পক্ষে সে শর্ত পূরণেব অঙ্গীকারও দেয়া হলো। কিন্তু কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় ১৫ই সেপ্টেম্বরে এই মর্মে যে ভাইসরয়কে অনুরোধ জানানো হোক যুদ্ধের উদ্দেশ্যটা ব্যাখ্যা করার জন্যে। আর একটা বিষয় হলো 'গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতা' রক্ষাই যদি যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য তবে ভারতের ক্ষেত্রে এটা কেমন করে প্রযোজ্য হবে। ভারত তো কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়, এখানে গণতন্ত্র নৈশ খেচর হলেও হতে পারে—এ অবস্থায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের মতলবটা কী? কেনই বা তাদের যুদ্ধে জড়ানো? ভারতীয়রা এই যুদ্ধে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে পারে যদি ভারতীয়দের স্বাধীন জাতি হিসেবে গণ্য করা হয় ; ব্রিটিশ সরকারকে তো অবিলম্বেই এ বিষয়টা খোলসা করে ঘোষণা করা উচিত।

কিন্তু বড়লাট যা বললেন তাতে কংগ্রেসের আক্কেল-গুড়ুম। তিনি পুরোনো কথা নতুনভাবে বললেও কংগ্রেস মেনে নিতে পারেনি, তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। এবং কংগ্রেস যে ঘটনা ঘটালো তা আরো গুরুতর, কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করে সরকার ছেড়ে বাইরে আসতে নির্দেশ দিলো। মুসলিম লীগের পক্ষে কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত হলো সোনায় সোহাগা, ভারতে ব্রিটিশ সরকারও পেয়ে গেল মওকা, আট প্রদেশের শাসনভার গেল গভর্ণরের হাতে। এবার তারা কংগ্রেসের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পুরোনো পদ্ধতিটাই আরো

সাবলীলভাবে চালাতে চাইলো, মুসলিম লীগকে মদত দিল।

> ...জিন্না সরকারকে দিয়ে কবুল করিয়ে নিয়েছিলেন যে মুসমিল লীগ ও তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে সাংবিধানিক বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতির কথা কংগ্রেসকে দেওয়া চলবে না। যে কোন ধরনের গণপরিষদের দাবিরও বিরোধী ছিলেন জিন্না, কেননা তিনি জানতেন যে একরম কিছু গঠিত হলে সেখানে কংগ্রেসেরই প্রভাব দাঁড়াবে বেশি। ইতিমধ্যেই মুসলিম লীগের অনেকগুলি জঙ্গী সংগঠন গড়ে উঠেছিল যথা মুসলিম লীগ ভলান্টিয়ার কোর, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং খাকসারবাহিনী। এদের হাতে অস্ত্রও তুলে দেওয়া হয়েছিল, এবং পুরোদস্তুর ফ্যাসিস্ট কায়দায় নরহত্যার ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল। বলাই বাহুল্য এর পিছনে বৃটিশ সরকারের সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করলে জিন্না স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, এবং ২২শে ডিসেম্বর (১৯৩৯) তারিখে মুসলিম লীগ 'মুক্তি ও ধন্যবাদ প্রদান দিবস' পালন করে।[৫]

বিশ্বযুদ্ধটা শুরু হলেই সরকারও নতুন উদ্যমে কমিউনিস্টদের উপর দমন পীড়নের ব্যাপারটা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু ফল হলো উলটো, কমিউনিস্টরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার শুরু করে—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের কোনো প্রকারের সাহায্য যেন কেউ না করেন। আরো ঘটনা ঘটালো তারা, অন্যান্য বামপন্থীদের নিয়ে বন্দীমুক্তি আন্দোলন শুরু করে দিলো। ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪০) বন্দী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মতোই ওজস্বী জবানবন্দী দেন,—যা সমসাময়িক মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের (মুসলিম লীগ) কমিউনিস্ট-বিরোধী ও ব্রিটিশ প্রীতির কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে। এমন কি ফজলুল হকও এ বিষয়ে কম যাননি। তিনি পুলিস বিভাগকে সক্রিয় করে তোলেন, উদ্দেশ্য কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত শ্রমিকদের আন্দোলনগুলো দমন করা।

কমিউনিস্টরাও এই দশকের প্রায় শুরু থেকেই তাদের আশ্রয় ও কর্মক্ষেত্রের ঘাঁটি হিসেবে এবং আদর্শগতভাবে বেছে নিয়েছিলেন কংগ্রেসের ছত্র-ছায়াকে। উপেক্ষা না করে গ্রামের কৃষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি শ্রেণীচেতনাকে জাগিয়ে নতুন কর্মী ও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন তাবা যা কংগ্রেসের ভেতরেই নতুন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। কৃষক সমিতি গঠন নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব ফাঁপরে পড়লে হবে কী—কমিউনিস্টদের এই প্রচেষ্টাকে তাদের না মেনে উপায় ছিলো না। বস্তুত, শ্রেণীচেতনার দিকটা তো রয়েছেই, পাশাপাশি হাজার বছরের শোষিত এই কৃষক সমাজ সন্তান-সন্ততি নিয়ে বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলায় ক্রমশ জোটবদ্ধ হচ্ছিলো। তেতো গেলার মতোই কংগ্রেসকে মেনে নিতে হয়েছিলো কৃষক সমিতির অস্তিত্ব। কিন্তু সরকার তো খুব সহজে কৃষক-শ্রমিকের অধিকার রক্ষার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে মানতে পারে না, গণেশ ঘোষ এবং তাঁর কয়েকজন সাথীর মুক্তি পেতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময় লাগে।

১৯৪০-এর মার্চ মাসটা বড়ো এলোমেলো, মানবেন্দ্রনাথ রায়কে অক্লেশে হারিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি হলেন মৌলানা আজাদ। তবে গান্ধীজীর হাতেই থাকলো পূর্বের মতোই বল্লাটা, সহিসের বাকী কাজ ভাগাভাগি হলো জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে মৌলানা আজাদের। অলিখিতভাবে সেই গান্ধীজী, সেই নেহরু! সোসালিস্ট পার্টি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাতে থাকে, মূলত এটা ছিলো সাম্রাজ্যবাদের

বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে দেশের মেহনতী মানুষ ও বিপ্লবীদের একত্রীকরণের প্রচেষ্টা। মার্চ মাসেই মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে মিঃ জিন্নাকে সভাপতি বানিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বকে ঢেকুর দিয়ে উগরে দিলো, ভারতকে ভাগ করার আটোসাটো প্রস্তাবটাও সভায় গৃহীত হয়ে গেল। লীগের পালে হাওয়া লাগলো। অবশ্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিলেন মিঃ জিন্না, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের ২৬তম বার্ষিক অধিবেশন (১৯৩৮) পাটনায় অনুষ্ঠিত হলে তাঁকে আমরা বলতে শুনি .

> As I have said before there are four forces at play in this country. Firstly, there is the British Government Secondly, there are the rulers and people of the Indian States thirdly, there are the Hindus and, Fourhtly, there are Muslims The Congress press may clamour as much as it likes, they may bring out their morning, afternoon, evening and night editions, the Congress leaders may cry as much as they like that Congress is a national body. But I say it is not true. The Congress is nothing but a Hindu body That is the truth and the Congress leaders know it [*]

২২শে মার্চ (১৯৪০) মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে (লাহোর) মুসলিম ভারত ও হিন্দু ভারতের পরিকল্পনাকে সামনে রেখে উচ্চারণ করেন, হিন্দু-মুসলিম উভয়ে মিলে ভারতে কখনোই একটা জাতি হতে পারে না, কংগ্রেস তো হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠায় একাগ্র-চিত্ত। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে জোরালো আহ্বান জানান এই বলে যে, হিন্দু-মুসলিম দুটো জাতি ভারতের সর্বত্র আজ প্রতিষ্ঠিত, কোনো অবস্থায়ই যদি মুসলমানরা আজ পিছু হটে তবে সেটা হবে ভুল—আত্মহননের সমান। হিন্দু-মুসলমান কখনোই এক জাতি হিসেবে ভারতে বিবেচিত হয়নি, দুইয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবনযাত্রার প্রণালী সম্পূর্ণভাবেই স্বতন্ত্র বলে তিনি উল্লেখ করে এমন কথাও বলেন যে, এক সম্প্রদায় কি অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনো বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়তা গ্রহণে আনন্দিত-চিত্ত হয়। মিঃ জিন্না কখনো আবেগে মথিত হয়ে, কখনো নাটকীয়ভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে আগত প্রতিনিধিদের মনকে জয় করার চেষ্টা করেন এবং তিনি যে এ বিষয়ে স্বার্থক হয়েছিলেন সে কথা আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত। কিন্তু মূল বক্তব্যটা বা প্রস্তাবটা মিঃ জিন্নাব সভাপতিত্বে উত্থাপন করেন ফজলুল হক। আর এই প্রস্তাবটার মধ্যেই ছিলো মুসলিম লীগের চিন্তা-চেতনার মোদ্দা ব্যাপারটা, তৃতীয় পর্বে ভৌগোলিক দিকটাকে সামনে রেখে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে সন্নিহিত করেই মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার। প্রয়োজনবোধে ভারতকে পছন্দ মতো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার সুপারিশ বা দাবী, যার মাধ্যমে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কৃষক-প্রজা পার্টির কারিগর ফজলুল হক মুসলিম লীগের অংশী হয়েই মিঃ জিন্নাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব দিলেন। যে ফজলুল হক ছিলেন বাংলার, যিনি সাম্প্রদায়িক জিন্নার অনুগতদের ভোটযুদ্ধে (নির্বাচনে) পরাজিত করেই ক্ষমতায় এসেছিলেন তিনি শুধুমাত্র মুসলিম লীগের হতে চাইলেন, সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে নির্ধারণ করলেন একটি সম্প্রদায়কে ; পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত শক্ত হলো, আরো মজবুত হলো এর মাধ্যমে। ফজলুল হকের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে চৌধুরী খালিকুজ্জামান বক্তব্য রাখেন, অন্যান্য সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা জাফর আলী খান, সর্দার ঔরঙ্গজেব খান, স্যার

আবদুল্লা হারুণ। পরের দিন নবাব মহম্মদ ইসমাইল খান ফজলুল হকের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামগড় কংগ্রেসে মৌলানা আজাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করেন যে মিঃ জিন্নাই ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোভাবের যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

কূটকৌশল তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী মিঃ জিন্না সুকৌশলে ফলজুল হককে দিয়ে প্রস্তাবটি উত্থাপন করান, কেননা তিনি জানতেন ফজলুল হক প্রাদেশিক মুসলিম লীগের যে পদেই থাকুন না কেন কৃষক-প্রজা পার্টিকেই তিনি গুরুত্ব দেবেন বেশী ; বস্তুত ফজলুল হকের লীগের নেতৃত্ব নেয়া ঘটনার আকস্মিকতা বই অন্য কিছুই নয়। স্বল্প পরিসরে হলেও মিঃ জিন্না ফজলুল হকের চেতনার বিকাশকে কর্মপদ্ধতির সহজ সরল রূপকে এলোমেলো করে দিতে পেরেছিলেন; কেননা মিঃ জিন্না চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে টেক্কা মারতে, যে কংগ্রেস থেকে বহু পূর্বেই তিনি নেতৃত্ব হারিয়েছেন। ঝানু আইনজ্ঞ এটা বুঝেছিলেন যে শাসনতন্ত্র মোতাবেক কেন্দ্রের গুরুত্ব হবে সর্বাধিক, সর্বভারতীয় নেতৃত্বই এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ জানানোর সঠিক উপায় ; কংগ্রেস হাতছাড়া—সেখানে ফেরার কোনো উপায় নেই। অতএব সর্বভারতীয় মুসলিমদের নেতৃত্ব নিয়েই তাঁকে এগোতে হবে। তিনি বুঝেছিলেন, মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলিকে এক্ষেত্রে প্রধান সিঁড়ি করা ব্যতীত গতি নেই, কিন্তু পাঞ্জাবে তো সবেধন নীলমণি, অতএব বাংলাকেই আরো জোরদার করে খেলাটা এগিয়ে নিতে হবে। যাহোক, ফজলুল হক ও পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কে অধ্যাপক অমলেন্দু দে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন মিঃ জিন্না যে অর্থে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রস্তাবনা ও প্রসার ঘটিয়ে পাকিস্তানের বাস্তবতা সম্পর্কে সমর্থকদের উৎসাহিত করেছিলেন এবং পরোক্ষে নিজের অস্তিত্বের ভিতটা পাকাপোক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন সেই অর্থে আদৌ ফজলুল হক প্রস্তাব উত্থাপন করেননি। কিন্তু ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যারপরনাই চিন্তিত ছিলেন ; কেননা আট কোটি মুসলমান তো কোনো একটি প্রদেশে বা দু' একটি প্রদেশের মধ্যে বসবাস করছেন না—ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন সর্বত্র। ফজলুল হক স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিজ স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন মাত্র এ কথা স্বীকার করার কোনো যৌক্তিকতা রয়েছে বলে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। অধ্যাপক দে উল্লেখ করেছেন যে, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন এবং সেখানে সংখ্যালঘুর অধিকার সম্পর্কেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন, কিন্তু তিনি এর বিষময় ফলের কথা ভাবেননি।[৫] প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক দে-র এই শেষোক্ত বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা ফজলুল হক তো পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন (যদিও 'পাকিস্তান' শব্দটা ছিলো না), মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গী করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের 'সার্বভৌম' বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন, কিন্তু তিনি যে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সেখানকার সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে—সাম্প্রদায়িক অবস্থান সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। বলা যেতে পারে প্রস্তাবের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা বা দায়িত্ববোধ যদি থেকেই থাকে তবে তিনি তা দেখাবেনও, কিন্তু এর অন্ধকার দিকের উল্লেখ তিনি জেনেশুনেই কোথাও করতে সচেষ্ট হননি ; তিনি যে এখনও বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং খাজা নাজিমুদ্দীনকে এক-আধটু প্রতিদ্বন্দ্বীও ভেবে থাকেন। বস্তুত মিঃ জিন্নাকে সন্তুষ্ট করেই তিনি এক ঢিলে দুই পাখি

মারতে উদ্যত হয়েছিলেন, প্রথমটায় বিগত দিনের জয়-পরাজয়ের হিসেবটা যাতে মিঃ জিন্নাকে ভুলিয়ে দেয়া যায় এবং আরো কাছাকাছি হয়ে বাংলার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী-খাজা নাজিমুদ্দীনের উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে স্থায়িত্ব দেয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা পূর্ব এবং পরবর্তী উভয় সময়কে মিলিয়ে ফজলুল হকের কর্মজীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে তিনি কিছুটা অস্থির-মতির ছিলেন, হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিতেন এবং আকস্মিকভাবেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতেও পারতেন।

দ্বিজাতি তত্ত্বই বলি বা ফজলুল হকের প্রস্তাবের কথাই ধরি কোথাও কিন্তু দেশ ভাগের কথা সরাসরি নেই। উল্লেখ হলো হিন্দু-মুসলমানের জন্য দুটি রাষ্ট্র, আবার মুসলমানদের রাষ্ট্রটার ছবি হলো কিছুটা অদ্ভুত ধরনের, মুসলমানদের জন্য একের মধ্যে দুই হবে—পূর্ব দিকে এক, অপর হবে উত্তর-পশ্চিম ; এই দুটি অংশই হবে সার্বভৌম এবং স্বাধীন, অবশ্যই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পরে। একটা গোঁজামিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো নাকি? মিঃ জিন্না চেয়েছিলেন দাবীটা এমন হোক যাতে ব্রিটিশরা শুধু কেন মায় কংগ্রেস পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দর কষাকষিতে এগিয়ে আসে। দীর্ঘ দিন ধরেই তিনি বক্তব্যটাকে ধোঁয়াটে করে রেখেছিলেন, তিনি বা লীগ এর কোন পরিচ্ছন্ন ব্যাখ্যা দেননি বা করেননি। প্রকৃতপক্ষে বড়লাট তো বেশ আমোদ অনুভবই করছিলেন এই কারণে যে কংগ্রেস ও লীগ উভয়ের দাবী উচ্চকিত, কিন্তু দুয়ের মধ্যে মিল খুব সামান্য থাকলেও বৈপরীত্যের ভাগটাই বেশীর ; যা এদের পক্ষে সামঞ্জস্যে আসা দুরূহ ব্যাপার—যেভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটা সংগ্রাম ভারতীয়দের এক ছাতার নিচে আসতে সাহায্য করেছিলো সেখানটায় একটা নতুন উপাদান এসে গোঁজ বসিয়েছে। ব্রিটিশের একটা জুতসই প্রচার চলতেই থাকে, ভারত ভৌগোলিক দিক দিয়ে নির্দিষ্ট সীমারেখাতে থাকলেও এখানে জাতপাতের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়, ভারতের মানুষ তো বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে আর ধর্মীয় দিক দিয়েও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তখন তো সোনায় সোহাগা, মিঃ জিন্নার তত্ত্ব তো তাদেরকেই সাহায্য করছে—এটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলে সেটা অবশ্যই ব্রিটিশ স্বার্থকে রক্ষা করতে সহায়তা ঘটাবে। একটা জাতি গড়ে ওঠার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও সত্য থাকে মিঃ জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বে তা না থাকলেও ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতার চেতনাকে বিঘ্নিত ও প্রলম্বিত করেছে একথা সংশয়হীনভাবেই উচ্চারণ করা যায়। তবে মিঃ জিন্নার ইচ্ছাকৃত বিভেদকামী ঘোষণার (ব্রিটিশরাই ভারতে 'ঐক্য' নামক একটা কৃত্রিম আবেগ সৃষ্টি করেছে যা অতীতে ছিলো না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না) পাশাপাশি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ কিন্তু কম যায়নি, তাদের বক্তব্যের সারবস্তু ছিলো যে হিন্দুরাই তো এ দেশের প্রকৃত অধিবাসী, মুসলমানরা জবরদখল করেছিল বলে বর্তমানে হয় তাদের তাড়িয়ে দিতে হবে নয়তো নাগরিক হিসেবে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বলে গণ্য করতে হবে। দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং লাহোর প্রস্তাবকে সামনে রেখে অধ্যাপক সুমিত সরকার এক ধাপ এগিয়ে বলেন .

> 'স্থানগত পুনর্বিন্যাসের কোনো সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয় নি। আর, 'কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র'—উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যের এই শব্দগুলির নিহিতার্থ মনে হয় বিচ্ছিন্নতাই, কিন্তু সম্ভবত এর অর্থ একটা আল্‌গা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বেশি কিছু না-ও হতে পারে। বহুবচনেব ব্যবহার এবং এককগুলিব সার্বভৌমত্বের ওপর গুরুত্বটা দেশভাগের

> পরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ পাঞ্জাবী আধিপত্যসহ এককেন্দ্রীয় পাকিস্তানের ধারণার বিরুদ্ধে ফজলুল হকের নেতৃত্বে আওয়ামি লীগের যে আন্দোলন শুরু হয়, এ-ই ছিল তার তাত্ত্বিক ভিত্তি। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন মারফতই পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসে বাংলাদেশ।[৮]

তাঁর এই বক্তব্যের শেষটা কোনো প্রকারেই অস্বীকার করার উপায় নেই, কেননা বাংলাদেশ আজ বাস্তব। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী থাকলেও বাংলা ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদ বিষয় কি একটি শব্দও ছিলো? মিঃ জিন্নার চৈতন্যে প্রথমাবস্থায় এ বিষয়টি আসেনি, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আগ্রহটা যে ছিলো অধিক কাম্য এবং বিবেচ্য বিষয়। আশ্চর্যের হলেও সত্য দ্বিতীয়বার বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ হলো।

ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির উৎস সন্ধানে দেখা যাবে দুটি পরস্পর ধারা ও অভিমত উত্থাপিত হয়েছে। এ পর্যন্ত আলোচনাতে একটি ধারা মুখ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু চৌধুরী খালিকুজ্জামান, জামিলউদ্দীন আহমদ, মোহম্মদ আশরাফ, কে. কে. আজিজ, A. A. Ravoof, জাভিদ ইকবাল, ওয়াহেদ-উজ-জামান, G. Allana, H. V. Hodson, আবদুল হামিদ্ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ দ্বি-জাতি তত্ত্বকে সঠিক এবং বাস্তবসম্মত বলে কম-বেশী উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক কে. কে. আজিজ দ্বি-জাতি তত্ত্বের উৎস খুঁজতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের উর্দু শব্দ 'qaum'-কে জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, জনাব আগা খান এবং জনাব আমীর আলীর পরেই মিঃ জিন্নাকে এই ধারণার বাহক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন :

> But it was Jinnah who, for the first time, proclaimed that India was inhabited by two distinct nations-Hindus and Muslims-which could not live in one State.[৯]

অধ্যাপক কে. কে আজিজের মতে কংগ্রেস কখনোই মুসলমানদের সমস্যা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়নি, কেননা কংগ্রেসের ধারণা ছিলো মুসলমানদের জাতিসত্তা সম্পর্কে যে সমস্যা তার কোনো বাস্তবতা নেই, নয়তো তো এতোই দুরূহ বিষয় যার মোকাবিলা করা কংগ্রেসের সাধ্যাতীত।

লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনের (১৯৪০) এক বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হলো, বাংলার রাজনীতিতে মিঃ জিন্না ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হলেন; অবশ্যই ফজলুল হকের কাঁধে ভর দিয়ে। কিন্তু গোলমালটা লাগলো বাংলার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফজলুল হক প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে যোগ দিলে। মিঃ জিন্না নির্দেশ পাঠালেন তাঁকে প্রতিরক্ষা কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে, নয়তো বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে। কেননা কেন্দ্রীয় স্তরে তখনো ভাইসরয়ের সঙ্গে মিঃ জিন্না ক্ষমতা লাভের অঙ্গীকার চেয়ে স্বীকৃতি আদায় করতে পারেননি। এটা নিশ্চিত যে এর মাধ্যমে মিঃ জিন্না ভাইসরয়কে চাপে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফজলুল হক ব্যবহৃত হচ্ছিলেন মাত্র। ফজলুল হক কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে অস্বীকার করেন, ফলশ্রুতি তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্য থেকেই খাজা নাজিমুদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নবাব হাবিবুল্লা প্রমুখ এক বিবৃতির মাধ্যমে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

২৭শে নভেম্বর (১৯৪১) জে. সি. গুপ্তের বাড়িতে একটা বৈঠক হলো, এখানে উপস্থিত

ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক, শরৎচন্দ্র বসু, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, শামসুদ্দিন আহমেদ, হেমচন্দ্র নস্কর, খান বাহাদুর হাসেম আলী খান প্রমুখ বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দ। অবশ্য ইতোমধ্যেই ফজলুল হক মুসলিম লীগের অবস্থান সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ওঠেন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা এখনো মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেননি, তাই এখানে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠিত হলেও তাতে ফজলুল হক স্বাক্ষর দেননি। কিন্তু তাকে স্বাক্ষর করতেই হলো ১লা ডিসেম্বরে লীগ সদস্যারা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করার পরে। ৩রা ডিসেম্বরে ফজলুল হক প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করে ১২ই ডিসেম্বরে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মিঃ জিন্না দুঁদে রাজনীতিবিদ হয়েও এতোটা হয়তো অনুমান করতে পারেননি ; পরবর্তীতে তিনি বাংলার মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে 'হক-শ্যামা' মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে নির্দেশ দেন। এমনিতেই খাজা নাজিমুদ্দীন খাই-খাই করছিলেন এবারে শহীদ সোহরাওয়ার্দী অভয় দিলেন এবং যৌথভাবে হক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিষোদগাব করেই ক্ষান্ত হলেন না—মুসলিম সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী ফজলুল হক এই বলে প্রচার অব্যাহত রাখলেন।

লেখক সিরাজউদ্দীন আহমেদ 'মহানায়ক' বলে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর[৮] নামোল্লেখ করলেও ১৯৪২ পর্যন্ত তিনি তো মুসলিম লীগের স্বার্থ রক্ষার দোহাই দিয়ে মিঃ জিন্নার অভিপ্রেত ও প্রতিষ্ঠাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন, তিনি হক মন্ত্রিসভাতে থাকাকালীন হকের নীতির বিরোধিতা করেছেন এবং যৌক্তিক উপায়ে নিজেকে প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থিত করেছেন এমন নিদর্শনের খুবই অভাব, তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ তিনি পালন করেছেন; হক-শ্যামা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকিত ছিলেন। নাজিমুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী প্ররোচনায় বাংলার মুসলিম ছাত্রসমাজ হক-শ্যামা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল এবং তাবা ফজলুল হককে বিভিন্ন সভায় অপমান করে।

ঘটনা এখানেই থামেনি, নীতি বহির্ভূত যে কোনো উপায়ে বাংলায় মুসলিম লীগ (বিশেষভাবে সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দীন) ফজলুল হকের বিরুদ্ধে প্রচার চালায় যা শেষ পর্যন্ত কুৎসার স্তরে পৌঁছে যায়। এই সময়কার বিধানসভার কার্যবিবরণীতে এর বহু দৃষ্টান্ত খুঁজলে দেখা যাবে। ২০শে জুন (১৯৪২) ফজলুল হক লীগের বিদ্বেষমূলক অপপ্রচারের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে চিঠি দিলেন এবং পরদিন ২১শে জুন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে চিঠিটি প্রকাশ পেল।[৯] ফলশ্রুতি, বাংলার লীগ নেতৃবৃন্দ তাঁকে বিশ্বাসঘাতক (মীরজাফর) বলে আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন জনসভা করতে থাকে, সেখানে আরো বক্তব্য থাকে—সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। মিঃ জিন্না যা চাইছিলেন কার্যগতিকে তা-ই ঘটে গেল এবং ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবন ক্রমশ ষড়যন্ত্রকারীদের বিদ্বেষ ও প্রতারণামূলক প্রচারে বাংলার সাধারণ মুসলমানদের কাছে আলগা হয়ে পড়ে।

এ. কে. ফজলুল হকের প্রতিষ্ঠা কৃষক-প্রজা পার্টির গঠন ও নির্বাচনী বিজয়ের মাধ্যমে' তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্বেও ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনে লীগের বিরুদ্ধে কথা বলতেও দ্বিধা করেননি। ইসলামের মূল নীতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে বরং ইসলামের নীতি সৌভ্রাতৃত্বকে তুলে ধরে বাংলায় দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠনের পরে সাম্প্রদায়িক অচলায়তন ভাঙ্গতে চেষ্টা

করেন। এই সময়টাতে তিনি হিন্দু-মুসলমানের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু রচনায় অনলস কর্মী হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। যদিও রাজনৈতিক দিক থেকে এর মাধ্যমেই তিনি বাংলায় মিঃ জিন্নার খবরদারি ক্ষুণ্ণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই সাদাকে সাদা বলার মতো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী বিভেদ দূর করে বন্ধুত্বের বাতাবরণ সৃষ্টির তাঁর এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। বস্তুত সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাবো ফজলুল হক আশাবাদী ছিলেন। তিনি বাংলার সীমানা অতিক্রম করে সৌহার্দের শুভ বার্তাকে ভারতব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেন। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার কথা তার মধ্যে থাকলোই বা! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৃথিবী যেখানে নীতি ও আদর্শের দোহাই দিয়ে মূলত নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত—তার প্রতিক্রিয়া ঔপনিবেশিক ভারতে ছোঁয়া দেবে না সেকথা ভাবা অবান্তর। ভারতের ভাইসরয় কি ব্রিটেনের স্বার্থ রক্ষায় কোনো অবস্থায়ই দ্বিধা করেছেন? গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দ্বন্দ্ব পরোক্ষে ব্রিটিশরাজকে সাহায্য করেনি কি? মিঃ জিন্নাকে সমানে ইন্ধন দিয়ে পরিবর্তনশীল যুদ্ধাবস্থায় টালমাটাল বৈদেশিক পরিস্থিতিতে অগ্নিগর্ভ ভারতে ব্রিটিশের অস্তিত্ব রক্ষার কথা—স্বার্থের কথা বড়লাট ভাবেননি কি? এ. কে. ফজলুল হককে শুধুমাত্র বাংলার রাজনীতিতেই খাজা নাজিমুদ্দীন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতিপক্ষ ভাবলে অসম্পূর্ণ হবে সে ভাবনা, সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এসময়ে তাঁর ধ্যান-ধারণার কারণ ও বাস্তবতা আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

১৯৪১-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা বিশ্বের দেশগুলোকে দুটো শিবিরে পরিণত করে দিয়েছিলো একথা সত্য, এই মহাসমরের সময়ে ভারতের মতো পরাধীন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে আবদ্ধ দেশগুলি স্বপ্ন দেখছিলো স্বাধীনতার। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি—এরা প্রত্যেকেই স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসুক হলেও ভিন্নমুখী পন্থা এক একটি দল গ্রহণ করে। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র নেই, জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ গান্ধীজীর ছত্রছায়ায় কিন্তু ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে জনমানসে ক্ষোভ দীর্ঘায়িত হচ্ছে, গান্ধীজীর অহিংস নীতির সামনের সারির মাতব্বরেরা মেনে নিলেও সাধারণ কর্মীরা নতুন আন্দোলন প্রত্যাশায় উন্মুখ। নোতুন কিছু চাই। আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা যুদ্ধনীতিতে হিটলার এগিয়ে চলছে, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি হলেও মিলছে না হিসেবটা তার। স্তালিনও সতর্কবাণী শুনতে পাচ্ছেন ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছ থেকে—হিটলার সময়ের অপেক্ষায়—যে কোনো সময়ে সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করতে পারে। স্তালিন ১৩ই এপ্রিলে জাপানের বিদেশমন্ত্রী মাৎসুওকার সঙ্গে চুক্তি করলেন নিরপেক্ষতার। স্তালিন দুষলেন ব্রিটেনকে, তারা গুজব ছড়াচ্ছে যে হিটলার সোভিয়েত আক্রমণ করবে। কিন্তু গুজবটা সত্যি হলো, ২২শে জুন হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলো। স্তালিন বাস্তবতা বুঝলেন। ব্রিটেন তো স্তালিনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য উদগ্রীব। কেননা যুদ্ধের বীভৎসতা তাকে অষ্টেপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত দাঁত বসাচ্ছে, অতএব আলিঙ্গ্য সোভিয়েত রাশিয়া ; নাৎসিবাহিনীকে ঠেকাতে চাই সম্মিলিত প্রচেষ্টা। ব্রিটেন ঘোষণা করে সোভিয়েত রাশিয়াকে সাহায্য করার, চার্চিল ২২শে জুন বেতারে বললেন :

> Any man or state who fights on against Nazidom will have our aid Any man or state who marches with Hitlar is our foe [১৮]

বস্তুত সোভিয়েত রাশিয়ার বিপদ, তাদের আক্রান্ত হওয়াটা যেন ব্রিটেন, আমেরিকা অন্যান্য স্বাধীন দেশেরই বিপদ। নাৎসিবাহিনীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত শুভবুদ্ধি, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ও স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিদের বিপদ বলে পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যখন ভাবছে ভারতে তখনও কমিউনিস্টদের ওপর থেকে হুলিয়া ওঠেনি, বড়লাট বিশ্বাস করতে পারছেন না জেলে আটক বামপন্থীরা, বিপ্লবী, কমিউনিস্টরা নতুন কোনো বিপ্লবে জড়িয়ে পড়বে কিনা। অথবা এমন ধ্বংসাত্মক কাজে ভারতের জনজীবনকে অস্থির করে তুলবে কিনা যাতে ব্রিটিশ স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু হিটলারের সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণে কমিন্টার্ন-এর ঘোষণা অনুসারে ভারতের কমিউনিস্টরাও নতুন করে ভাবতে চেষ্টা করলো, কমরেড রণদিভে এ বিষয়ে লিখলেন যে সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে—মূল্যবোধকে আক্রমণ করেছে অতএব আজকের যুদ্ধের চেহারা বদল হচ্ছে, এই জনযুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্টদের কী করণীয় এবং সরকারের কাছেই বা কি দাবী। ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টিও এগিয়ে এলো বক্তব্য নিয়ে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও সিদ্ধান্ত নিলো বর্তমানে সরকারের যে যুদ্ধনীতি তার সঙ্গে অসহযোগিতা না করে বরং সহযোগিতার মাধ্যমে রাশিয়া-ব্রিটেন-আমেরিকার শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের প্রগতিশীল সমস্ত শক্তিকে এক আঙিনায় জড়ো করা দরকার। তাদের দাবীও ছিল বড়লাটের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করার পাশাপাশি রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাবোধের উন্মেষ ঘটানোর। কমিউনিস্টদের কাজটা ছিলো কঠিন এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের, কেননা ভারতে ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ পূর্বের মতোই সমাজতান্ত্রিক বা বলশেভিক আতঙ্কে তখনও ভুগছেন, কিন্তু এ সময়ে বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পাওয়া বড়ো প্রয়োজন; সংগঠনও সেভাবে বিস্তৃত হয়নি যা শহরের শ্রমিক এলাকাকে সঙ্গী করে শোষিত কৃষক সম্প্রদায় এগিয়ে আসবে—তাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করবে। অথচ বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়া—যে রাষ্ট্র এই আদর্শের ধারক এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির শোষণ অবস্থা থেকে মুক্তির স্বার্থে দৃঢ় প্রত্যয়ী। অতএব, এ যুদ্ধ তো শুধু সাম্রাজ্যবাদী নাৎসিবাহিনীর বিরুদ্ধেই নয়, আদর্শকে টিকিয়ে রাখার বাজি,পৃথিবীর শোষিত-শ্রমিক কৃষকের বাঁচার আশা-আকাঙ্খাকে নিভতে না দেয়ার অঙ্গীকার। তাইতো স্তালিনের জনযুদ্ধ ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছেও এক সমান অর্থ বহন করে যার অর্থ জনযুদ্ধ।

জাতীয় আন্দোলনকারী কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা অংশ যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলেন। যুদ্ধে অক্ষশক্তি জিতলে ভারত তথা বিশ্বে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে এটাও তাদের ধারণায় ছিলো ; কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্য যে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস নেতৃত্ব গান্ধীজীর ছত্রছায়ায় চোখ বুজে থাকতেই আরামবোধ করছে। জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডুর আর দু'একজন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটা কেমন করে জনযুদ্ধের রূপ নিলো, নাৎসিবাহিনী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়াকে পরাজিত করলে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যত কি এ সম্পর্কে ধারণা রাখলেও কংগ্রেসের মধ্যকার গান্ধী-নির্ভর চোখ-কান বুজে থাকা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বাহক অধিকাংশ মোড়লদের তাঁরা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন ; মায় গান্ধীজীও ব্যাপারটা

কতোখানি বুঝেছিলেন সেটা আলোচনার বিবেচ্য বিষয়। তবুও মন্দের ভালো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৮ই আগস্ট বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কংগ্রেস বিশ্ব রাজনীতি ও যুদ্ধের এহেন পরিস্থিতিতে মিত্রশক্তিকে সাহায্য করতে চায়, মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযান তারা প্রতিরোধ করতে চায়; কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বা প্রাথমিক শর্ত হলো ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান প্রধানদের নিয়ে ভারতের জন্যে একটা অস্থায়ী সরকার গড়ে তোলা। এ পর্যন্ত প্রস্তাবের একটা অংশ—যার উপযোগিতা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু এর দ্বিতীয় অংশটা কার্যত এর আদর্শকেই বিঘ্নিত করে। প্রস্তাবের এই পর্বে বলা হলো প্রস্তাবের প্রথমাংশে ব্রিটিশ সরকার সম্মত না হলে কংগ্রেস প্রয়োজন মাফিক গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং এর নেতৃত্ব দেবেন গান্ধীজী। প্রথম পর্বটাকে কমিউনিস্টরা গ্রহণ করলেও দ্বিতীয় অংশটার জন্য বিরুদ্ধে ভোট দেয়া, কেননা তাঁদের বিশ্বাসের ভিতটা এভাবে দায়বদ্ধ যে, আজকে সেই আন্দোলনের প্রয়োজন যা মিত্রশক্তিকে জয়ী করতে সাহায্য করবে এবং পক্ষান্তরে নাৎসি-ফ্যাসিস্টদের বিনাশের লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

এভাবে 'ভারত ছাড়ো' বা আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এবং মতামতের সূত্রপাত ও বৈপরীত্য। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনটা শুরু হলে 'জনযুদ্ধকে সামনে রেখে ফ্যাসিজমের পরাজয় সাধন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বিজয়ের কামনা ও প্রচেষ্টা তাঁদের কাছে হয়ে ওঠে মুখ্য বিষয় ও পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নটিও তাঁরা ভুলে যায় না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি একই সঙ্গে ত্রিমুখী কার্যক্রমের সঠিক রূপায়ণের বাস্তব প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের যে সম্মেলন (১৯৪০) হলো তার সিদ্ধান্তগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কংগ্রেস এখন কোনো আন্দোলনে যেতে চাইছে না আর যুদ্ধটা যেহেতু সাম্রাজ্যবাদী তাই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাও যুক্তিসঙ্গত মনে করছে না। গণপরিষদ থাকবে, সালিসির মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারটা মিটমাট করে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু ডোমিনিয়ন মর্যাদাটা খুব জোলো পানসে ; অতএব দাবী তো থাকতেই হবে। আন্দোলন বলতে যা হবে—এমন কি আইন অমান্য আন্দোলন হলেও গান্ধীজী তার নেতৃত্ব দেবেন। কংগ্রেসের বাঘা বাঘা মোড়লরা ১৯২০-১৯২১, ১৯৩০-১৯৩৩—এই দু'দুটো আন্দোলনের ফলশ্রুতি বা পরিণতির খুব একটা পর্যালোচনা না করেই সঙ্কটকালে গান্ধীজীর শরণাপন্ন হবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কট্টরদের বাইরে বামপন্থীরা বিশেষত কমিউনিস্টরা তো একটা হেস্তনেস্ত চাইছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের জঙ্গী মনোভাবটা উবে না গিয়ে বেশ পাকাপোক্ত হয়েছে ; কিন্তু তাদের দাবী ও চিন্তা কান দেয়ার লোক কংগ্রেসে যে খুবই কম। গান্ধীজীর হাতে আন্দোলনের লাগামটা দেয়া হলো, কিন্তু পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা এগোলো না। গান্ধীজী এতক্ষণে কিছুটা চিন্তায় পড়লেন মুসলিম লীগ নিয়ে, কংগ্রেস আন্দোলনে নামলে তাদের ভূমিকাটা কী হবে!

সুভাষচন্দ্র একগুঁয়ে, না আপোস, না অহিংসাতে বিশ্বাসী। কংগ্রেস তো তাঁর কাছে এখন সম্পত্তির ভাগীদার বেয়াক্কেলে ভাসুর, তিনি Anti-compromise conference ডেকে নিজের মতামতকে উপস্থিত করলেন। জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব

সিরাজউদ্দৌলার সম্মানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের অপকীর্তি হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ সরানোর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে সত্যাগ্রহ করলেন। অন্ধকূপ হত্যার ঐতিহাসিক সত্য যা-ই থাক না কেন সুভাষচন্দ্র স্মৃতিস্তম্ভ সরানো নিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টিতে কৃতকর্ম হলেন। প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এই সত্যাগ্রহে যোগ না দিলেও বিরুদ্ধাচবণ করেননি। বিশ্বযুদ্ধের গতি তখন তো মিত্রশক্তির বিপক্ষে তাই ৬-১৩ই এপ্রিলের ফরওয়ার্ড ব্লকের জাতীয় সপ্তাহ পালনকে সরকার অবহেলা করতে পারেনি, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের এবার গ্রেপ্তারের পালা শুরু হলো। সুভাষচন্দ্রের চেতনায় ছিলো বিপ্লববাদ, সহিংস নীতির মাধ্যমেই বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে পারে এ ধারণা তাঁর চিন্তায় প্রাধান্য বিস্তার করলে বছরের মাঝামাঝি থেকেই তিনি বৈদেশিক সাহায্যের কথা ভাবতে শুরু করেন। অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য চাই ব্রিটিশ বিরোধী কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের সরাসরি সাহায্য-সহযোগিতা। সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হলেন। নভেম্বর মাসে তিনি আমরণ অনশন শুরু করলে ৬ দিন পরেই জেল থেকে এনে সরকার তাঁকে গৃহবন্দী করে। ১৯৪১-এর ১৭ই জানুয়ারি প্রত্যুষে সুভাষচন্দ্র জীবনযুদ্ধের (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও বটে) নতুন অধ্যায়ের সূচনায় দক্ষ অভিনেতার মতোই ছদ্মবেশে পুলিসকে বোকা বানালেন; ২৮শে মার্চ তিনি বার্লিন পৌঁছান, অতঃপর সাক্ষাৎ করেন জার্মান বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে। শুরু হলো ভারতের অন্য এক অধ্যায় যা বীরত্ব ও ত্যাগের আদর্শে উজ্জ্বল, বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের কাছে আবেগে মথিত স্বদেশপ্রেমের নতুন সংজ্ঞা।

রামগড় কংগ্রেসের 'ত্রিপঞ্চাশৎ' অধিবেশনের পরে জুলাই মাসে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে পুনায়। সেখানে অহিংসনীতির প্রতি আস্থা স্থাপন শেষে ভারতকে গণতান্ত্রিক শিবিরে রাখার পক্ষে প্রস্তাব পাশ হলো। কিন্তু জওহরলাল নেহরু ক্রমশই নিজ অবস্থানে নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছিলেন, বামপন্থীরা তাঁর উপর বা কংগ্রেসের উপর চাপ বৃদ্ধি করছিলো। পক্ষান্তরে ভারতের বড়লাট ক্রমশ মিঃ জিন্না এবং পাকিস্তানপন্থীদের প্রতি নরম ও সহানুভূতিশীল মনোভাবের বৃদ্ধি ঘটালে জওহরলাল নেহরু বিব্রত বোধ করছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে এবং সহিষ্ণু মনোভাবের অভাব দেখা দিচ্ছে। মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগের প্রতি ব্রিটিশদের উত্তরোত্তর সহানুভূতিসম্পন্ন অবস্থানে—মনোভাবে গান্ধীজীও বিচলিত হচ্ছিলেন, কেননা ডোমিনিয়ন আর স্বরাজ এক নয়, লীগের পাকিস্তান আর ভারতের স্বাধীনতা সমার্থক নয়। জাতীয় কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ যেহেতু আলাদা সংগঠন তাই ১৯৪০-এর রামগড় কংগ্রেসের প্রস্তাব আর মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব একই অর্থ বহন করে না, এমন কি কাছাকাছি উদ্দেশ্যও স্থাপন করে না ; যদিও মুসলিম লীগ স্বাধীনতার কথা বলে।

১৯৩৯-এর ৩রা মে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যকার নিজ অনুগামীদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরী করলে কংগ্রেসের মধ্যেই তাঁর স্থান নির্ধারিত হয় বামপন্থী হিসেবে। পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় গেলে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীবৃন্দ অনেকটা হীনবল হয়ে পড়েন। অবশ্য গান্ধীজীর সক্রিয় সুভাষ বিরোধিতা ছিলো পরিকল্পিত, কিন্তু এর আঁচ থেকে বাংলা রক্ষা পেলো না ; শরৎ বসুর সঙ্গীরা ফজলুল হক মন্ত্রিসভাতে যোগ

দিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সংঘাত ইতিমধ্যেই তো ছড়িয়ে গিয়েছিলো। জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের মধ্যকার বামপন্থী চেতনার হয়েও ক্রান্তিকালে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেননি, কেননা তাঁদের বিশ্বাস গান্ধীজীর সঙ্গেই এখানে আদর্শগত প্রভেদ—এ অবস্থায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব নয়।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের চেতনায় যে দৃঢ়তা এসেছিলো তার প্রধান উপকরণই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্কটকে কেন্দ্র করে অবস্থার বিশ্লেষণ এবং ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার সংগ্রামী যৌথ প্রয়াস ; যেখানে তিনি কংগ্রেসকে করতে চেয়েছিলেন সংশপ্তক। কিন্তু গান্ধীজীর বিপক্ষে তো নেহরু যাবেন না। তিনি চাইলেন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্কটপর্বে কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীর সহাবস্থান। ব্রিটিশ গবেষক বি. আর. টমলিনসন বা মাইকেল ব্রেচার নেহরুর পক্ষে বা বিপক্ষে যা-ই বলুন না কেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জওহরলাল নেহরুর কর্মজীবন আলোচনা করলে কোথাও কি দেখতে পাবো বিপ্লবের জন্য সেই দৃঢ়তা যা সর্বাধিক মূল্যে হলেও স্বাধীনতাকে পেতে উৎসুক, অথবা স্বাধীন ভারতের সমাজ জীবন পরিবর্তনে বিপ্লবী চেতনায় জীবন-পণ প্রয়াস।

যাই হোক, জুন (১৯৪০) মাসের মধ্যেই জার্মানী ব্রিটেনের উপর বিমান আক্রমণ বাড়িয়ে দেয়, মিত্রশক্তির এই প্রধানের অবস্থাটা দিন দিন সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার বদল হলো, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উদয় হলেন উইনস্টন চার্চিল, ভারত সচিব হিসেবে এলেন এল. এস. অ্যামেরী ; কিন্তু ভারতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কোনোই রূপান্তর সূচিত হলো না। চেষ্টা হলো মাত্র ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো, গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশের অবস্থানকে অপরিবর্তনীয় রেখে একটা সমঝোতার আবর্ত সৃষ্টি করা! তাই বড়লাট লিনলিথগো আলোচনা করলেন গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্নার সঙ্গে। না, সর্বদলীয় কোনো আলোচনার সিদ্ধান্ত নেই, কিন্তু ব্রিটিশের প্রয়োজন বর্তমানে ভারতের সক্রিয় সাহায্য। লিনলিথগো ৮ই আগস্টে ঘোষণা করলেন যে বড়লাটের কার্যনির্বাহিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে, যুদ্ধ উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হবে এদেশীয়দের নিয়ে। কিন্তু উহ্য থেকে গেল পূর্ণ স্বাধীনতার কী হবে (ডোমিনিয়নের মর্যাদা তো পূর্বের প্রতিশ্রুতি, সে কমনওয়েলথ-এ থাকা না থাকা সমান অর্থই বহন করে), সংখ্যালঘুর নাম করে মিঃ জিন্নাকে তুষ্ট করে 'পাকিস্তান' দাবীটাকে অলক্ষ্যে গুরুত্ব দেয়া হলো। নয়া ভারত সচিব অ্যামেরী লর্ড লিনলিথগোকে সমসাময়িক ভারত, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস সম্পর্কে ভাবতে বললেন—১৯৩৫-এর শাসনতন্ত্রের বাইরে গিয়েও ব্রিটিশ স্বার্থে এদের ব্যবহার করা যায় কিনা, কিন্তু বড়লাট স্পষ্টই জানান যে সৈন্যবাহিনীতে মুসলমানদের সংখ্যার প্রাধান্য এবং মিঃ জিন্না তো যুদ্ধে সাহায্য করছেন। মিঃ জিন্নাও ২৮শে জুনের সাক্ষাৎকারে চড়া দাম হাঁকলেন, কেন্দ্র ও প্রদেশে সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের আসন সংখ্যা সংরক্ষণ এবং তা হতে হবে অর্ধেকটা ; মুসলমান সদস্য মনোনয়ন হবে শুধুমাত্র লীগের ইচ্ছানুসারে। কংগ্রেস আশাহত হলো, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ হবে। গান্ধীজী পেলেন পূর্ণ আস্থার সঙ্গে কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব। ১৫ই অক্টোবর গান্ধীজীর নেতৃত্বে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করলো। তবে এটা ব্যাপক গণ-আন্দোলন নয়, প্রতীকী—ভবিষ্যতের মহড়া মাত্র।

১৯৪১-এর মধ্যবর্তী সময়ে যুদ্ধের গতিধারা হঠাৎ করেই নতুন মাত্রা লাভ করে. ২২শে জুন হিটলারের নাৎসিবাহিনী বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে সোভিয়েত রাশিয়া। ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া মিলে মিত্রশক্তির দানা বাধে। ইতিমধ্যেই জার্মানরা দখল করে নিয়েছে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স হারালো তার আভিজাত্য। ৭ই ডিসেম্বরে এশিয়ার দেশ জাপান আক্রমণ করে পার্লহারবারে আমেরিকার নৌবহর। ১৯৪২-এর ৮ই মার্চে জাপান বিধ্বস্ত ও দখল করলো রেঙ্গুন, এশিয়া জোরদার ভাবে জড়িয়ে পড়লো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। জাপান স্লোগান দিলো 'এশিয়া এশীয়দের জন্যে'। ১৯৪১-এর শেষ থেকে ১৯৪২-এর মার্চ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নতুন মাত্রা পেলো, আমেরিকাও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে গেলো যুদ্ধে। জাপানের ক্রমান্বয়ে আক্রমণ ও বিজয়ে যুদ্ধটা এসে শ্বাস ফেললো ভারতের ঘাড়ে-গর্দানে। ভারতের রাজনীতিতেও এর একটা প্রভাব এলো প্রত্যক্ষভাবেই।

যুদ্ধের পরিস্থিতি জটিল হতেই কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলো, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও মুক্তি পেতে শুরু করেন ডিসেম্বর থেকেই। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যকার বামপন্থীরা এবং কমিউনিস্টরা কারাগৃহের অভ্যন্তরে থেকে গেল, ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গ এখনও তাদের বিশ্বাস করতে পারছে না। ডিসেম্বর মাসে নেহরু মতামত দিলেন মিত্রশক্তির পক্ষে, ব্রিটিশের পক্ষে সুগম হলো সহযোগিতার আশ্বাস চাওয়া। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধটা মৃত্যুর বিভীষিকায় আঁৎকে ওঠার মতো, অক্ষশক্তি অপরাজেয় বলে নিজেদের প্রতিপন্ন করতে চাইছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট Atlantic Charter-এর বক্তব্য অনুসারে বঞ্চিত মানুষের, পরাধীন মানুষের সার্বভৌম অধিকারের কথা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও স্ব-শাসনের প্রতিশ্রুতি পরোক্ষে স্মরণ করিয়ে দেন চার্চিলকে। চীন, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দেশ ভারতের সাহায্য-প্রত্যাশী; কিন্তু ব্রিটেন তখনও ভারতকে দায়িত্বশীল সরকার দিয়ে যুদ্ধে শরীক হতে—দায়িত্ব পালনের পরিবেশ তৈরী করতে গড়িমসি করছে। কিন্তু তাকে কিছুটা নমনীয় হতেই হলো, জাপান যে আগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ভারতের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেছে। চার্চিল ৯ই সেপ্টেম্বরে হাউস অব কমন্সে যদিও ঘোষণা করেছিলেন আটলান্টিক সনদ ভারতের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য নয় অর্থাৎ ভারত এই সনদ অনুসারে কোনো সুযোগ পেতে পারে না, সনদের বাইরেই থাকবে ভারত। কিন্তু জাপানী আগ্রাসী মনোভাব চার্চিলের গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়ায় ; অতএব মান্যবর ক্রিপ্‌সকে ভারতে আসতে হলো সমঝোতার সূত্র আবিষ্কারে—যদিও এটাও একধরনের ধাপ্পা, আপাতত ব্রিটিশ স্বার্থকে উহ্য রেখে মিত্রশক্তিকে সদিচ্ছাটা দেখানো।

ক্রিপ্‌স ভারতে এলেন এবং জয় করে গেলেন—ব্যাপারটা এমনিতরো হলো না, বরং জটলা থেকে গোলমালটা ধস্তাধস্তির পর্যায় পৌঁছে গেল।

ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ২৩শে মার্চ, ১৯৪২ ভারতে আসেন, উদ্দেশ্য ভারত শাসনমূলক কতগুলি প্রস্তাব এখানকার রাজনৈতিক দলগুলো এবং দেশীয়-রাজের কাছে উপস্থিত করা। প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, ভারত সচিব আমেরী এবং লিনলিথগো প্রমুখের আশা এর ফলে ভারতীয়রা যেমন শাসনতান্ত্রিক সুযোগ লাভ করবে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বা Atalantic charter-এর কাছে ব্রিটেনের দায়বদ্ধতা ও সদিচ্ছা প্রকাশ

পাবে। সর্বোপরি যুদ্ধের সময় ভারতীয়দের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে ব্রিটিশের পক্ষে এবং ভারতে বাস্তবভাবেই আন্দোলনগুলির তীব্রতা হ্রাস পাবে। ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ বা মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' দাবীর উপর যতোটা গুরুত্ব না দিতেন তার অপেক্ষা বড়ো ঘটনা তো ঘটেই গেল, ভারত থেকে পালিয়ে বার্লিনে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাতের পবে সুভাষচন্দ্র যে থেমে নেই সে খবরটাও নিশ্চিত চার্চিলের অগোচরে ছিলো না। ব্রিটিশরা তো ঘোষণা করেই দিয়েছে যে জাপানীরা ভারত দখল করতে চায় এবং তা জাপানী সৈন্যদের দ্বারা ; ফল হবে ভারত নতুন করে জাপ-শক্তির অধীন হয়ে পড়বে । অতএব, ভারতীয়দের এই যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করা উচিত। এর বিপরীত বক্তব্য অবশ্যই প্রচার পেল, সুভাষচন্দ্র দাবী করেছেন কলকাতায় বোমা বর্ষণের পূর্বেই ভারতীয় জনগণকে সতর্ক করতে হবে যাতে তারা কাঙ্খিত ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বার্মার পতন হলে তার সুযোগটা পুরো নিতে হবে, প্রয়োজন হবে ভারতের বাইরে থাকা ভারতীয় সৈন্যদের ভারতের মুক্তিযুদ্ধে।[১১]

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স ভারতে আসার আগেভাগেই ভারত সচিব অ্যামেরী বড়লাট লিনলিথগোকে জানালেন যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এমনি কোনো প্রস্তাব শীঘ্রই আসতে পারে। এবং ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা যে বিষয়টা নিয়ে খুবই চিন্তিত তার কেন্দ্রমূলে ভারতের সংখ্যালঘুদের নাছোড়বান্দা দাবী, আর কংগ্রেস সে দাবীর বিরুদ্ধেই বরাবব এবং এই দুয়ের সমন্বয় সাধনের পরে ভারতীয়দের কাছ থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে ব্রিটেনের সাহায্য লাভের পথ সহজ ও সুদৃঢ় করা কতখানি সম্ভব। ক্রিপ্স ভারতে এসেই লিনলিথগোর সঙ্গে আলোচনায় বসেন, তিনি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও একে একে মত বিনিময় করেন এবং ব্রিটেন থেকে সংগৃহীত চিন্তাধারা ও পরামর্শকে পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের চেষ্টা করেন। স্যার ক্রিপ্স মৌলানা আজাদের সঙ্গে ২৫শে মার্চ দেখা করেন, সেখানে অনেকগুলো দাবীর মধ্যে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে জনৈক ভারতীয়কে স্বীকৃতির দাবী, মূলত কংগ্রেসের দাবীই কংগ্রেস সভাপতির মুখে শোনা গেল। ক্রিপ্স ২৯শে মার্চে কাউন্সিল ভারতীয়করণের পাশাপাশি সরকার কোন ধরনের হবে তার ইঙ্গিত দিলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রকটা নিয়ে সমস্যা ঝুলেই থাকলো। গান্ধীজী কিন্তু ক্রিপ্স সাহেবের আলোচনা ও প্রস্তাব সম্পর্কে জোরালো মতামত দিলেন, 'পাকিস্তান' প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটিশের নমনীয় মনোভাবকে গ্রহণযোগ্য নয় বললেন, দেশীয় রাজাদের প্রতিনিধি নির্বাচন এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রক বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী এ সময়ে এতোটাই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন যে হঠাৎ করে ব্রিটিশ ভারত থেকে হাত গোটালে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় (মূলত সম্প্রদায়গত) অবস্থান যাই হোক না কেন তার প্রতি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না দেখিয়ে সরাসরি চাইলেন ব্রিটিশ ভারত থেকে চলে যাক এবং স্বাধীনতা লগ্নে যদি বিশৃংখলা দেখা দেয় তার দায়িত্ব ভারতীয়রাই বহন করবে এ বিষয়ে তিনি অঙ্গীকার করতে পারেন। মোদ্দা কথা ভারত থেকে ব্রিটিশের শাসন শেষ হোক। ক্রিপ্স বুঝতে পারছিলেন লিনলিথগো যেমন Provincial Option স্বীকার করেন না তেমনভাবেই তাঁর বক্তব্যে ভারতীয়রা বিশেষত কংগ্রেস উৎসাহ বোধ করছে না। তবু ২রা এপ্রিলে মৌলানা আজাদ ও জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তিনি

আলোচনায় বসেন। গান্ধীজী কিন্তু ক্রিপ্‌সের মূল সিদ্ধান্তের জন্যে বসে নেই, ৪ঠা এপ্রিলে গান্ধীজী ওয়ার্ধা চললেন,—আর নেহরু এবং আজাদকে নিয়ে ক্রিপ্‌স গেলেন ওয়াভেলের ঘর ; কিন্তু ফল হলো অশ্বডিম্ব। ভারতহিতৈষী সাহেব ক্রিপ্‌স থেমে থাকার পাত্র নন, তিনি একাধিকবার আলোচনায় বসেন, কিন্তু তাঁর মূল বক্তব্য ব্রিটিশ স্বার্থের কুহেলিকায় অর্ধোচ্চারিত থাকে। তাঁর বক্তব্যে প্রাধান্য পায় ভারত-স্বার্থকে আড়াল করে যুদ্ধে ভারতকে সরাসরি জড়ানোর প্রচেষ্টা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ১১ই এপ্রিলে। ভারতে এসে প্রথমেই তিনি মৌলানা আজাদকে যে বক্তব্য শুনিয়েছিলেন শেষ অবধি তা আর টিকিয়ে রাখেননি। কংগ্রেসও জাতীয় স্বার্থে দৃঢ়তার পরিচয় রাখে। মিঃ জিন্না তার সাম্প্রদায়িকতার রেকর্ডখানা বারবার বাজিয়ে যাচ্ছিলেন, বাড়তি কিছু সংযোজন হলো এই যে মুসলিম স্বার্থ রক্ষিত না হলে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। মিঃ জিন্নার এই আশঙ্কাকে Leonard Mosley এভাবে দেখেছেন :

> But later on, in 1942, when Japan was knocking at the gates of India itself and the safety of Indias own people was threatened, Congress still refused to join in the war effort. The idea that the Hindus would be prepared to accept Japanese occupation out of sheer resentment of the British was more than most British officials could stomach. They shuddered at the idea of the Indian sub-continent in the hands of men like Gandhi, the Congress leader, who, in 1942, calmly contemplated a Japanese victory and sent a message to the British people expressing his abhorrence of German Nazism and Italian Fascism but hoping that they would submit without fighting to both. Not unnaturally, they were inclined to embrace the Muslim League which not only supported the war effort enthusiastically but encouraged its members to join the armed forces and fight. In fact, sixty-five percent of the soldiers of the Indian Army who fought in North Africa, Italy, Malaya and Burma were Muslims–which means that there were thirteen Muslims to every seven Hindus in the fighting forces, though there were only nine Muslims to every twenty-four Hindus in India.[১২]

সুতরাং মিঃ ক্রিপ্‌স ভারতে এসে মিঃ জিন্নার প্রতি কিছুটা নমনীয় হবেন এটা খুবই স্বাভাবিক, যদিও তিনি ভারতে আসেন বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অবস্থানকে ব্রিটিশের পক্ষে সম্মত করাতে। মিঃ ক্রিপ্‌স প্রথমটাতে বেশ জোর দিয়েই বললেন যে, যুদ্ধশেষে ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটেন সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করবে; আশ্বাসও দিলেন ভারতের স্বাধীনতা খুব আর দূরে নয়। তবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য ভারতবাসীরও কিছু দায়-দায়িত্ব বর্তাবে বলেই ভারত শাসনের এগজিকিউটিভ কাউন্সিলটা পুরোদস্তুর ভারতীয়দের নিয়েই গঠিত হবে। আর সাম্প্রদায়িক সমস্যার মতো বিষয়টি যুদ্ধের মধ্যে না তোলাই শ্রেয়, যুদ্ধের পরে প্রদেশগুলি ঠিক করবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে তারা ভারতে থাকবে কি থাকবে না—অর্থাৎ মিঃ ক্রিপ্‌স মিঃ জিন্নার দাবীর উত্তর এভাবে দিয়ে কাউকেই এই সঙ্কট মুহূর্তে চটাতে চাইলেন না।

প্রদেশগুলি সম্পর্কে মিঃ ক্রিপ্‌সের বক্তব্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাছে, কংগ্রেস

সভাপতি মৌলানা আজাদের কাছে, সবচেয়ে বেশী আপত্তিকর মনে হয়েছিলো গান্ধীজীর কাছে। তিনি ক্রিপ্‌সের এই বক্তব্যের মধ্যে বেজায় ফাঁকি ধরে কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, কারণ মিঃ ক্রিপ্‌স তো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করে আপাতত একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছেন যাতে ব্রিটেনের স্বার্থটাই এ মুহূর্তে প্রবল হয়ে দেখা দেয় ; আর সাম্প্রদায়িক সমস্যা এর ফলে না কমে বরং বেড়েই যাবে। আমরা দেখি মৌলানা আজাদের সঙ্গে আলোচনায় ক্রিপ্‌সের মতামত ছিলো সাম্প্রদায়িকতার মতো বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা, যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন সাম্প্রদায়িক সমস্যা না মিটলে ভারতে রাজনৈতিক সমস্যা মিটানো সম্ভব নয়। ক্রিপ্‌স তো মৌলানা আজাদকে জানালেন যে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে অধিকার দেয়ার কথা তিনি বলেননি—প্রদেশকেই এই অধিকার দেয়ার তিনি পক্ষপাতী।[১৩] ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে প্রদেশগুলির অবস্থান নিয়ে গান্ধীজীও সোচ্চার হলেন, এককথায় এই প্রস্তাব মিঃ জিন্নাকে অভয় দেয়—পরোক্ষে তাঁর দ্বি-জাতি তত্ত্বকে স্বীকার করে নেয়। জওহরলাল নেহরু বার বার কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনি উল্লেখ করেন, আর যাই হোক অহিংসার মাধ্যমে জাপানীদের এই যুদ্ধে প্রতিহত করা যাবে না। তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উপর—সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার উপর নাৎসিবাহিনীর আক্রমণ, অক্ষশক্তির ক্রমাগত জয়কে তিনি সভ্যতা ও মানবতার সঙ্কট বলে আবেগে অস্থির হন। মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁর আরো বেশী উপস্থিত হলো এই কারণে যে মিত্রশক্তির পাশে সাহায্যকারী হিসেবে তিনি ভারতকেও উপস্থিত দেখতে পাচ্ছেন না ; কেননা ক্রিপ্‌স প্রস্তাব ফলপ্রসূ হলে তাঁর অনেকটাই স্বস্তি থাকতো।

১৪ই জুলাই (১৯৪২) কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির দেয় প্রস্তাবে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবী করা হয়, পাশাপাশি বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনায় রেখে কংগ্রেসের কর্মপন্থা সম্পর্কেও বক্তব্য থাকে। বস্তুত 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের রূপরেখা তৈরী হলো, গান্ধীজীব এই সময়কার ভূমিকা অতীতকে অতিক্রম করে। অহিংস গান্ধীজী ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের জন্য রক্ত নিতে চান না, কিন্তু প্রয়োজনে দিতে প্রস্তুত। যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলায় তিনি কংগ্রেসকে উপযুক্ত করতে যত্নবান, তিনি জানেন এবারের আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু স্বল্পকালের জন্যও জনসাধারণের মধ্যে হিংসার আশ্রয় লাভ করলে তিনি পূর্বের মতো আচরণ (আন্দোলনের হঠাৎ সমাপ্তি ঘোষণা) হয়তো নাও করতে পারেন। মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হচ্ছে। প্রশ্ন থাকে সংখ্যালঘু বিশেষত মুসলমানরা কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে কিভাবে গ্রহণ করবে—গান্ধীজীর বিশ্বাস সর্বত্রই কংগ্রেস অনুসৃত নীতি প্রয়োগে বাধা থাকবে না, প্রথমটায় সংশয় থাকলেও অচিরেই তারা মূল সত্য উপলব্ধি করে আন্দোলনে যোগ দেবে।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব (১৪ই জুলাই) কিছুটা সময় নিয়ে দেখার এবং এ.আই.সি.সি.-র সভা ডেকে অনুমোদনের প্রয়োজন অনুভব করলেন সভাপতি মৌলানা আজাদ। আর এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে ৭ই আগস্ট এ.আই.সি.সি.-র সভা ডাকা হলো। সভার প্রারম্ভিক বক্তৃতা করলেন মৌলানা আজাদ এবং তিনি বলেই দিলেন কেন তাঁরা সভাটা করছেন, ব্রিটিশকে যে কোনো অবস্থাতেই বোঝানো যাচ্ছে না ভারতীয়রা

গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে সাহায্য করতে আগ্রহী, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতীয়দের এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার কথা শুধু মুখেই বলেন এবং কার্যত সহযোগিতার পথ অবরুদ্ধ করে রাখেন তবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তো অধিকার থাকবেই তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলার এবং নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করার। ভারতীয়রা এখন এক অবর্ণনীয় সংকটের মধ্যে রয়েছে, জাপানী আক্রমণ ভারতীয়রা প্রতিহত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই এই মুহূর্তে ব্রিটিশরাজের উচিত ভারতের উপর থেকে হাত গোটানো—যেভাবে তারা সিঙ্গাপুর, মালয়-বর্মা থেকে চলে এসেছে।[১৪]

গান্ধীজীর ইচ্ছে পূর্ণ হতে চলছে, দেশব্যাপী শুরু হবে 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) আন্দোলন। হয়তো বা গান্ধীজীর আশাও ছিলো ভেবে-চিন্তে তিনি এই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী করবেন, অহিংস আন্দোলনে এবারে কেউ যেন আর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মতো স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার না করে—বলপূর্বক বন্দী করলে তার আব করবার কী থাকবে। বি. টি. রণদিভে ব্যাপারটাকে বা গান্ধীজীর এই ধরনের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট এভাবে দেখেছেন :

> ...আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে যে পরিবর্তন সেটা যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের গোচরে আসেনি—একথাটা বলা সঠিক হবে না। কংগ্রেসের প্রস্তাবে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থায় প্রচণ্ড একটা সঙ্কটের বিস্ফোরণ ঘটে। আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক বিন্যাস যে ভারতের অনুকূলে আসবে, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, আপস করতে হলে সেটা যুদ্ধ চলতে থাকলেই করতে হবে নচেৎ সে সুযোগ একেবারেই হারাতে হবে। অতএব তাঁরা এক ক্ষিপ্র ও স্বল্পায়ু সংগ্রামের ডাক দিলেন এবং গান্ধীজী আহ্বান জানালেন।—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।[১৫]

গান্ধীজীর আকাঙ্ক্ষার বৃহত্তর অংশটাই অপূর্ণ থেকে গেল, আগস্ট আন্দোলন বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনটা একটা অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ালো ঠিকই, কিন্তু গান্ধীজী সহ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের ৯ই আগস্ট সকালেই গ্রেপ্তার করার চেষ্টা হলো। গান্ধীজী, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহরু, আসফ আলী, ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ, শ্রীমতী নাইডু, পট্টভি সীতারামাইয়া, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনীর, প্রফুল্ল ঘোষ সহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা সব বন্দী হলেন, আন্দোলন পরিচালনার ভার সাধারণ কর্মীরা-জনসাধারণ নিজেরা কাঁধে তুলে নিলো।

মৌলানা আজাদ ১৪ই জুলাই থেকে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশের ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়কার গান্ধীজীর চিন্তা-চেতনা এবং ক্রিপ্‌সের ভারত ত্যাগের পরবর্তী ভাবনাগুলো তিনি নিজে বিশ্লেষণ করেও কর্মীদের কিন্তু গান্ধীজীর শেষোক্ত চিন্তা ও ভাবনাগুলো জানালেন। শেষের দিকে মৌলানা আজাদ একথাও সভাগুলোতে বলতেন যে ব্রিটিশ সরকার যদি কংগ্রেসের কাজে বাধা না দেয় তবে আন্দোলনটা অহিংসই থাকবে, কিন্তু সরকার যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে না থাকে (তাঁর মতানুসারে সেটা হওয়াই স্বাভাবিক) তখন পরিস্থিতিটা কেমন হবে—সে বিষয়ে তিনি গণৎকারের ভূমিকা নেননি। তবে সরকার হিংস্রতার আশ্রয় নিলে জনগণ তার জবাব দেবে এটা ঠিক, কিন্তু পদ্ধতিটা কী হবে তার পূর্বাভাষ ছিলো না। তিনি বুঝেছিলেন বাংলা, বিহার, সংযুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, দিল্লিতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের জন্য উপযুক্ত জমি

তৈরী হয়ে আছে ; অন্যান্য প্রদেশগুলির অবস্থা আশানুরূপ না হলে ভারতব্যাপী আন্দোলনটা কোন রূপ পরিগ্রহ করবে সে বিষয়ে তিনিও সন্দিহান ছিলেন।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের দৌত্য ব্যর্থ হওয়াতে ভারতের সর্বত্রই প্রকট হয়ে ওঠে এক দারুণ হতাশা, ভারতবাসীর মনে আশার সঞ্চার ঘটেছিলো, এবারে হয়তো তারা স্বাধিকার—মায় স্বাধীনতা পর্যন্ত পেতে পারে। কিন্তু ক্রিপ্‌স ব্যর্থ হলে ভারতের সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ বাড়ে, অনেকে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে সন্তুষ্ট করতে, চীনকে যুদ্ধে সাথী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই চাল চেলেছেন। সাধারণ মানুষের মনে এটা আরো বেশী বদ্ধমূল হলো ব্রিটেনের প্রচার কৌশল দেখে। ব্রিটিশের প্রচারটা ছিলো এমন—তারা ভারতকে স্বশাসন বা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দিতেই চেয়েছিল, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা এতোটা-ই উগ্র যে তারা যৌথভাবে নিজেদের স্বার্থটাও বুঝতে অপারগ। কিন্তু ভারতের বড়লাট লিনলিথগো থেকে শুরু করে অন্যান্যরা যেভাবে ক্রিপ্‌স সাহেবের উপর ভর করেছিলেন এবং পাঞ্জাবের সিকান্দার হায়াৎ খানকে ডেকে আলোচনা করেও যে ফল ফলেনি তার পিছনের কারণটা হতে পারে ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্রিটেনের স্বার্থের কথা এবং আরো দীর্ঘস্থায়ী প্রভুত্বের বাসনা সত্যি সত্যি পরিত্যাগ করতে পারছিলেন না। কিন্তু রুজভেল্ট বা মাদাম চিয়াং কাই-শেক বা জেনারালিসিমো এঁদেরও তো পাত্তা দিতে হবে চার্চিলের ; বিশেষত বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটেন যে ক্রমশ নাস্তানাবুদ হচ্ছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত (১৪ই জুলাই) জেনে এবং গান্ধীজীর সাংবাদিক সম্মেলনের খবরটা রপ্ত করে লিনলিথগো ঝোলা থেকে কালো বিড়ালটা টেনে আনেন ; তিনি এবং তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী ইতিমধ্যে মিঃ জিন্নার লাহোর প্রস্তাবের প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখিয়ে আশার সঞ্চার ঘটান এবং তাঁকে কংগ্রেস ও গান্ধীজীর অবস্থানের প্রতি বিরূপ হতে পরোক্ষে উৎসাহ দেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসকবর্গের প্রধানরা এতদ্ব্যতীত কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে যুক্ত নয় এমন অকংগ্রেসী শক্তিগুলোকে (বিশেষত শিখ, অব্রাহ্মণ, তফসিল ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ) একত্রিত করে কংগ্রেসও গান্ধীজীকে হীনবল করার প্রয়াস চালান। এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে বিষয়টি অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হবে।

প্রথমবারে এ. কে. ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠন করেন ১৯৩৭-এ, স্থায়ী হয় ১৯৪১ পর্যন্ত, দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠন করেন ১৯৪১-এব ১২ই ডিসেম্বরে। প্রথম মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলো মুসলিম লীগ, কিন্তু দ্বিতীয় মন্ত্রিসভাটা মুসলিম লীগকেই চ্যালেঞ্জ করে গঠিত হয়। প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ে ফজলুল হকের নীতি ও আদর্শ ছিলো কৃষক-প্রজা পার্টি, কিন্তু এই মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব কালের মধ্যেই তিনি মিঃ জিন্নার খপ্পরে পড়েন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভুলেও যান যে কৃষক-প্রজা পার্টিতে শুধু মুসলমানরাই নেই, বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের যৌথ সমর্থন ছিলো। তিনি বিভিন্ন সময়ে কতগুলো সভাতে এমন সব বক্তব্য উপস্থিত করেন যা সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট, এমনকি 'সাতনা বক্তৃতা'-য় তিনি উল্লেখ করেন ভারতের অন্যত্র যদি মুসলমানদের উপর কোনো ধরনের অত্যাচার হয় তবে তার বদলা নেয়া হবে বাংলায় প্রতিহিংসার মাধ্যমেই। কিন্তু অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন মিঃ জিন্না এবং লীগের

সঙ্গে চাল মেলাতে গিয়ে কোন্ ভুলটা করেছেন। মন্ত্রিসভায় থাকার দৌলতে লীগ সদস্যবৃন্দ বাংলায় তাদের আধিপত্য ক্রমশ বিস্তার ঘটাতে থাকে, এমন কি মিঃ জিন্না বাংলাতেও তাঁর অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব পেতে শুরু করেছেন। কেননা, লীগের প্রচার ছিলো হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করতে না পারলে ইসলাম ধর্মের বিকাশ ও মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তি তো কখনোই সম্ভব হবে না, আর হিন্দুদের প্রতিরোধ করতে মুসলিম লীগ তথা মিঃ জিন্নাকেই মেনে নেয়া মুসলমানের একমাত্র কর্তব্য। ফজলুল হক শ্যামাপ্রসাদের সহযোগিতায় দ্বিতীয়বার মন্ত্রিসভা গঠন করে সম্ভবত এরকম একটা উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইলেন, একদিকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা (মন্ত্রিত্ব বাঁচিয়ে ও অসাম্প্রদায়িক বলে নিজেকে জাহির করতে) অন্যদিকে কংগ্রেস ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কাছে নিজের ভাবমূর্তির পুনরুদ্ধার। আর এজন্যে তিনি লাহোরে নিজের তোলা পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই সরব হলেন। ফজলুল হকের মনেও এতোদিনে একটা ধারণা গড়ে ওঠে যে, লীগের মতোই কংগ্রেস সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বাংলার—বাঙ্গালীর স্বার্থকে ইতোপূর্বে কখনো গুরুত্ব দেয়নি। অধ্যাপক অমলেন্দু দে হাসান ইস্পাহানির লেখা (জিন্নার প্রতি) একটি চিঠি থেকে উদ্ধার করেছেন :

> Huq, by no means is a spent force. He has influence and a following. The Hindus are almost daily with him They are out to divide and crush the Muslims.[১৬]

এ ধরনের বক্তব্যের একটা অংশের যথার্থতা প্রমাণ করে ৮ই জানুয়ারি (১৯৪২) কেশবচন্দ্রের আটান্নতম মৃত্যুবার্ষিকীতে ফজলুল হক কলকাতার একটি সভায় সভাপতির ভাষণে কেশবচন্দ্রের জীবন থেকে শিক্ষণীয় হিসেবে একাগ্রতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে দেশসেবার কথা উল্লেখ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ফজলুল হকের বর্তমান ক্রিয়াকলাপের (বিশেষত দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও পাকিস্তান প্রস্তাবকে অযৌক্তিক বলার জন্য) ও আচরণের সমালোচনা করে প্রস্তাব গৃহীত হলো। তিনি মুসলিম লীগের এই আচরণের বিরুদ্ধে স্বৈরতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক চেতনা বহির্ভুত, গুণ্ডা এবং অসামাজিক ব্যক্তিদের প্রয়োজনে ব্যবহার—প্রভৃতি বিষয়গুলিকে উল্লেখ করে অভিযোগ আনেন যে, মিঃ জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগের কোনো নৈতিক অধিকার নেই মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয়ার। তিনি আরো বলেন যে, লীগের কার্যক্রমে ইসলামের মূল নীতি এখন অনুপস্থিত, অতএব এই লীগ মুসলমানদের সর্বনাশ করবে। তিনি ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধকে সামনে রেখে Progressive Muslim League গঠনের পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই পরিকল্পনা শুধু বাংলা নয় ভারতের রাজনীতিতে মিঃ জিন্নার প্রতি চ্যালেঞ্জ হলেও শেষ পর্যন্ত সংগঠনটি গড়ে ওঠেনি। কিন্তু বাংলা সহ ভারতের সর্বত্র মিঃ জিন্না এবং মুসলিম লীগ কর্মীরা সক্রিয়ভাবে ফজলুল হকের প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট করতে তৎপর হন। ফজলুল হকও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে বাংলা থেকে দূর করতে Hindu-Muslim Unity Conference-এর আয়োজন করেন ২০শে জুন শনিবার কলকাতার টাউন হলে। ১৮, ১৯ তারিখে তাঁর এই সম্মেলনের কর্মসূচী পত্রিকায় প্রকাশ পেলো। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, আর উদ্বোধনী বক্তব্যে ফজলুল হক গুরুত্ব আরোপ করেন হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর উপর। সভাপতির ভাষণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে নবাব বাহাদুর

বলেন যে, কাউকেই শুধুমাত্র নিজের ধর্মের কথা ভাবলে চলতে পারে না, জাতি ও দেশকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই সম্মেলনে ভাষণ দিলেন মন্ত্রী খান বাহাদুর হাসেম আলী খান, মেয়র হেমচন্দ্র নস্কর, ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, হুমায়ুন কবির, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মৌলানা আহমদ আলী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কিরণশঙ্কর রায়, স্যার এ. এইচ, গজনভি, সৈয়দ নৌশের আলী প্রমুখ।

ইতোপূর্বে ১০ই মার্চে ফজলুল হক, ডাঃ খান সাহেব, এবং আল্লা বক্স এই তিন প্রদেশের তিন নেতা যৌথভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্পণের দাবী জানিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠান। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় অপ্রতুল সাহায্যের জন্য এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনে ঘাটতির অভিযোগে সিন্ধু ও বাংলা সরকারের উপর ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ রুষ্ট হয়েছিলো। ২৯শে মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ ফজলুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বুঝতে চেয়েছিলেন জিন্না-হক পারস্পরিক অবস্থানটা কোথায় রয়েছে। ১৬ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী লিনলিথগোকে এবং বাংলার গভর্ণর স্যার জন হার্বার্টকে টেলিগ্রামে জানতে চান মুসলিম অধ্যুষিত বাংলার প্রধানমন্ত্রীর অবস্থানটা কোথায়। ব্রিটেন তো চায় তাদেরকে, বিশেষত এই দুইজনকে (মিঃ জিন্না এবং ফজলুল হক) অভিজ্ঞতার আলোকে দেখতে বুঝতে, কেননা তাঁরা এখনো গান্ধীজীর আন্দোলন বা মনোভাবের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি বা হননি আর এটাই ব্রিটিশের পক্ষে শুভসূচক। তিনি মিঃ হার্বার্টের উপর প্রগাঢ় আস্থা রেখে বলতে চান যে, এই জটিল পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মিঃ ফজলুল হককে প্রয়োজন। স্যার জন হার্বার্ট এর যে উত্তর পাঠান তাতেও ফজলুল হককে কেন্দ্র করে কিছুটা নিশ্চয়তা এবং আশা ব্যক্ত হয়। কিন্তু অচিরেই তাঁর আশাভঙ্গ ঘটে। পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই মিঃ হার্বার্টের মনেও সন্দেহ দেখা দেয় মিঃ জিন্নার সঙ্গে ফজলুল হকের সম্পর্কটা যেভাবে ঘোরালো হয়ে উঠছে তাতে ফজলুল হককে 'Persuade' করা যাবে কিনা। ২৩শে জুলাই তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং লিনলিথগোকে পুনরায় টেলিগ্রাম করে ফজলুল হকের প্রতি নিজের কিছুটা সন্দেহের কথা জানান।[১৭] ফজলুল হক তো বলেই দিয়েছেন আইন অমান্য আন্দোলনকে প্রতিহত করতে মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভাই যথেষ্ট ; আর মিঃ জিন্নার সঙ্গে তার বর্তমান সম্পর্ককে সামনে রেখে কোনো প্রকারেই তিনি গান্ধীজীর বিরুদ্ধাচারণ করবেন না বা প্রচার চালাবেন না। মিঃ জিন্না ও গান্ধীজীকে নিয়ে ফজলুল হকের অবস্থান এমন একটা স্থানে যা 'না ঘরকা না ঘাটকা'। বস্তুত এ সময়ে ফজলুল হক বুঝতে পারছিলেন যে তিনি উভয় সঙ্কটে রয়েছেন ; মিঃ জিন্না ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই বাংলায় সংগঠন বাড়িয়ে তুলছেন। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়—একজনের বাড়-বাড়ন্ত মানেই অন্যের তো কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ফজলুল হক আরও বুঝলেন গান্ধীজী ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই সময়ে কোনো কিছু বলার অর্থই হবে নির্বুদ্ধিতার পরিচয়, কেননা শেষ আশ্রয় তো বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির মাধ্যমেই আসা সম্ভব। কিন্তু বেশী দিন তিনি ধৈর্য রাখতে পারেননি। ভারতে ব্রিটিশ নেতৃত্বকে তিনি ইতোপূর্বেই ফিরিয়ে দিয়ে তাদের কাছে নিজেকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছেন, আর এখন গোদের উপর বিষফোড়ার মতো সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলার মুসলমানদের ক্ষ্যাপানোর কাজটায় তুঙ্গে রয়েছেন ; তাঁদের কথা ও নির্দেশে লীগপন্থী ছাত্ররাও

একাধিকবার তাঁকে লাঞ্ছিত করেছে। তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ পুনরায় লীগ ও মিঃ জিন্নার মধ্যে খুঁজতে গিয়ে ১৯৪২-এর ১৩ই নভেম্বরে নতুন করে লীগের সদস্যপদ গ্রহণের ইচ্ছে মিঃ জিন্নাকে জানালেন; কিন্তু তিনি জানালেন না বা অভিমত নিলেন না কৃষক-প্রজা পার্টির অন্যান্য নেতৃস্থানীয়দের বা মন্ত্রিসভার সদস্যদের। তুখোড় খেলোয়াড় মিঃ জিন্নার শর্তগুলি ফজলুল হকের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হলো না, কেননা তাহলে তো তাঁর নেতৃত্বের সবটুকু রং-ই ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যেতো। 'সাপের হাঁচি বেদে চেনে'—এটা বুঝি মিঃ জিন্নার জন্যই প্রযোজ্য, তিনি ফজলুল হকের চিঠিগুলো প্রকাশ করে দিয়ে ঘরে-বাইরে সবদিক দিয়েই ফজলুল হককে বড়ো ধরনের একটা আঘাত দিতে সক্ষম হলেন ; মিঃ জিন্না এটার জনাই যেন অপেক্ষা করছিলেন। ফজলুল হককে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো, তিনি নিজের কাজের সাফাই গাইতে চাইলেও হাত-সাফাইয়ের দক্ষতা তাঁর কোথায়!

পরবর্তীতে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা চালাতে গিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হলেন। একদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছেতেই হয়তো বাংলার গভর্ণর থেকে বড়-মাঝারি-ছোটো বিভিন্ন সাইজের ব্রিটিশ কর্মচারীগণ অসহযোগিতা শুরু করেন, অপরপক্ষে খাজা নাজিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দী সুভাষচন্দ্রের প্রতি কুৎসা প্রচারের পাশাপাশি হক মন্ত্রিসভাকে দেশদ্রোহী বলেও আখ্যা দেয়। প্রকৃতপক্ষে খাজা নাজিমুদ্দীন ও সোহরাওয়ার্দীর মুসলিম লীগ (বাংলাতে) ও আমলাতন্ত্রের বিরূপ মনোভাবের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি ফজলুল হক। ১৯৪৩-এর মার্চে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে বেঙ্গল কাউন্সিলে মুসলিম লীগ সাফল্য পেলো।

২৯শে মার্চ (১৯৪৩) হক মন্ত্রিসভার পতন ঘটে, বাংলাতে থেমে যায় হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মিলনের প্রয়াস। বেশ কয়েক মাস ধরেই ফজলুল হক উপলব্ধি করছিলেন, যুদ্ধ বাংলার ঘাড়ে শ্বাস ফেলছে, কিন্তু আগস্ট আন্দোলনে বাংলা উত্তাল, বিধান সভায় বিরোধীরা বিশেষত মুসলিম সদস্যরা সমস্যাটা বুঝতে চাইছে না। অবস্থার গভীরতা অনুভব করে জাতীয় সরকার গড়তে পারলে তিনি পদত্যাগ করতে ইচ্ছুক বা প্রস্তুত। ২৬শে মার্চে তিনি বাংলার গভর্ণরকে একথা জানিয়েও দিলেন। কিন্তু ঘটনাটা ঘটলো অন্যভাবে—অস্বাভাবিক পথ ধরে। ২৮শে মার্চে গভর্ণর ফজলুল হককে বাধ্য করলেন পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করতে।

২৪শে এপ্রিল (১৯৪৩) খাজা নাজিমুদ্দীন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন, বাংলার রাজনীতিতে পট পরিবর্তন হলো। মিঃ জিন্না পরোক্ষভাবেই যেন বাংলার রাজনীতিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো হিন্দুদের কয়েকজনকে নাজিমুদ্দীন সাথী হিসেবে পেয়ে যান। এই দিনটাতেই মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের অধিবেশনে (দিল্লিতে) এক দীর্ঘ ভাষণ দেন, এই ভাষণের মুখ্য ভাগটা জুড়ে ছিলো ফজলুল হক এবং গান্ধীজীর প্রতি অবজ্ঞা ও নিদারুণ কটাক্ষ। আমরা বাংলা ও ভারতের এই দুই ব্যক্তিত্বকে মিঃ জিন্নার সমালোচনায় পুনরায় দেখবো স্বাধীনতার প্রাপ্তিতে ১৯৪৭ সালে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনটা শুরু হয় যখন বাংলায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। ৯ই আগস্টে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তার করা হলে ভারতের মুখ্যত চারটি অঞ্চলে এই

আন্দোলনের গতি তীব্র হয়ে দেখা দেয়। শুধু বাংলা নয়—ভারতের মধ্যে মেদিনীপুর জেলা এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য, বাংলায় ভাবত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষদের উপর সরকারের যে উৎপীড়ন তার সিংহভাগটা ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়সীমায় সংঘটিত হয়েছিল।

১৯৪২-এর ৮ই মার্চে রেঙ্গুন শহর দখল করে বার্মার পতন ঘটায় জাপান। ভারতে ব্রিটিশ শাসককুল এবং খোদ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন—জাপান এখানে থেমে থাকবে না, ভারত অভিমুখে তাদের অভিযান শুরু হলো বলে আর কি! বাংলা প্রদেশের গভর্ণর চাইলেন প্রাথমিকভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে, নির্দেশ গেল সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল তো বটে-ই, অনাত্র নদীবহুল এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নজর দিতে ; জাপানীরা এসে গেলেও যেন বিপর্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থায় তারা সুবিধে করতে না পারে।

৮ই এপ্রিলে মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথিতে সরকারী নির্দেশ গেল, এখানকার নৌকাগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে, প্রয়োজনে নষ্ট করতে হবে ; ক্ষতিপূরণ একটা কিছু হবে—তবে তা পরে। অতঃপর মোটরবাস সরাও, সাইকেল হঠাও। এই তুঘলকী নির্দেশে এ দুটি মহকুমার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। শোনা গেল বাংলায় ব্রিটিশ বীরেরা এও ঠিক করে ফেলেছেন যে, জাপানীরা যদি আক্রমণ করেই এবং বাংলায় এসেই যায় তবে বাংলার ক্ষেত্রে পোড়ামাটির নীতি প্রয়োগ করে তারা বিহারে পালিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করবেন। স্থানীয় অধিবাসীরা কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সহমতের মাধ্যমে কয়েকটি সমিতি গড়ে তোলেন, কেননা নিজেদের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হতে চলছে। কংগ্রেসের রাঘব-বোয়ালরা ব্রিটিশের জালে ধৃত হলো, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ধারণা জন্মালো না যে আন্দোলনটা কেমন করে হবে ; তবে এতে সাধারণের কিছুই যায় আসে না। তারা গ্রেপ্তার না হওয়া কংগ্রেস কর্মীদের সামনে রেখেই নিজেরা সিদ্ধান্ত নিলো। ব্যাপারটা এই, শাসনকর্তারা জাপানীদেব চোখে না দেখেই যদি এলাকাব মানুষদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করার অধিকার দিয়েই পালায় তবে বাঁচার জন্যে প্রতিকারের চেষ্টা তো একটা করতেই হবে, গঠিত হলো সুতাহাটা ও মহিষাদল থানায় অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 'বিদ্যুৎ বাহিনী' নামে, অবশ্য কমিউনিস্ট সমর্থকরা এর মধ্যে প্রাধান্য পেল। কেননা কমিউনিস্টরা তো তখন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং জনজীবনকে মোটামুটি স্বাভাবিক রাখার জন্যে প্রয়াস চালাচ্ছে। বিশেষত জাপানী সেনার থেকেও যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ধেয়ে আসছে তাকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে ; 'জনযুদ্ধে' জনতার মাঝেই আদর্শ প্রতিষ্ঠা হবে শ্রম-নিষ্ঠা-অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি মানবতাবোধ ও সহমর্মিতায়। অকুতোভয় সংশপ্তকেরা সিদ্ধান্ত নিলো এলাকায় খাদ্যের অভাব এ অবস্থায় অধিক ফসল জন্মানোর পাশাপাশি খাদ্য মহকুমার বাইরে যেতে দেয়া হবে না। গত বছরে ধানের উৎপাদন ছিলো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, আর এই অপ্রতুল উৎপাদনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ক্রমশ প্রকাশ পেতে শুরু করে। তমলুক মহকুমার নেতৃস্থানীয় অধিবাসীরা তাদের প্রতিনিধি পাঠালেন

জেলা মেজিস্ট্রেটের কাছে, মহকুমায় উৎপাদিত ধান-চাল এ অবস্থায় বাইরে চালান দেয়া উচিত হবে না, বরং ঘাটতি পূরণের জন্য খাদ্য আমদানি করা আশু কর্তব্য—এ দাবী জানালেন তারা। কিন্তু জেলা কর্তৃপক্ষ জাপানী আক্রমণের ভয়ে এবং প্রতিষেধক হিসেবে ধান চাল জেলার বাইরে চালান দিতে ও রপ্তানিতে বিভিন্ন মিল-মালিকদের উৎসাহ দিলেন। সরকার স্বীকার করে নিলো যুদ্ধের বাজারে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজস্ব চাহিদা মোতাবেক পাঁচ ছয় মাসের খাদ্য মজুত করতে পারবে, ফলশ্রুতি বড় বড় কারখানাগুলি এবং রেল, পোর্ট ট্রাস্টের মতো সংস্থাগুলো খাদ্য মজুত করার প্রতিযোগিতায় নেমে যায়। ৮ই সেপ্টেম্বরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিল-মালিক আর তাদের সাহায্যকারী পুলিশের সঙ্গে গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটে। পুলিশ গুলি চালালে ৩ জন নিহত হলো। রক্তের বিনিময়ে সাধারণ মানুষ প্রতিহত করতে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী হিসেবের খেলাকে এবং অবশ্যম্ভাবী নিষ্ঠুর দুর্ভিক্ষকে চায় উপেক্ষা করতে দৃঢ়সংকল্পে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের এমনি একটা উর্বর জমির উপর দাঁড়িয়ে মেদিনীপুর ভারতব্যাপী পরিচয়ের সুযোগ পায় ; গান্ধীজী সহ অন্যান্য নেতৃত্বের মুক্তির দাবীর পাশাপাশি স্বাধীনতার প্রত্যয় নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন। বিক্ষোভ, শোভাযাত্রা, সরকারী অফিসে অগ্নিসংযোগ হয়ে ওঠে নিত্য দিনের কর্মসূচী। এ সম্পর্কে ১৯৪৬-এ তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী একটা ছবি দেয়ার চেষ্টা করেন এভাবে যে, বাংলার মেদিনীপুরে জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠিত হলে স্থানীয় অধিবাসীদের উপর তার একটা জোর প্রভাব দেখা দেয়, সাধারণ মানুষের বিশ্বাস দৃঢ়মূল হলো গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারত স্বাধীনতার পথেই এগোচ্ছে আর তার সূচনা এভাবেই হলো। কিন্তু সরকার বসে নেই, অত্যাচারের মাত্রাটা খেয়াল-খুশিমতো বেড়ে গেল। তমলুক মহকুমার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সতীশচন্দ্র সামন্ত, মেদিনীপুরেরই এডভোকেট শ্যামাদাস ভট্টাচার্য, তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অনঙ্গমোহন দাস, তমলুক থানার কংগ্রেস সভাপতি প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সরকাবের অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে যে রিপোর্ট তৈরী করেন তা রীতিমতো ভয়াবহ। তাঁদের রিপোর্টে এটা প্রতিভাসিত হলো আন্দোলন স্তব্ধ করতে সরকারের দমন-পীড়নের যা কিছু প্রক্রিয়া ছিলো তা প্রয়োগ হয়, উপরন্তু সরকারী গুণ্ডাবাহিনীর বর্বর আচরণের দুটি মহকুমার নারীদের অনেককেই চরম মূল্য দিতে হলো—অবশ্য এর মাধ্যমেই আন্দোলনের গুরুত্ব ও ওজস্বিতাকে ভেঙ্গে দিতে প্রশাসনের মদত ছিলো। তাদের এই অমানবিক নারী লাঞ্ছনার হাত থেকে বৃদ্ধা ও গর্ভবতীরাও রেহাই পায়নি,[১৮] বহু ক্ষেত্রে বিধবারা একাধিক ব্যক্তি দ্বারা বলাৎকারের শিকার হয়েছেন।

শতাব্দী অতিক্রম করা পরাধীনতার ছোঁয়া ভারতীয় জনগণ যখন পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলো সেই সময় ঔপনিবেশিক শক্তি নিশ্চুপ থাকবে না এটা তো সহজ সত্য, কিন্তু আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসকেও তারা ক্ষুদ্র ও বিকৃত করে গুরুত্ব হ্রাসের প্রচেষ্টা চালায়। ভারতের সর্বত্র যেমন এই আন্দোলনে জীবনহানির, সম্পত্তি ধ্বংস, পাশবিক অত্যাচারের মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, মেদিনীপুরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম

ঘটেনি। বরং ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো হক মন্ত্রিসভার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, কেননা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাবনা এবং জনগণ দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণ প্রাক্কালে ফজলুল হক আন্দোলনকে সমর্থন জানাননি, পরে অবশ্য শ্যামাপ্রসাদ নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহির মতো করেই বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু ততোদিনে অত্যাচারের বীভৎসতায় এবং বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যের অসহযোগিতায় জনজীবনে ত্রাস ও মৃত্যুর ছায়া গাঢ় প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়েছে। বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলনরত মেদিনীপুর জেলার সর্বাপেক্ষা উত্তাল মহকুমা তমলুককে আলোচনায় স্থান দিলেই স্বল্প পরিসরে আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং প্রতিরোধ সংগ্রামের উপর সরকার ও তার গুণ্ডাবাহিনীর তাণ্ডবের চিত্রটা দেখতে পাবো।

তমলুক মহকুমার অধীনে ছয়টি থানা—সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, তমলুক, ময়না ও পাঁশকুড়া ; মিউনিসিপ্যালিটি শহর একমাত্র তমলুক। এই মহকুমায় ১২৪৬টি গ্রামকে নিয়ে ৭৬টি ইউনিয়ন এবং এখানে পরিবার সংখ্যা ১৪২২০০টি, লোকসংখ্যা ৭৫৩১৫২ জন।[১৯] যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থায় মেদিনীপুর জেলাকংগ্রেস কমিটির অধীনে তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটি এবং মহকুমা কমিটির অধস্তন হিসেবে ছয়টি থানা কংগ্রেস কমিটি সক্রিয় ছিলো এবং ছয়টি থানা কমিটি ৫২টি প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির সাহায্যে কংগ্রেসের কর্মসূচী ও কার্যাবলী রূপায়ণের চেষ্টা করতো। আমরা দেখি এই কমিটিগুলো স্থানীয় জনসাধারণকে নিয়ে আন্দোলন, সংগ্রাম ও প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় দৃঢ়সংকল্প।

তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিয়ে আমরা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তমলুক মহকুমাকে উদাহরণ উপস্থিত করতে পারি—(১) গুলিতে হত, (২) নারীধর্ষণ এবং (৩) গৃহদাহ।

(১) গুলিতে হত

থানা বা স্থানের নাম	তারিখ	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা	বয়স (২০ বৎসরের নিম্নে এমন সংখ্যা)
(ক) মহিষাদল থানার				
দানীপুর	৪.৯.৪২	সঠিক বিবরণ নেই	৩ জন	১ জন
মহিষাদল থানায়	২৯.৯.৪২	৪৩ জন	১৩ জন	২ জন
মহিষাদল থানা (শ্রীকৃষ্ণপুর)	—	১জন	—	—
(খ) নন্দীগ্রাম থানার				
ঈশ্বরপুর	২৭.৯.৪২	১ জন	৪ জন	—
নন্দীগ্রাম থানার বৃন্দাপুর	—	৩ জন	২ জন	১ জন
নন্দীগ্রাম থানা	৩০.৯.৪২	১৬ জন	৫ জন	—

নন্দীগ্রাম (ঘোলপুকুর)	৮.১০.৪২	৩ জন	১ জন	—
(গ) তমলুক শহরের				
শঙ্কর আড়াপুল	২৯.৯.৪২	২২ জন	১৬ জন	১ জন
(ঘ) সুতাহাটা থানা				
(বাসুদেবপুর)	১.১০.৪২	১৬ জন	১ জন	১ জন
সুতাহাটা থানা	১৬.১০.৪২	৪ জন	২ জন	১ জন

তমলুক হাসপাতাল সূত্রে প্রাপ্ত মৃতের সংখ্যা ৪১ জন, আহতের সংখ্যা ৯৯ জন। উল্লেখ্য, শ্রীমতী মাতঙ্গিনী হাজরা ৭৩ বৎসর বয়সে শহীদ হলেন ২৯.৯.৪২ তারিখে তমলুক শহরের শঙ্কর আড়াপুল-এ।

(২) নারী ধর্ষণ

স্থান	লাঞ্ছিতা মহিলার সংখ্যা (নামপ্রকাশ পেয়েছে এমন)	২০ বৎসর বয়সের নিচে	বিধবা	গর্ভবতী	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকের সংখ্যা
(ক) সুতাহাটা থানা	১ জন	১জন	—	—	৫ জন
(খ) তমলুক থানা	২ জন	১ জন	—	—	১ জন
(গ) নন্দীগ্রাম	৬ জন	—	—	১ জন	১৫-১৮ জন
এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি					
চণ্ডীপুর	৪ জন	—	—	—	—
মাশুরিয়া	৩৪ জন	১২ জন	৩ জন	১ জন	—
ডিহি মাশুরিয়া	১১ জন	৩ জন	—	—	—

এতদ্ব্যতীত ২০-২২ জনের নাম পাওয়া গেলেও এখানে উল্লেখ করা হলো না। সবচেয়ে কমবয়সী এই তালিকায় রয়েছেন চারুবালা দাস, বয়স মাত্র ১৪ বৎসর এবং সবচেয়ে বেশী বয়সের হলেন চারুবালা করণ, বয়স ৫০ বৎসর। সবচেয়ে বেশী জনের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন গুণীবালা বর, বয়স ৩১ বৎসর, ৪ জনের দ্বারা তিনি ধর্ষিতা হয়েছেন।

(৩) গৃহদাহ

স্থান	ক্ষতি করার তারিখ	ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা	ক্ষয়-ক্ষতির আনুমানিক আর্থিক মূল্য
(ক) সুতাহাটা থানা	৩.১০.৪২	৭টি	২৮ থেকে ৩০ হাজার টাকা

,,	৬.১০.৪২	৩টি	৪ হাজার টাকা
	৭.১০.৪২	২টি	৪ শত টাকা
,, ,,	৮.১০.৪২	৮টি	২৪ হাজার টাকা
,, ,,	৯.১০.৪২	২১টি	২৫ হাজার টাকা
,, ,,	১৫.১০.৪২	৩টি	১৮ শত টাকা
,, ,,	১৬.১০.৪২	৬টি	১২ হাজার টাকা
,, ,,	২৩.১০.৪২	৫টি	৪ হাজার টাকা
,, ,,	২৪.১০.৪২	৩টি	৪ হাজার টাকা
,, ,,	২৯.১০.৪২	৪টি	৫ হাজার ৫ শত টাকা
,, ,,	৩০.১০.৪২	১৮টি	১৩ হাজার ৫ শত টাকা
(২) মহিষাদল থানা	৫.১০.৪২	১টি (থানা কংগ্রেস অফিস)	১ হাজার টাকা
	১৫.১০.৪২	১টি	৮৫০ টাকা
(গ) নন্দীগ্রাম থানা	২৯.৯.৪২	৩টি	৮০০ টাকা
,, ,,	৮.১০.৪২	২টি	৭০০ শত টাকা
,, ,,	১১.১০.৪২	১টি	২৫০ টাকা
,, ,,	১২.১০.৪২	১টি	৩০০ শত টাকা
,, ,,	১৭.১০.৪২	১টি	৪,৬০০ শত টাকা
,, ,,	৩০.১০.৪২	৪টি	৩,৩০০ শত টাকা
,, ,,	২.১১.৪২	২টি	১০০০ টাকা

৯৮টি গৃহের অগ্নিদাহের কথা এখানে উল্লেখ করা হলেও তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী তাঁব গ্রন্থে ১১৬টির সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।[২০]

এতদ্ব্যতীত ১০৪৪টি গৃহ লুণ্ঠিত হলে গৃহস্বামীরা নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে পড়েন। সরকারী কর্মচারীরা যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে ২৩টি বাড়ি দখল করে নেয় এবং ৩৭৩০টি বাড়ি খানা-তল্লাসির নামে সোনা রূপার মতো মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে : পুলিশ এই পর্বে সাক্ষীগোপালের ভূমিকা নেয়। সম্ভবত শুধু বাংলাতেই নয় ভারতের মধ্যেও আর্থিক ক্ষতিতে তমলুক মহকুমা শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলো। কিন্তু এও বাহ্য, অধিকতর ধ্বংসের মধ্যে তাদের বসবাস অরাজকতাপূর্ণ এক রাজত্বের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সরকারের নেতিবাচক এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ নীতি গ্রহণের ফলে ঝড়-বিধ্বস্ত মহকুমায় মানবিক মূল্যবোধ একেবারেই তলানিতে গিয়ে পৌঁছায়। অবশ্য সতীশচন্দ্র সামন্ত, বরদাকান্ত কুইতি, সুশীলচন্দ্র ধাড়া প্রমুখ তমলুক জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়কগণ যে অসীম সাহস, ধৈর্য এবং বীরত্বের পরিচয় রেখেছেন তা আগস্ট আন্দোলন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জ্বল অধ্যায় বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যদিও বাংলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বীরত্বের পরিচয় রেখেছিলো মেদিনীপুর জেলা ; তবে কলকাতা সহ প্রদেশের অন্যান্য বড় বড় শহরগুলোতেও এই আন্দোলনে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসে। ১৩ থেকে ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত

কলকাতায় সাঁজোয়া গাড়িতে মেসিনগান বসিয়ে সৈন্যরা জনতার সঙ্গে যেন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে বাংলা সরকার ১০ই আগস্ট কংগ্রেস কমিটিকে বেআইনি ঘোষণা করে, ছাত্র-যুবারা সরকারী ঘোষণাকে উপেক্ষা করেই কংগ্রেসের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়। ১৪ই আগস্ট কলকাতা উত্তাল হলো গণ-আন্দোলনের জোয়ারে, প্রশাসন রুদ্র মূর্তি ধারণ করতে কার্পণ্য করেনি। চৌরঙ্গী ও সাহেবপাড়া ব্যতীত কলকাতার সমস্ত অঞ্চলেই আন্দোলনের তীব্রতা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এদিনে বিভিন্ন স্থানে পুলিস ও সেনাবাহিনীর জোয়ানদের গুলিতে ৬ জন প্রাণ হারান এবং আহত হন ৩৩ জন ; তবে হিসেব সঠিক হলে সংখ্যাটা হয়তো আরো বেড়ে যেতো। ১৫ই আগস্ট শনিবার কলকাতা একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যাপক মানুষের ক্ষোভ ও রোষ গিয়ে পড়ে পুলিশ ও টহলরত সৈন্যবাহিনীর জওয়ানদের ঘাড়ে, ১৬ই আগস্টে লাগাতার আন্দোলনে কলকাতা মুখরিত-উত্তাল। প্রশাসন পুলিস ও জওয়ানদের সাহায্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়, কিন্তু আন্দোলনের রূপটা—কলেবর আরো বিস্তৃত হতে থাকে। সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই দৈনিক সংবাদপত্র 'ভারত' ১৩, ১৪ ও ১৫ই আগস্টের হতাহতের হিসেব দেয় হাসপাতাল সূত্রে উদ্ধৃতি দিয়ে, কলকাতা মেডিকেল কলেজে ৯২ জন ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু নিহতের সংখ্যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ক্যাম্বেল হাসপাতালে ১৩ তারিখে ৩২ জন, ১৪ তারিখে ১৩ জন আহত ভর্তি হয়, কিন্তু তাদের ১৩ তারিখেই ১৫ জন এবং ১৪ তারিখে ৩ জনের মৃত্যু ঘটে। কলকাতা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হলো ২২ জন আর তাদের মধ্যে মারা গেলেন ২০ জন ; কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন ২৮ জন, সেখানে মারা যান ৭ জন। সরাসরি পুলিস ও জওয়ানদের গুলিতে যারা মারা যান তাদের সঠিক সংখ্যা—এমন কি কাছাকাছির সংখ্যা পাওয়াও দুরূহ ব্যাপার। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন, কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলির মালিকদের এক সভায় শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত হলো খবরের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের এবং সঠিক সংবাদ পরিবেশনে বাধা দেয়ার জন্য ১৮ই আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সংবাদপত্রগুলি বন্ধ রাখা হবে। পরোক্ষে এতে সরকারেরই সাহায্য হলো, সঠিক-বেঠিক সব সংবাদ বন্ধ থাকলো যে! কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলো, দেশের এই সঙ্কটকালে সরকারী আদেশকে উপেক্ষা করেই 'ভারত' পত্রিকা খবর প্রকাশ করে ; পুলিস অত্যাচারের নির্মম সত্যটার কিয়দংশ হলেও এভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। কিন্তু এর জন্য 'ভারত'-কে ফলভোগ করতে হলো। পুলিস খানাতল্লাসি শেষে 'ভারত' অফিস শীলমোহর করে দেয় ; তাই উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'ভারত'-এর এই ত্যাগ, নিষ্ঠা ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা দেশসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কলকাতায় আন্দোলনটা কয়েক দিন খুবই হলো, কিন্তু অল্প দিনেই তার তীব্রতা লোপ পেতেও থাকে। বাংলার অন্যান্য জেলা প্রধান শহরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সাধারণ মানুষ জঙ্গী হয়ে ওঠে, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নদীয়া, হাওড়া, বর্ধমান, হুগলী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে, মানুষ এ সময় কেমন আছেন? একটা ছবি তুলে ধরেছেন অমলেন্দু সেনগুপ্ত :

ফ্যাসিজমের অমানবিক রূপ সাধারণ মানুষের অদেখা ও অজানা। তবুও সুদূরের যুদ্ধ এগিয়ে এসে গ্রাস করল তার দিন-রাত্রি। তার নিষ্প্রদীপ বিনিদ্র রাত সাইরেনের তীব্র আর্তনাদে খানখান হয়ে যায়। অসহায় চোখ মেলে সে দেখে বিদেশী সৈন্যদের দাপাদাপি আর রাজপথে ক্ষুধিত কঙ্কালের মিছিল। রুদ্ধ দুয়ারের ওপার থেকে শোনা যায় ক্ষুধাতুর শিশুর কান্না। যুদ্ধ হানা দিয়েছে আকাল আর মারী-মড়কের চেহারা নিয়ে।.......
১৯৪৩ ও ১৯৪৪—বছর দুটি যেন মানুষের জীবনে দুঃসহ অভিজ্ঞতার ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছে। আকাল মহামারী অবক্ষয় মৃত্যু—এই বুঝি তার বিধিলিপি। সর্বাত্মক ধ্বংসের কিনারায় এসে পৌঁছেছে গোটা দেশ ও সমাজ—তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। চেতনার স্পন্দনটুকুও কোথাও আর অবশিষ্ট নেই।[২১]

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা দেখি এই আকাল-মহামারী-আর্তনাদের বিরুদ্ধে বাঁচার সংগ্রামে মুসলিম লীগ, কংগ্রেসকে আহ্বান জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না, তাদের ভূমিকা তো সাধারণ মানুষদের নিয়ে, এই সাধারণ মানুষদের পাশে নিজেকেও সাধারণ করে দুঃখ ভাগ করে নেয়। আহ্বান জানায় সর্বস্তরের মানুষের কাছে :

সারা ভারতের জনগণের কাছে বাংলার সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের ছবি তুলে ধরার ডাক দেয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। যেমন বাংলার অভ্যন্তরে রিলিফের কাজ চলছে সর্বত্র, তেমনি বাংলার শিল্পীরা গায়ক-নাট্যকাররা বেরিয়ে পড়েছেন দল বেঁধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুধিত বাংলার সঙ্কট সমাধানে সকলকে এগিয়ে আসার আবেদন নিয়ে। উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ সর্বত্র সারা ভারত জুড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার পাশে দাঁড়াবার জন্য মানুষের কাছে নাচ, গান, নাটক, বক্তৃতার মাধ্যমে আওয়াজ পৌঁছে গেছে দ্রুতগতিতে। "বাংলাকে বাঁচাও, "সেভ বেঙ্গল" ধ্বনিতে সারা ভারতের মানুষ আলোড়িত হয়ে উঠেছেন।[২২]

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখতে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের শাসনের নামে বর্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অবশ্য অল্প দিনের মধ্যেই এই আন্দোলনের বহ্নিশিখা নিবু নিবু হয়ে পড়ে—বাংলা বিশেষ করে মেদিনীপুর তা কোনক্রমে গান্ধীজীর জেল থেকে মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলো। বাংলা তো এই আন্দোলন চলাকালে যুদ্ধ করেছে আরো দুটি বৃহৎ শত্রুর সঙ্গে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঝড়, বন্যা) ও দুর্ভিক্ষ। বড়লাট কল্পনাও করতে পারেননি, কংগ্রেস নেতৃত্বকে গ্রেপ্তারের পরেও রাইফেল-বেওনেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতীয়রা এহেন আন্দোলনে দুর্দম ভূমিকা পালন করবে। তিনি দৃঢ়ভাবেই জানতেন যে ঔপনিবেশিক শাসনকে যুদ্ধ চলাকালীন টিকিয়ে রাখতে ভাবতে যেভাবে এই আন্দোলনকে থামানোর চেষ্টা হলো তা কোনো অবস্থাতেই সভ্য পৃথিবী-গণতান্ত্রিক পৃথিবী মেনে নেবে না, তাই তিনি ভারত সরকারকে সেভাবেই প্রচার চালাতে বাধ্য করলেন ; ব্রিটেনের স্বার্থের জন্য এই বর্বরতাকে তিনি গোপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে এতো বড় আন্দোলন-সংগ্রাম ১৮৫৭ সালের পরে আর ঘটেনি। এই সব সত্য হলেও একটা রূঢ় বাস্তবকে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে, আন্দোলনের ব্যাপকতা অনুসারে সাফল্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মতোই সামান্য। নেতৃত্বে নতুন মুখ মাত্র দু'একজনের অথচ ভারতীয়দের রক্ত আর অশ্রু ঝরেছে পরিমাপহীন ; আর যা হলো অস্থিরমতি গান্ধীজীর একান্ত ইচ্ছেটা পূর্ণ—একটা আন্দোলন! একটা আন্দোলন !!

সুভাষচন্দ্র ও ভারত

৯ই আগস্ট (১৯৪২) 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সূচনায় গান্ধীজী অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৪-এর ৬ই মে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আগেই তিনি মুক্তি লাভ করেন। দীর্ঘ অনশনের দরুন তাঁর স্বাস্থ্যের এতোটাই অবনতি ঘটেছিলো যে সিভিল সার্জেন তাঁকে পরীক্ষা করে কর্তৃপক্ষকে এই মতামত দিয়েছিলেন যে—গান্ধীজীর জীবনীশক্তি হ্রাস পেয়েছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ খামখা গান্ধীজীর মৃত্যুর কারণ হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেনি বলেই তিনি বিনাশর্তে মুক্তি পেলেন। গান্ধীজী এবারেও ভুল বুঝলেন এইভাবে যে, হয়তো ব্রিটিশের নীতির পরিবর্তন ঘটেছে, তবে তাঁর এ ধারণাটা কতোটা ভুলে ভরা ছিলো তা অল্প দিনেই বুঝতে পারলেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরও ধারণা ছিলো, একা গান্ধীজী জেলের বাইরে থেকে আর কতদূর এগোবেন, কেননা বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের পাশাপাশি বর্তমান ভারতের গণ-আন্দোলন ব্রিটিশ প্রশাসনকে ততোধিক বিব্রত ও বিচলিত করতে সক্ষম হবে না।

সত্যিই তো গান্ধীজীর কারাগৃহে থাকা সময়টাতেই বিশ্বরাজনীতি ও যুদ্ধের পট একেবারেই বদলে গেছে। সুভাষচন্দ্র জার্মান পৌঁছে ২৯শে মে (১৯৪২) হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ; এই সাক্ষাতেব মাধ্যমেই তিনি ভারত স্বাধীন করার লক্ষ্যে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস পান। জার্মানীতেই সুভাষচন্দ্র গড়লেন Free India Centre বা আজাদ হিন্দ সংঘ, কিন্তু লক্ষ্য তাঁর বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের নিয়ে মুক্তিফৌজ গড়ে তোলা আর বেতার মারফত ভারতের জনগণের কাছে স্বাধীনতার আশ্বাসবাণী পৌঁছে দেয়া ; ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে দেশাত্মবোধ ও আত্মবলিদানের মন্ত্রে দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করা। দুটো কাজ হাতে নিয়ে প্রচারেই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে সার্থকতা লাভে সক্ষম হলেন। যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিক ও অন্যান্যদের নিয়ে তিনি মুক্তি-যুদ্ধের সেনানী গঠনে তৎপর হলেন। মূল উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে তিনি ৮ই ফেব্রুয়ারি (১৯৪৩) জার্মানী ছেড়ে টোকিওর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং দীর্ঘদিন সাবমেরিনে থেকে ১৩ই জুনে জাপান পৌঁছান। টোকিও বেতারে তাঁর ঘোষণা ভেসে এলো, শীঘ্রই তিনি সসৈন্যে হাজির হবেন ভারতের পূর্ব সীমান্তে , ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামে ভারতবাসীর অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। ৪ঠা জুলাই (১৯৪৩) বিপ্লবী রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার আনুষ্ঠানিকভাবে সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেন এবং প্রত্যক্ষভাবে তিনি এর দায়িত্বভার নিয়ে সেপ্টেম্বরে অধিনায়কত্ব অর্পণ করেন বীর যোদ্ধা শাহনওয়াজ খানের ওপর। ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে ক্যাথে সিনেমা বিল্ডিং-এ সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রতিনিধিদের জমায়েতে ও সরকার গঠন লগ্নে ভাষণ দেন ; ভাষণের শেষ অংশে তিনি আবেগ ও অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে বলেন :

> 'ঈশ্বরের নামে, আমাদের যে পূর্বপুরুষরা ভারতের জনসাধারণকে এক জাতিতে পরিণত করেছেন তাঁদের নামে, যে মৃত বীররা আমাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ঐতিহ্য দিয়ে গিয়েছেন তাঁদের নামে আমরা ভারতীয়দের আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের পতাকা তলে সমবেত হবার জন্য।

> ব্রিটিশ ও ভারতে তাদের সবরকম সহযোগীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করার আহ্বান জানাচ্ছি। চরম বিজয়ে আমাদের পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। শত্রু যতক্ষণ না ভারতভূমি থেকে বিতাড়িত হয়, যতক্ষণ ভারতীয় জনগণ স্বাধীন জাতিতে পরিণত না হয় ততদিন আমাদের লড়াই চালাতে হবে।[১]

সুভাষচন্দ্র জাতীয় সরকার গঠন করলে ৯টি রাষ্ট্র তাকে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৪-এর প্রথম দিকটায় সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুনে আসেন এবং ১৯শে মার্চে (১৯৪৪) আজাদ হিন্দ ফৌজ বার্মার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মাটি স্পর্শ করে আর সামরিক অভিবাদনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। অমিত সাহস আর শক্তির প্রেরণা নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ রণনীতির কৌশল হিসেবে ইম্ফল দখল করতে সচেষ্ট হয়েও নানা কারণে ব্যর্থ হয়। অবশ্য এ সময়টাতে জাপানের উপর ক্রমশ মিত্রশক্তির চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই আজাদ হিন্দ ফৌজ পিছু হঠতে বাধ্য হলো। ৪ঠা মে (১৯৪৫) ব্রিটিশ বাহিনী পুনরায় রেঙ্গুন দখল করে এবং ১৩ তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজের ১৪ জন শীর্ষস্থানীয়কে (শাহ্‌নওয়াজ ধীলন সহ) আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। প্রকৃতপক্ষে, সুভাষচন্দ্রেব ভারতকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা এখানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে।

গান্ধীজী মুক্তি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং রাজনীতিতে নোতুন করে একটা অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস পান। মুসলিম লীগের সঙ্গে তিনি একটা বোঝাপড়ায় যেতে চাইলেন, অন্যদিকে ব্রিটিশ শাসকবর্গকে জানালেন, যুদ্ধে ভারতীয়রা ব্রিটিশদের সাহায্য করতেই চায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা স্বাধীনতার গ্যারান্টিও পেতে চায়। কিন্তু কি দুর্দৈব, যুদ্ধে যে এখন মিত্রশক্তির জয়ের ষোল আনা লক্ষণ ফুটে বেরিয়েছে ; জয়টা শুধু সময়ের অপেক্ষায়—এখন কি ব্রিটিশ শাসনকর্তারা গান্ধীজীর বক্তব্যকে প্রাধান্য দেবেন! গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে গিয়ে পরোক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাবকে মেনে নিলেন, মৌলানা আজাদ এটাকেও গান্ধীজীর একটা বড় ধরনের ভুল বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য জেলে গান্ধীজীর অনশনের সময়ও রাজাগোপালাচারী এ ধরনের প্রস্তাব নিয়ে মিঃ জিন্নার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এবারে গান্ধীজীর চিঠিটা তাঁর একগুঁয়েমি ভাবটাকে দৃঢ় করতে সাহায্য করে; গান্ধীজী মিঃ জিন্নার উদ্দেশ্যে লিখলেন : I have always been a servant and friend to you. Do not disappoint me.[২] মিঃ জিন্না গান্ধীজীর বর্তমান অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইলেন, কেননা দীর্ঘদিন তিনি কংগ্রেসের বাইরে—নিজেকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ইতোপূর্বে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস থেকে স্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়েছেন, এবারে নিজে না চাইতেই সে সুযোগটা হাতের কাছে এসে ধরা দিয়েছে। যদিও ভারতীয় মুসলমানদের একটা বৃহত্তর অংশই মিঃ জিন্নাকে এবং মুসলিম লীগের আদর্শকে বরণ ও গ্রহণ করতে পারেনি। এবারে গান্ধীজী তাদের সামনে মিঃ জিন্নাকে বড় করে তুলে ধরেন ; অতীতেও একাধিকবার গান্ধীজী অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে অনেকটা হঠকারীভাবেই মিঃ জিন্নার প্রতি নরম-গরম হয়েছেন। মিঃ জিন্নার প্রতি বিরূপ মুসলমানরাও এবারে উপলব্ধি করলেন—গান্ধীজী যাঁর পিছু ছুটছেন তাঁকে ধরেই তাহলে লীগের আদর্শ অনুসারে মুসলিম স্বার্থটা রক্ষা করা সময়োচিত হবে।[৩] মিঃ জিন্নার

প্রতি গান্ধীজীর এই সময়ের আচরণ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও ভারত বিভাগকে যে স্বীকার করে নেয়া সেকথা ধুরন্ধর মিঃ জিন্নার বুঝতে বিলক্ষণ বিলম্ব ঘটেনি ; পাশাপাশি এটাও স্বীকার করতে হয় লীগ-কংগ্রেসের পারস্পরিক সম্পর্কের কিছুটা উন্নতিও দেখা দেয়। বড়লাট ওয়াভেল এই অবস্থানটা দেখেই কিছুটা উৎসাহ বোধ করেন এবং তাঁর চিন্তাটাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হতে সচেষ্ট হন ; অর্থাৎ অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী একটা ভারত সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ওয়াভেল ২৩শে মার্চ (১৯৪৫) লণ্ডন যাত্রা করেন এবং ৪ঠা জুনে ভারতে ফিরে আসেন, ১৪ই জুনে বেতার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানালেন—আর বিলম্ব নয়, শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সংবিধান রচনার কাজ শুরু হবে ; ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে ২৫শে জুন সিমলায় একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এটাকে সুষ্ঠুভাবে সমাপ্তির লক্ষ্যে ১৫ তারিখে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হলো। একটা প্রশ্ন থেকে যায়, মিঃ জিন্না এবং গান্ধীজীর পারস্পরিক বোঝাপড়াকে সামনে রেখেই কি লর্ড ওয়াভেল লণ্ডন যান বা ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরেই ক্ষমতা হস্তান্তর বা সংবিধান তৈরীর কথা বলেছেন? ২৪শে জুনে আমরা দেখি—

> ২৪ জুন ওয়াভেলের সঙ্গে আজাদ, গান্ধী ও জিন্নার সাক্ষাৎকার হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধী বলেন—(১) সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল, (২) কংগ্রেসে কোন জাতপাতের স্থান নেই—তাই 'অ-তপসিলী হিন্দু' কথা ব্যবহার করলে ভাল হত (!), (৩) প্রদেশে যদি কোয়ালিশন গঠিত হয় তবে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সদস্যারা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করবে, (৪) কংগ্রেসের অনেকে আপত্তি তুললেও তিনি সমতা মানতে রাজি আছেন, তবে কংগ্রেস মুসলমান বা তপসিলীদের মনোনয়ন দিতে পারে। ওয়াভেল জানান—অ-তপসিলী হিন্দু ও মুসলমানদের সমতা বজায় রাখতেই হবে। জিন্না বলেন, যাই ঘটুক মুসলমানরা সংখ্যালঘু থাকবেই। ওযাভেল তখন বলেন, সব সংখ্যালঘু সব সময়ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে কেন? তা ছাড়া বড়লাটের ভিটো তো আছেই। জিন্নার আবদার--সব মুসলিম কাউন্সিলর মনোনয়ন করবে লীগ। ওয়াভেল তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। জিন্না গত দু'বছরের উপনির্বাচনের নজির দেখিয়ে বললেন লীগ সব কটাই জিতেছে—অর্থাৎ তারাই সব মুসলিমদের মুখপাত্র। ওয়াভেল বললেন, তিনি পঞ্জাব যুনিয়ানিস্ট দল মনোনীত একজন মুসলিমকে নিতে চান। উত্তরে জিন্না যুনিয়ানিস্টদের নানা গালমন্দ করেন— তারা নাকি তাঁরই কৃপায় এত দিন কোয়ালিশন চালাচ্ছে। বড়লাটের মনে হয় জিন্না ঠিক নিজের অবস্থায় খুশি নন! (পেণ্ডেরেল মুন (সং)। ভাইসরয়জ জার্ণাল, পৃঃ উঃ, পৃঃ ১৪৫-১৪৭) আপন দলের ওপর সত্যি তাঁর অসপত্ন কর্তৃত্ব ছিল না।[৪]

১৯৪৫-এর শুরু থেকেই মিত্রশক্তির বিজয়কে অক্ষশক্তি ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, ব্যতিক্রম জাপান। তখনো জাপানের মূল ভূখণ্ডের কোনো ক্ষতি হয়নি এবং যুদ্ধের যা গতি-প্রকৃতি তাতে নিশ্চিত বিশেষ কোনো অঘটন না ঘটলে জাপানকে পরাজিত করতে মিত্রশক্তির ঢের সময় লাগতে পারে। অথচ আমেরিকার স্বার্থ জাপানকে নিয়ে জড়িত, কিন্তু তাহলেও আমেরিকা এই মুহূর্তে জাপান রণাঙ্গনে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে পারছে না। একমাত্র ব্রিটেনের পক্ষে সম্ভব, ভারতীয়দের স্বাধীনতা দিয়ে তাদের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে জাপ শক্তিকে পর্যুদস্ত করা ; অতএব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বার বার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের

সাহায্য-প্রত্যাশী বলে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলো। মূলত এধরনের একটা চাপ ব্রিটেনের উপর মিত্রশক্তির থাকলে আগস্ট আন্দোলনের ভয়ঙ্কর রূপ—সাধারণ মানুষের ঐকান্তিকতা এবং সর্বোপরি ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশে গণজাগরণ—বিশেষত বাংলার অবস্থান ব্রিটিশ শাসকদের ভাবিয়ে তুলছিলো ; আই. এন. এ.-র প্রতি ভারতীয়দের নমনীয় মনোভাব এবং সমর্থনের ভাষা বড়লাট ওয়াভেল পড়তে পেরেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মপ্রচেষ্টা ভারতীয় সেনাদের মধ্যে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যোগাতে বা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগঠিত করতে ইন্ধন দিতে পারে; অতএব একটা কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ ছিলো আশুকর্তব্য। উপেক্ষা করা তো যাবে না—খোদ ব্রিটেনেই যে সাধারণ নির্বাচন হতে চলছে ৫ই জুলাই, ভারতের যত্তোসব অশান্তির মিটমাট একটা কিছু হলেই তো বাঁচা ; রক্ষণশীলদের বাঁচাবাঁচির প্রশ্নটা সমানে খাঁড়ার মতোই ঝুলছে!

হাউস অব কমন্সে ভারত সচিব এল. এস. অ্যামেরী বেশ তেড়েফুঁড়ে একখানা বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কোনো প্রকারের বিলম্ব না ঘটিয়ে ভারতকে *স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেবে, কেননা ভারতীয়রা এই দাবী তো পূর্বেই করেছিলো* যে স্বাধীন জাতি হিসেবে ভারতীয়রা অধিকার পেলে অবশ্যই তারা যুদ্ধে অংশ নেবে (১৯৪০-এ) এবং ব্রিটেন ও ভারতের স্বার্থে প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবেই সৈন্যদলে লোক ভর্তি করবে। মিঃ অ্যামেরী এও জানালেন যে, কংগ্রেস ও লীগের প্রতিনিধিরাই সরকার গঠন করবে। বড়লাট ওয়াভেলও ভারতবাসীদের জানিয়ে দিলেন তাঁর কর্মপরিষদটাকেও ভেঙ্গে পুনর্গঠন করা হবে, প্রদেশগুলির জন্য থাকবে দায়িত্বশীল প্রাদেশিক সরকার গঠনের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ; তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবেই বললেন, বড়লাট এবং দু'একজন ব্যতীত অন্যান্যরা থাকবেন অবশ্যই ভারতীয়।

সিমলায় রাজনৈতিক সম্মেলন হবে, নামভূমিকায় রয়েছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ; কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না, ব্রিটিশ শাসকবর্গ এই কংগ্রেস সদস্যদের সম্পর্কেই ইশতেহার মারফত জনগণকে জানিয়েছিলেন—এরা ফ্যাসিবাদের সমর্থক—এরা যুদ্ধের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ঘটিয়ে মিত্রশক্তির প্রধান শরিক ব্রিটেনকে হীনবল করে ভারতের শাসনব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করতে উদ্যত হয়েছে। অথচ হঠাৎ করেই যেন ওয়াভেল থেকে অ্যামেরী আর কমন্সসভা সবাই মিলে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে উদ্‌গ্রীব ; ভারতীয়দের এখনই যুদ্ধে পাঠানো দরকার এবং ভারতীয় সৈন্য আর জনবল ব্যতীত জাপানকে বাগে-আনা সম্ভব হচ্ছে না! আর একটা বিষয় হলো, কলকাতায় আমেরিকান সৈন্য সহ অন্যান্য বিদেশীরা এটা বুঝতে পারছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া মিত্রশক্তির প্রধান শরিক হলেও এবং তারা দুর্ধর্ষ জার্মানদের অগ্রগতিকে শুধু প্রতিহতই করেনি, বরং বার্লিন পতনের সামগ্রিক ব্যবস্থায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও তাদের বলশেভিক চিন্তাধারায় কমরেড স্তালিনের নেতৃত্বের বিকাশ ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনভিপ্রেত, কেননা ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশ সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ও বীরত্বের দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত। বিশেষত বাংলা আর এখানকার কমিউনিস্টরা এখন উজ্জীবিত, ভারত যে সংগ্রামমুখী—সে তো একদিন স্বাধীন হবেই, ব্রিটিশের অবস্থানটা তখন কী হবে ; সর্বোত্তম হবে আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের শ্রদ্ধাবোধ জাগানো এবং ব্রিটেনের কবল থেকে ভারতকে স্বাধীন করে ধনতান্ত্রিক ধাঁচে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার সুযোগ সৃষ্টি করা। উপরন্তু এই অবস্থায় ব্রিটেন তার ঔপনিবেশ ভারতকে এখন স্বাধীনতা দিলে যুদ্ধশেষের অর্থনৈতিক মন্দার আঘাত ব্রিটেনকে সহ্য করতে হবে না বা বাড়তি দায়িত্ব গ্রহণ না করেই পারবে, অধিকন্তু ব্রিটেন ভারতের সঙ্গে দীর্ঘসূত্রে আবদ্ধ থাকার সুযোগ লাভ করবে। সিমলা সম্মেলন এই ভাবনা-চিন্তাগুলির বাস্তবায়নের হয়তো প্রাথমিক পদক্ষেপ, ব্রিটেনের কার্যকরী ভূমিকা পালনের প্রয়াস। এর পরেও অবশ্য লর্ড ওয়াভেলের ভয় ছিলো যুদ্ধের সমাপ্তি যদি খুব শীঘ্র হয়ে যায়, অর্থাৎ জাপান যদি আত্মসমর্পণ করেই বসে তবে কংগ্রেস পুনরায় দাবীর বহর বাড়িয়ে দিতে পারে এবং যে কোনো বিষয়কে সামনে নিয়ে গান্ধীজী পুনরায় অনশনে বসলে সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না। ওয়াভেল ইতিপূর্বেই প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে জানিয়েছেন—যে সব আমলা দেশ শাসনে পটু তারা যুদ্ধের কারণে এবং রাজনৈতিকভাবে ভারতীয়দের অবস্থানহেতু যুদ্ধশেষে ভারতে আর কাজ করবে কিনা সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ সব আমলারা এখন ক্লান্ত—নতুন করে ব্রিটেন থেকে ভারতে কোনো আমলা আসার সম্ভাবনা খুবই কম ; এছাড়াও যুদ্ধশেষে এ দেশে ব্রিটিশ সৈন্যরা বেশী দিন থাকতে আগ্রহ দেখাবে কিনা সেটাও ওয়াভেলের কাছে বিবেচ্য বিষয়।[৫]

বড়লাটের প্রচেষ্টায় পূর্বের ঘোষিত ২৫শে জুন (১৯৪৫) সিমলাতে রাজনৈতিক সম্মেলনের পূর্ণতা দিতে মৌলানা আজাদ (কংগ্রেসের সভাপতি) অনুভব করলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডেকে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন, সভা সিদ্ধান্ত নেয় সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন সভাপতি মৌলানা আজাদ। আলোচ্য বিষয় ছিলো যুদ্ধকালীন অবস্থায় বড়লাট চাইছেন তাঁর এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে ভারতীয়রা স্থান নিক এবং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় খুব বড়ো ধরনের কোনো পরিবর্তন সূচিত না হলেও যুদ্ধশেষে ভারতের সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ সরকার যে একান্ত আগ্রহী তা প্রকাশ করা। অতএব, এসময়ে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো—বিশেষত কংগ্রেস ও লীগের সহযোগিতা তিনি কামনা করেন, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিজনিত তাদের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে সম্ভবত তা উভয় দলই যুদ্ধশেষে মিটিয়ে নিতে সক্ষম হবে। কিন্তু সভা শুরু হলে দেখা গেল শেষের বিষয়টি নিয়েই সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করছে। মিঃ জিন্না চাইছেন লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও পাকিস্তান প্রস্তাবকে সামনে রেখে মুসলমান প্রার্থী দেয়ার ক্ষেত্রে তারাই একমাত্র কর্তাব্যক্তি হবেন, কংগ্রেস যদি লীগের এ দাবী মেনে নেয় তবে কংগ্রেসের মূল নীতি ব্যাহত হবে—অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কে জড়িয়ে যাবে। মৌলানা আজাদ মিঃ জিন্নার বক্তব্যকে স্বীকার না করে বরং যুক্তি দ্বারা বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেন :

> মিঃ জিন্নার ইচ্ছা আমরা যতদূর সাধ্য পূরণ করেছি ; কিন্তু ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক এবং প্রামাণ্য সংগঠন হল মুসলিম লীগ, তাঁর এই দাবী আমরা মানতে পারিনি। যে সব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে লীগের কোনো মন্ত্রীসভা নেই। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্টদের মন্ত্রীসভা। সিন্ধু প্রদেশে স্যার গুলাম হোসেন কংগ্রেসের ওপর নির্ভরশীল এবং আসামেও সেই একই অবস্থা। কাজেই মুসলিম লীগকে সমস্ত মুসলমানের প্রতিনিধি বলে মানা যায় না। সত্যি বলতে কি, মুসলমানদের

এমন অনেক বড় বড় গোষ্ঠী আছে, যাদের সঙ্গে লীগের কোনোই সংস্রব নেই।[৩]

মুসলিম লীগ অবশ্য এই প্রশ্নেই থেমে না থেকে প্রসঙ্গটা একটুখানি ঘুরিয়ে দিলো, মিঃ জিন্না প্রশ্ন তুললেন, মুসলিম অধ্যুষিত ছয়টি প্রদেশ কি অখণ্ড ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকবে অথবা ভারত খণ্ডিত হলে তাদের অবস্থা কোথায় দাঁড়াবে। লীগও স্বাধীনতা চায় তবে, খণ্ডিত ভারতে প্রয়োজনে খণ্ডিত প্রদেশ সহ।

স্মর্তব্য, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আলিগড় আন্দোলন থেকে শুরু করে মিঃ জিন্নার ১৯৩৭-১৯৩৮ পর্যন্ত সময়কালকে আমরা দেখি মুসলিম পুনর্জাগরণের বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ভাবতে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের প্রচেষ্টায় রত, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করেই নেতৃত্ব আবর্তিত হচ্ছিলো এবং শিক্ষা গ্রহণ ও অধিকাব প্রতিষ্ঠা ছিলো মুখ্য বিষয়। অবশ্যই এর ব্যতিক্রম হিসেবে মিঃ জিন্নার রাজনীতিতে প্রবেশ এবং প্রাধান্য লাভ এগিয়ে চলে খিলাফত আন্দোলনের প্রসবকাল পর্যন্ত। গান্ধীজী এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলন নিয়ে মতান্তর ঘটলেও ১৯২৮-এ কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলনে তিনি একই ভূমিকা পালনে তৎপর ; কিন্তু ১৯৩৭-১৯৩৮-এ এসে তিনি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে আদ্যোপান্ত পরিত্যাগ করে উচ্চকিত হলেন পুরোনো ধারায় ঐস্লামিক পুনরুজ্জীবনে। রাজনৈতিক মঞ্চে হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বকে পুনরায় ফিরে পেতে তৎপর মিঃ জিন্না এবং সক্ষমও হলেন নেতৃত্বদানে ; কিন্তু কংগ্রেসের মতোই শ্রেণীগত অবস্থানটাকে পাল্টাতে পারলেন না ; উভয়েই যে প্রতিনিধিত্ব করছেন ভারতীয় উঠ্‌তি পুঁজিপতিদের। ১৯৪৫-এ এসেও আমরা দেখবো মিঃ গান্ধী এবং মিঃ জিন্না রকমফেবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও মূল লক্ষ্য কিন্তু সেই গোষ্ঠীরই স্বার্থ রক্ষা করা। সদলবলে মিঃ জিন্না চাইলেন দাউদ-ইস্পাহানিদের মতো মালিক ও ব্যবসাদারদেব স্বার্থ রক্ষার্থে ঐস্লামিক শ্লোগানকে বিভক্তিকরণের হাতিয়ার বানাতে ; সম্ভবত টাটা বিড়লা—মাড়োয়ারীদের সঙ্গে ইস্পাহানিরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে গান্ধীজী তো কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর পাশে রয়েছেন রাজাগোপালাচাবী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলেব মতোই অন্যান্য সর্দারেরা, বিড়লা-মাড়োয়ারীদের তো ছক্কা। কংগ্রেস ও লীগ এ পর্যন্ত উভয়ের উদ্দেশ্যটা ঠিক এক শ্রেণীরই স্বার্থ বহন করেছে, শুধু নেতৃত্বের টানাপড়েনে প্রশ্ন দেখা দেয় নেহরু-আজাদ-সর্দার এঁদের ভাগেই কি রাজনৈতিক ফায়দা থাকবে, নাকি মিঃ জিন্না-নবাবজাদা লিয়াকত আলী-চন্দ্রচূড়দের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়বে ; পক্ষান্তরে বিড়লা-মাড়োয়ারী নাকি দাউদ-ইস্পাহানি। অবশ্য দেশটা ভাগাভাগি হলে কমজোরি ইস্পাহানিরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। অতএব এবারে সহজেই অনুমান হয় দেশ ভাগ, নয়তো মল্লযুদ্ধে নিজেব স্থানটা পোক্ত করার সুবিধেটা চাই। কংগ্রেস চাইছে গোটা ভারতের ওপর আধিপত্য—যার জন্যে হঠাৎ গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো', কিন্তু লীগের বাহানা স্বতন্ত্র—ভারতকে ভাগ করে ছাড়ো—আর লীগকে একটা জুৎসই অংশ দিতে হবে এবং এই দেয়ার কথা পূর্বেই স্বীকার করতে হবে, অর্থাৎ 'বামুনের পৈতে না আচালে বিশ্বাস নেই'। ব্রিটিশের শাসনকর্তাদের তো পোয়াবারো—কংগ্রেস আর লীগের এ অবস্থায় নিজেদের পাশে আরো খানিকটা ঝোল টানা যায় কিনা দেখলে মন্দ হয় কি!

ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদ গত দু'তিন বছরে এ জন্য অনুভব

করছিলো যে জাতীয় কংগ্রেস এবারে 'ঠেলায় পড়ে বাপের নাম' ভুলে যাবে, কেননা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রতিষেধক দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং পাকিস্তান হাসেলের জন্য লীগের সংগ্রামটাতে পরোক্ষে ব্রিটিশ স্বার্থ টিকিয়ে রাখার মোক্ষম দাওয়াই হয়েছিলো ; যেহেতু কংগ্রেস এটাকে মেনে নেবে না আর লীগও একে ছেড়ে অন্য গান গাইবে না। বাস্তবে ১৯৪৫-এ এসে ফলটা ফললো এমনতরো যে লীগের প্রতি মুসলমানদের বৃহত্তর অংশের বিশ্বাস গজালো ঐস্লামিক স্বার্থেই এদের প্রতি সহযোগিতা করা দরকার ; কংগ্রেসের প্রতিও জনসাধারণের বিশেষত হিন্দু-শিখদের বৃহত্তর অংশের বিশ্বাস দৃঢ় হতে শুরু করে নিজেদের অখণ্ড ভারতকে রক্ষার কাণ্ডজ্ঞানহীন সেবাইত বিবেচনায়। বস্তুত দুটি সম্প্রদায়ের বিভেদ সূচিত হলো যা পরবর্তীতে সহাবস্থানে পৌঁছানোর সকল প্রচেষ্টাকে তিরোহিত করে।

সিমলা সম্মেলনের পূর্বেই কংগ্রেস খানিকটা সতর্ক হলো কিন্তু গান্ধীজীকে ধরেই প্রায় প্রত্যেক নেতা (জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ ব্যতীত)—সে তাঁর পদমর্যাদা যা-ই থাকুক না কেন হিন্দুত্বের নামাবলী শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম ছিলেন না। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখা যেতে পারে। সময়ের ব্যবধানে—স্বাধীনতার ৩৭ বৎসর পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হলেন, অবিশ্বাস্য ধরনের এই ঘটনায় সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে ; যেহেতু তাঁর হত্যাকরীরা ছিলো শিখ—একমাত্র সেই কারণেই শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভার একসময়কার পূর্ণমন্ত্রী এবং দলের কেন্দ্রীয় স্তরের বিশেষ এক নেতা দিল্লিতে প্রকাশ্যে শিখ নিধনে নেমে পড়েন— যা স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস ও শ্রীমতী গান্ধীকেই সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে কলঙ্কের ভাগীদার করে তোলেন। যাহোক, সিমলায় কিন্তু সম্মেলন মঞ্চে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস চাইলো দলটাকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখতে এবং সদস্য মনোনয়নের (এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলে) ব্যাপারে কংগ্রেসের নিজস্বতা বজায় রেখে চলতে ; কিন্তু মিঃ জিন্না সরাসরি বলেই দিলেন যে-কোনো মুসলিম সদস্যকে মনোনয়ন দেয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র লীগই সিদ্ধান্ত নেবে, কংগ্রেস যদি তার সংগঠনের মধ্য থেকে—নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের মধ্য থেকে কোনো মুসলমানকে মনোনীত করে তাতেও মিঃ জিন্নার আপত্তি থাকবে; যদিও পুরো আলোচনাটা তো ক্রিপ্‌স প্রস্তাবকে ঝেড়েঝুড়ে নতুন করে ঘরে তোলার মতোই হলো। বড়লাট ওয়াভেল কংগ্রেসের যুক্তি স্বীকার করা ও স্বীকার না করার মধ্যবর্তী অবস্থায় থেকে মুসলিম লীগের আব্দারকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি, তাঁর নিজস্ব তালিকাও মিঃ জিন্না গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। যদিও বড়লাটের তালিকাটায় হিন্দু-মুসলমান পাঁচ পাঁচ করে সমান সংখ্যক সদস্য থাকার ব্যবস্থা ছিলো, অতিরিক্ত চারজনের মধ্যে শিখ ও তপশীল শ্রেণী থেকে দুজন করে এবং শেষ নামটি হলো পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াত খানের। কংগ্রেস থেকে ইতোপূর্বে মৌলানা আজাদের নাম এসেছিলো—এখন কাউন্সিলে লীগ মনোনয়ন ব্যতীত দুজন মুসলমান সদস্যের নাম আসায় মিঃ জিন্না দেখলেন এ হলে কংগ্রেসকে তো আর হিন্দুদের সংগঠন বলা যাবে না। অতএব তিনি গোস্বা করে সমস্ত ব্যাপারটাই বানচাল করতে চাইলেন এবং সিদ্ধও হলেন এ কাজে। কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন না যে, লীগেরই হোক আর কংগ্রেসেরই হোক, এব ফলে কিন্তু মোট চৌদ্দজন সদস্যের মধ্যে সাতজনই মুসলমান থাকার প্রস্তাব হচ্ছিলো—এটা ভেস্তে দিয়ে মুসলমানদের কি অধিকতর স্বার্থ রক্ষা হলো নাকি

মুসলমানরা ভারত সরকারে যোগদানের বিষয়ে একটা মোটা ধরনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো।[৭] মিঃ জিন্নার দাবীর বহর দেখে ওয়াভেলকে একসময় সৈনিকসুলভ দৃঢ়তার পরিচয় দিতেই হলো, তিনি মিঃ জিন্নার জেদকে (মুসলিম সদস্য মনোনয়নের বিষয়ে লীগের একক কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার প্রশ্নে) প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ২৯শে জুনে তিনি সব নেতৃত্বকে তাঁদের পছন্দমতো নাম পাঠাতে বললেন—আর এর মাধ্যমেই তিনি সর্বজনগ্রাহ্য একটা পরিষদ গঠনে ব্রতী হলেন। ১৪ই জুলাই পর্যন্ত সম্মেলনটা থাকলো মুলতবি। ওয়াভেল তথ্য দিয়েই নামের তালিকা গ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠান, কিন্তু বিলেত ফেরত সিদ্ধান্তটা মেনে নিতে না পেরে মিঃ জিন্না নতুন দুটো দাবী জানান যার মধ্যে রয়েছে 'সাম্প্রদায়িক ভেটো'র ব্যাপার ; ওয়াভেল দৃঢ়তার সঙ্গে দুটো দাবীকেই অগ্রাহ্য করলেন। সম্মেলনের গুরুত্ব হ্রাস পেলে শেষ অবধি সম্মেলনটাই ভেস্তে গেল। গান্ধীজী এ প্রসঙ্গে বললেন যে, পরস্পর দুটি বিরোধী পক্ষের মধ্যে সমঝোতা বাস্তবিক অসম্ভবের ছিলো। মিঃ জিন্নাকে আপস-রফায় আসতে বাধ্য করতে পারলেন না ওয়াভেল এবং কংগ্রেস প্রস্তাবকেও কিন্তু এককভাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা দেখালেন যেহেতু কংগ্রেস তালিকা গ্রহণ করলে কাউন্সিলে কংগ্রেস আধিপত্য স্বীকৃত হয়ে যাবে। অধ্যাপক ত্রিপাঠী বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন :

> ওয়াভেলের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু একটা নতুন পদক্ষেপ নিতে চেয়েছিলেন তিনি, চেয়েছিলেন অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে। আর ভারত ভাগ তিনি চাননি। শেষে লীগের গুরুত্ব মেনে নিলেও জিন্নাকে সব মুসলমানের 'একমাত্র মুখপাত্র' বলে কোনও দিন স্বীকার করেননি তিনি। জিন্নার সংকীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক রূপ ভাল ভাবেই চিনতেন তিনি। পাকিস্তান বলতে জিন্না বুঝতেন ভারতের কয়েকটি মুসলিম অঞ্চলে শুধু মুসলিম ভোটের মাধ্যমে স্বতন্ত্র শাসন। এ ব্যাখ্যা ওয়াভেল মেনে নেননি। কিন্তু হডসনের প্রশ্ন (যা আমাদেরও), জিন্নার গোঁয়ার্তুমিতে তবে কেন পিছিয়ে গেলেন তিনি? কেন সিমলা বৈঠকে ইতি টানলেন? (এইচ. ভি. হড্‌সন, দ্য গ্রেট ডিভাইড, লণ্ডন, ১৯৬৯, পৃ. ১২৬), তিনি যদি অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতেন, জিন্নাকে সুর নামাতেই হত। লীগকে বাদ দিয়ে কাউন্সিল গঠিত হচ্ছে—তা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। আর যদি তৎসত্ত্বেও অসহযোগিতা করতেন, তবে বহুসংখ্যক মুসলিমদের ওপর কর্তৃত্ব হারাতেন। পঞ্জাবের মুসলমানরাই তো তাঁকে পরিত্যাগ করত। আমরা দেখব ১৯৪৬ সাল অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সময় জিন্না একগুঁয়েমি করছেন কিন্তু সেবার লীগকে বাদ দিয়েই সরকার গঠিত হয়। জিন্না অনেক সাধাসাধি করে, ওয়াভেলকে নরম করে, প্রায় পেছনের দরজা দিয়ে সরকারে ঢোকেন। আমার মনে হয়, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি বলে ওয়াভেল শুধু কংগ্রেস প্রভাবিত কাউন্সিল চাননি। সেখানে কাজ করছিল কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর বহু তিক্ত স্মৃতি—ক্রিপস মিশনের সময় তারা প্রতিরক্ষা দফতর চেয়েছিল অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে তার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করেছিল, আবার 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় সমরোদ্যোগে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। দাঁড়িপাল্লার একদিকে লীগ না থাকলে কংগ্রেসকে সামাল দেবে কে? উভয়ে দিনরাত ঝগড়া না করলে তাঁর হাতে শেষ সিদ্ধান্ত থাকবে কি করে? তা ছাড়া লীগকে বাদ দিয়ে সরকার গঠনের ব্যাপারে বাংলা ও পঞ্জাবের লাটদের আপত্তি ছিল, যদিও সিন্ধু ও সীমান্তের লাটদের ছিল না। গান্ধী আমলাদেরও দোষ দিয়েছেন। (ওয়াভেলকে গান্ধী, ১৫ই জুলাই ১৯৪৫, গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮০ খণ্ড, পৃঃ ৪২৬)

সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এর ফলে আরো খারাপ হবে এমন ভয় কাজ করেছিল। সর্বোপবি ওয়াভেলের ভয় ছিল, কংগ্রেসীদের প্রাধান্য দিলে চার্চিল তা বরদাস্ত করবেন না।[৮]

কিন্তু ফল একটা ফললো, মিঃ জিন্নার অসঙ্গত একগুঁয়ে দাবীর ফলে সম্মেলনটার শেষরক্ষা আর হলো না. পক্ষান্তরে হিন্দু মহাসভা মিঃ জিন্নার কার্যাবলী সামনে রেখে ভারতব্যাপী হিন্দুত্ব প্রচার ও সাম্প্রদায়িক শক্তি অর্জনে তৎপর হয়ে ওঠে।

সিমলা সম্মেলন চলাকালীন বেতারে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ভেসে এলো, তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জন্য, তিনি ভাষণে উল্লেখ করেন কংগ্রেসের দায়িত্বের কথা—মুসলিম লীগ যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি নয় সে বিষয়টাও ভাষণে স্থান পেলো।[৯] তাঁর বক্তব্যে থাকে, জার্মানিকে মিত্রশক্তি হারালেও ভারতের স্বাধীনতা লাভের নির্ভুল পদ্ধতি হলো প্রতিরোধ-সংগ্রাম এবং কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে বহির্বিশ্বকে ভারতের সমর্থন জানাতে কাছে টানা। ৫ই জুলাই ব্রিটেনের নির্বাচনকে সামনে রেখেই ওয়াভেলের এই প্রচেষ্টা, ভারতবর্ষ যেন ওয়াভেলের জালে জড়িয়ে না পড়ে।[১০] কিন্তু একটা কথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়, মিঃ জিন্না নিজের দাবীর প্রতি (মুসলিম লীগেরও বটে) অবিচল থেকে একদিকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এক দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বে যিনি কংগ্রেসের—মায় গান্ধীজীরও অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করেন ; অবলীলায় ওয়াভেলের মুখের উপর 'না' বলতে পারেন, ইংল্যাণ্ডের সিদ্ধান্তের ওপর তোযাক্কা না করে নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকার মানসিকতা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাই এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে মুসলিম লীগ নয়, শুধুমাত্র মিঃ জিন্নাই অখণ্ড ভারতেব স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে সিমলায় বিসর্জন দেয়ার কাজটি সম্পন্ন করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাল-হকিকত যা তাতে বিশ্বযুদ্ধে জাপান (অক্ষশক্তি) মিত্রশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করে চলছে, তবে মিত্রশক্তির আক্রমণের তীব্রতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপর্যস্ত জাপানী সেনারা ২৯শে এপ্রিল রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যায়, ২৩শে মে এবং ২৫শে মে টোকিও বোমার কবলে পড়ে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে, কিন্তু ভয়ানক ঘটনাটা ঘটলো ৬ই আগস্টে—আমেরিকা বোমারু বিমান থেকে 'লিটলবয়' নামে এ্যাটম-বোম ফেললো হিরোশিমায ; ৯ই আগস্টে দ্বিতীয়বার 'ফ্যাটবয়' দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শতাব্দীর বীভৎসতা নামিযে আনে নাগাসাকিতে। ১০ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু 'লিটলবয়' আর 'ফ্যাটবয়'-এর কাণ্ডকারাখানাতে পৃথিবীর তাবৎ লোক আতঙ্কিত হয়ে ওঠে—এই দানবীয় ঘটনার জন্য অনন্তকাল ধরে মানবতাবোধে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে আর তার প্রেসিডেন্টকে ক্ষমা করতে পারবে না।

১৮ই আগস্ট দুপুরে একটি বিমান অবতরণ করে ফরমোজার বিমানঘাটিতে, মধ্যাহ্নভোজনের পরে বিমানটি পুনরায় আকাশে ওড়ে অন্যান্যদের সঙ্গে দুজন বিশেষ যাত্রী নিয়ে যাঁরা ভারতীয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরযোদ্ধা ; একজন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র—ভারতবর্ষ যাঁকে অনন্তকাল ধরে শুধু 'নেতাজী' পরিচয়েই ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে স্মরণ করবে, অন্যজন হবিবুব রহমান—নেতাজীর আদর্শের এক যোদ্ধা। ২১শে

আগস্ট দিল্লি বেতারকেন্দ্র খবর দেয় নেতাজী তাঁর সংগ্রামী জীবনের শেষ অঙ্কেও বন্ধু—সহযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন হবিবুর রহমানকে : হিন্দু অথবা মুসলিম হিসেবে নয়, ভারতের স্বাধীনতার সৈনিকরূপে—হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মিলনের উৎস সন্ধানে!

আমরা একবাব দেখতে চেষ্টা করতে পারি নেতাজীর শততম জন্মদিনটি পালন করতে গিয়ে বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ-বুদ্ধিজীবিগণ স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছিতে পৌঁছে কী ভাবছেন।

আই. এন এ.-র যুদ্ধবন্দীদের প্রধান কৌশুলি তখনই বলেছিলেন :

> যুদ্ধের পর দিল্লীতে আই এন এ'র সেনাপতিদের বিচার হয়েছিল। ভুলাভাই দেশাই ছিলেন আই এন এ-র পক্ষেব প্রধান কৌসুলি। তিনি বলেছেন : 'নেতাজির প্রতি আমি ছিলাম বিরূপ, তাঁর সমালোচক। তিনি যে কর্মপন্থা নিয়েছিলেন তাতে আমার আস্থা ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আমি ছিলাম সন্দিহান। তিনি বিদেশে গিয়ে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন বলে আমি তাঁকে পাগল মনে করতাম। কেন না রাষ্ট্রই নেই, তায় রাষ্ট্রপতি! আমরা এ নিয়ে বহু তামাশা করেছি। 'কিন্তু শাহনওয়াজ, ধীলন ও সায়গলের বিচারের সময় আমি যখন তাঁদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালাম তখন নেতাজির কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত নথিপত্র ঘাঁটতে লাগলাম। আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেল। নেতাজিকে আমরা কত ছোট করেছি। দেখলাম, তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, জন্মনেতা, দেশপ্রেমিক, যোদ্ধা, রাষ্ট্রনায়ক।'[১১]

অতীশ দাশগুপ্ত আই. এন. এ.-র পরাজয়কে সামনে রেখে তাঁদের সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে।

> ইম্ফলে জাপানের সামরিক তৎপরতা ব্যর্থ হওয়ার পব কর্নেল ধীলন নেতাজির কাছে সরাসরি জানতে চেয়েছিলেন একটি প্রশ্নের উত্তর। 'আমরা তো এই লড়াই হারতে বসেছি। নতুন করে তৈবি হয়ে আক্রমণ শানানোরও সম্ভাবনা কম। তাহলে, এই লড়াইয়ে আমাদের আর জেতার মত থাকল কী?' একটুও না থেমে নেতাজি জবাব দিয়েছিলেন, 'ভারতের' স্বাধীনতার জন্য রক্তের ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।' এই উত্তর যেন নেতাজির পক্ষেই মানানসই। এর কিছুদিন আগে তো তিনিই বলেছিলেন, 'দেশপ্রেমিক ভারতীয় সৈন্যদেব রক্ত যখন প্রবাহিত হতে শুরু করেছে, স্বাধীনতা একদিন আসবেই এ দেশে।' ধীলন এই উক্তির তাৎপর্যেব কথা কখনও ভোলেননি। বরং পরে চমৎকারভাবে লিখেছিলেন, 'এ ভাবেই আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। আর আমাদের সামরিক লক্ষ্য হল ভারতের স্বাধীনতার জন্য বক্তেব ঋণ শোধ করা।' ইম্ফল ও আরাকানের রণক্ষেত্র থেকে আই এন এ-র আপাত প্রত্যাবর্তন আসলে পরাজয়ের মধ্যে যেন এ বিজয়ে উন্মেষ ঘটিয়ে দিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বাস্তবতার গুণগত পরিবর্তন ঘটল ১৯৪৫ সালেব মে মাসে, যখন সোভিয়েতের লাল ফৌজ বার্লিনে প্রবেশ করে নাৎসি জার্মানির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটাল। এই ঐতিহাসিক বিজয়ের ফলে ব্রিটিশ-মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও কোণঠাসা হয়ে পড়ল। এই নতুন বিশ্ব যুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মত্যাগ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেষ পর্যায়ে নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হল। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়াবির শেষ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন শহরে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ মুখরিত হল তাতে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মত্যাগের প্রভাব পড়েছিল ব্রিটিশ

নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে গভীরভাবে। ভাইসরয় ওয়েভেল ১৯৪৫ সালের আগস্টেই বিদেশ সচিবকে লিখেছিলেন, 'এই প্রথম একজন ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু) আমাদের সৈন্য বাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের মনে দারুণ প্রভাব অর্জন করেছেন'। ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের সেনাকর্তা ফ্রান্সিস টাকার লিখেছিলেন যে, ১৯৪৬ সালের গোড়াতেই আই এন এ-র নির্দিষ্ট প্রভাবে কলকাতার কাছেই ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের দুটি পাইওয়নিয়ার ইউনিট সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাবে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল মুম্বই ও করাচিতে ১৮ ফেব্রুয়ারির নৌ বিদ্রোহে। ভারত পরিদর্শন সমাপ্ত করে ব্রিটিশ সংসদীয় দলের নেতা অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক রিচার্ডস ফেব্রুয়ারির শেষে দেশে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লেম এটলিকে বলেছিলেন, 'আমাদের অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে আসা উচিত। যদি আমরা না আসি তাহলে ভারতীয়রা আমাদের এবারে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।' চতুর রাজনীতিবিদ ক্লেম এটলি সেই সন্ধিক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন ঘনিয়ে আসছে। ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি ঘোষণা করলেন উপমহাদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের সপক্ষে। নেতাজি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মত্যাগের সুগভীর প্রভাবের ফলেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ওই আত্মসমর্পণের ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে এট্‌লি কলকাতার রাজভবনে সাময়িকভাবে অবস্থানের সময়েও একথা স্বীকার করে গেছেন।[১২]

ওসিউর রহমান নামে জনৈক পত্রদাতা 'আজকাল' পত্রিকার 'প্রিয় সম্পাদক'-এ একটি চিঠি পাঠান এবং চিঠির প্রকাশিত অংশের কিছুটা এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি :

> এক আজব দেশ! সর্বশেষে সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আবেদন, এটাই নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাবার ভাল সময়। এত দিন যেভাবে আমরা উপেক্ষা করেছি, আসুন, আজ বুঝিয়ে দিই সেটা আমাদের ভুল। সেটা আমাদের লজ্জা। একদিন নেতাজি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতার সুখ অনুভব করার জন্য এ দেশে একটি লোকেরও বেঁচে থাকার দরকার নেই। আজ আমাদের ইচ্ছা একটাই · মৃত্যু। আসুন, প্রত্যেকে মরি। যাতে ভারতবর্ষ বাঁচে। আসুন, প্রতিটি ভারতবাসী শহিদের মৃত্যুবরণ করি। কোটি শহিদের রক্তস্রোতে স্বাধীনতা ভেসে আসুক।' এই জ্বালাময়ীর বক্তৃতায় একদিন জ্বলে উঠেছিল স্বাধীনতা-আন্দোলনের দাবানল। সে অনলপরিধির মধ্যে দেবমূর্তি তো একটাই। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। স্বয়ং ব্রহ্মা। তাই নয় কি?[১৩]
>
> ওসিউর রহমান। ২২/১, সার্কাস রো। কলকাতা-১৭

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হয়ে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনাকে সুনজরে দেখেনি। কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে হেয় প্রতিপন্ন করতে নানাপ্রকার বিদ্রূপাত্মক কার্টুন প্রকাশ করে। এছাড়াও নানা প্রবন্ধের মাধ্যমে তারা নেতাজীকে ফ্যাসিবাদের সাহায্যকারী উল্লেখ করে প্রচার চালাতে থাকে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে পুনরায় মূল্যায়নে উপস্থিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ 'গণশক্তি' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের এভাবে শুরু করেন তাঁর শততম জন্মদিন উপলক্ষে :

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যখন যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটছে তখন ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনেও ইতোবাচক পরিবর্তন ঘটছে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই ঘটনাবহুল পর্যায়ে সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক জীবন। তাঁর জন্মশতবর্ষ পালন উপলক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অমূল্য অবদানকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছে। তাঁর মহান দেশপ্রেম, অদম্য সাহস, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ এবং সমস্ত বিপদ, অসুস্থতা ও কষ্ট অগ্রাহ্য করে লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য তিনি ভারতের জনগণের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।[১৪]

এই প্রবন্ধে তিনি সি. পি. আই.-য়ের তৎকালীন জনযুদ্ধের সমর্থনে গৃহীত কর্মসূচী সহ সঠিকভাবেই সোভিয়েত রাশিয়ার বিপদ বা গণতান্ত্রিক বিশ্বের সমস্যাকে উপলব্ধি করেও দেশীয় বা জাতীয় অনুভূতি ও অভ্যুত্থানে সঠিক পন্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জনই যে সুভাষচন্দ্রের একমাত্র কাম্য ছিলো—তা যাদের সাহায্যেই হোক না কেন সেকথা স্বীকার করে সুরজিৎ প্রবন্ধের শেষে এভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন :

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পরেই গোটা বিশ্ব উদ্বেল হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান ভূমিকাও প্রশংসিত হয়। কারণ স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে নতুন উচ্চতায় তুলে দিয়ে গোটা পরিস্থিতিকে প্রবলভাবে উদ্দীপিত করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের পরেই আমরা দেখেছি, আই এন এ বাহিনীর মুক্তির দাবিতে দেশজুড়ে হরতাল, বিক্ষোভ। এতে শ্রমিক-কৃষক এবং শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশও যুক্ত হয়। বাংলায় তে-ভাগা আন্দোলন, আসামে সুরমা উপত্যকায় কৃষক সংগ্রাম, মহারাষ্ট্রে ওয়ার্লি, উপজাতিদের সংগ্রাম, কেরালায় পুন্যাপ্রা-ভায়ালাব সংগ্রাম এবং শেষমেশ নৌবিদ্রোহ জাতীয় সংগ্রামকে নতুন অভিমুখে নিয়ে যায়। শ্রমিকশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। যার ফলেই ব্রিটিশ শাসকরা বাধ্য হয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, আজ সুভাষ বসুর জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে একজন নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী হিসাবে, একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে, একজন আত্মত্যাগী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁর অবদানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।[১৫]

একই দিনে 'গণশক্তি' পত্রিকায় সম্পাদকীয় থাকে নেতাজীর জন্মশতবর্ষ নিয়ে, এখানে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা হলো কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধের স্লোগান ভুল ছিলো না ; কেননা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পরাজয় ঘটলে যুদ্ধের ফলে তো পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির অবস্থানটাই পাল্টে যেতো। যুদ্ধ পরবর্তীতে যে পৃথিবীকে আমরা পেয়েছি তা পাওয়া যেতো না, ইতিহাস এক ভয়ানক মোড় নিতো। সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হলো, দেশের মানুষের অনুভূতি-আকাঙ্খা-আলোড়ন থেকে কমিউনিস্টরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলো, 'আন্তর্জাতিক স্তরের দ্বন্দ্বগুলির সঙ্গে জাতীয় স্তরের দ্বন্দ্বগুলির সমন্বয় ঘটানোতে ব্যর্থতা'র ফলেই সুভাষচন্দ্রের অবস্থান নিয়ে উপযুক্ত মূল্যায়নে কমিউনিস্টদের দ্বিমত দেখা গিয়েছিলো। এই সম্পাদকীয়ের শুরু এবং শেষটা উপস্থিত করলে একটা আবেগের বহিঃপ্রকাশ এবং বিশ্লেষণ সহজেই দেখা যায় :

ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পঞ্চাশতম বর্ষে আজ ২৩শে জানুয়ারি দেশের অন্যতম বরেণ্য সন্তান সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি। কাকতালীয় হলেও এই সংযোগ মোটেই সঙ্গতিহীন নয়। সুভাষচন্দ্র ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে

> তাঁর অবদান অমূল্য এবং অবিস্মরণীয়। তাঁব অনির্বাণ স্বদেশপ্রেম, অদম্য সাহস, নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা এবং অবিচল দৃঢ়তার জন্য দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। দেশের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান এবং এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি চরম মূল্য দিয়েছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সুভাষচন্দ্রের অবদানকে শ্রেষ্ঠতম সম্মান দেয় এবং তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।.....
> সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কমিউনিস্টদের মূল্যায়ন এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক নিয়ে কোনো কোনো মহল থেকে ভিত্তিহীন কুৎসা ও অপপ্রচাব হয়ে থাকে। ইতিহাসই দেখিয়ে দেয়, এই সম্পর্কটা খুব সামান্য সময় বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল। স্বাধীন ভারতেব নতুন সংবিধান অনুযায়ী অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই কংগ্রেসীরা সুভাষচন্দ্রের প্রশ্নে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বল্‌গাহীন অপপ্রচাব চালিয়ে আসছে। কংগ্রেস কী দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রকে দেখেছিল এবং তাঁব প্রতি কী আচরণ করেছিল, সে প্রসঙ্গ ইদানীংকালে সুপবিকল্পিতভাবে চাপা দেবার প্রয়াসই দেখা যায়। বুর্জোয়া প্রচাবযন্ত্রগুলিও এই চক্রান্তের শরিক। সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে তাঁর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন শক্তিগুলির সম্পর্ক ও সংঘাত নিয়ে যত বেশি গবেষণা ও মূল্যাযন হবে, ততই উদ্‌ঘাটিত হবে প্রকৃত সত্য।[১৬]

আবদুর রউফ এক প্রবন্ধে নেতাজীর ইতিহাস-চেতনা সম্পর্কে আলোকপাতের পরে উত্থাপন করেছেন নেতাজীর চিন্তা-চেতনায় ধর্মবিশ্বাসজনিত ভেদাভেদের সম্পর্কে আদর্শ কী ছিলো—সেই বিষয়ের। রাজনীতিতে ধর্ম এলে সংখ্যালঘুরা যে সেটাকে সহজভাবে গ্রহণ না করে সংশয়ান্বিত হয়ে উঠবে নেতাজী সেটা অনুধাবন করেই আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে সর্বধর্মের মানুষদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে স্থান দিয়েছিলেন। উপরন্তু ভারতের রাজনীতিতে ব্রিটিশরা যে ভেদনীতি প্রচারের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে এগিয়েছিলেন নেতাজী তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন; তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি সেকুলারিজমের আদর্শ প্রয়োগের কথা বার বার উচ্চারণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বলেই বলতেন "মুসলমান চাষী এবং হিন্দু চাষীর মধ্যে গরমিলের চেয়ে মিলই আছে বেশী। জনসাধারণকে শুধু শেখাতে হবে তাদের প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বার্থটা কোথায় নিহিত। একবার যদি সেটা তারা বুঝে যায় তাহলে আর সাম্প্রদায়িক কোনো দ্বন্দ্বে তাদের বড়ের মতো ব্যবহার করা সম্ভব হবে না।" লেখক আবদুর রউফ এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রবন্ধটির শেষের দিকে এভাবে ভাবেন :

> নেতাজি সারাজীবনব্যাপী সেই সব প্রতীকের সন্ধান করেছিলেন। বাস্তবিক তাঁর জীবনটাই ছিল জাতীয় সংহতিব মূর্ত প্রতীক। তাই বলে তিনি পাশ্চাত্য অর্থে সেকুলার ছিলেন না মোটেই। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ছিল তাঁর নিভৃত হৃদয়ের ব্যাপারে, বাইরে যার কোন প্রদর্শন ছিল না। প্রথাসর্বস্ব সংগঠিত ধর্মে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। যে ধর্ম মানুষের মধ্যে উঁচু-নিচু ভেদভাব সৃষ্টি করে, তিনি ছিলেন তার বিরোধী। তাই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির, বিভিন্ন উপজাতির, এমনকী জনজাতিদেরও তিনি অকুণ্ঠ আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে মুসলমানরা তাঁকে নেতা হিসাবে বরণ করেছিলেন হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে। তাই যখন কেউ কেউ বলেন, নেতাজি হাজির থাকলে দেশভাগ কিছুতেই সম্ভব হত না—সেকথা নিঃসংশয়ে মেনে নিতেই বড্ড বেশি ইচ্ছে করে।[১৭]

বিভিন্ন পত্রিকায় এই সময়ে প্রকাশিত হয় নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার

পত্রিকায় 'ভারত পথিক' নামক প্রবন্ধের উল্লেখ না করলে এক বিশেষ অংশই বাকি থেকে যাবে। এই প্রবন্ধে লেখকদ্বয় নেতাজীর স্বদেশপ্রেমের পাশাপাশি সংগ্রামী চেতনার উল্লেখ করে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। 'স্বাধীন ভারতের জন্য' নেতাজীর কর্মসূচী ছিলো দীর্ঘমেয়াদী, এর মধ্যে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন দারিদ্র্য দূরীকরণের, আর এর উপায় হিসেবে সঠিকভাবে পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিতে ; অবশ্য শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থাকে এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ক্রমশ এগিয়ে নেয়ার এবং অবশেষে সমাজিকীকরণের লক্ষ্যও ছিলো তাঁর পূর্ব নির্ধারিত। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা দেন, উত্তরে নেতাজী বলেন :

> আমরা যারা রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশি সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমবা মর্মে মর্মে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি। প্রাণের দিক দিয়ে যে-সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হতে পারে না, সেই সম্পদ, সেই প্রেরণা আমরা চাই। কারণ আমরা জানি, সে প্রেরণা, সত্যের সেই আভাস যদি প্রাণের মধ্যে পাই তা হলে আমাদের কর্মজীবনের ও বহির্জীবনের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হবে। আপনার কাছ থেকে সে প্রেরণা আমরা চাই।[১৮]

নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এই প্রবন্ধে সঠিকভাবেই উল্লেখ করা হলো তাঁর চিন্তার জগতকে, কর্মের সঙ্গে চিন্তার যোগসূত্রকে :

> জনমানসে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ধারণা আছে যে, তিনি একজন সমরনায়ক এবং বিপ্লবী নেতা। তিনি দুঃখ কষ্ট ও আত্মত্যাগেব জীবন বরণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এক মহান সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই যে, তাঁর সংগ্রামী জীবনের মাঝখানেও সমকালীন ভারতবর্ষের ও বিশ্বেব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও লেখালেখিতেও তিনি যথেষ্ট সময় দিতেন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে নিমজ্জিত হয়ে থাকা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাস নিয়ে বই লিখছেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনেব বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা কবছেন। তাঁর যে চিন্তাধারা তা অত্যন্ত স্পষ্ট—একদিকে তা যেমন কোনও বৈষয়িক-ব্যাপাব উদাসীন আধ্যাত্মিক পরিব্রাজকের মতবাদ নয়, অন্যদিকে তেমনই বাইরে থেকে ধার করা কোনও সংকীর্ণ বিপ্লববাদও নয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর দার্শনিক মন দিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলির বিচার করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তিনি বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা সরাসরি অর্জন করেছেন। সমসাময়িক ভারতবর্ষে আর কোনও নেতার জীবনে এমন দেখা যায় না।[১৯]

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কর্মজীবনকে আমরা দুটো পর্বে দেখতে পাই, প্রথমত পরাধীন ভারতে কংগ্রেস কর্মী হিসেবে—কংগ্রেস নেতৃত্বে, যেখানে তাঁর অভিষেক হয়েছিলো, কিন্তু কর্মপদ্ধতি নানা প্রতিকূলতায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উদ্দেশ্য সাধনে—দেশসেবায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। উল্লেখ্য, গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের একশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় তাঁর 'ন্যাশনাল প্লানিং' জাতীয় উন্নতির সহায়ক হয়েও বাস্তবে রূপলাভ করেনি। 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সৃষ্টি হলেও কংগ্রেস তথা জনসাধারণকে অগ্রবর্তী—প্রগতিশীল চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। কেননা গান্ধীজীর মতো তৎকালীন নেতৃত্বের একটা বৃহত্তর অংশের তো ধারণা ছিলো তাঁর শিল্পায়নের পরিকল্পনা কংগ্রেসের আদর্শ মাফিক ছিলো না, কুটির শিল্পের বিকাশ ও পরিচর্যার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নেব আশা ছিলো সদস্যদের

লক্ষ্য—গান্ধীজী তাঁদের নেতৃত্ব দিতেন।[২০] পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্রের চেতনায় ছিলো আন্তর্জাতিকতা-উন্নত দেশগুলির সঙ্গে শিল্পে সমতা রক্ষায় এবং ভারতীয় দরিদ্র শ্রেণীর আর্থিক স্বাবলম্বনে—বিকাশে যাতে শিল্পায়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। মোদ্দা কথা, গান্ধীজী নির্ভর কংগ্রেসের খেয়ালী স্বভাবের মোড়ল-মাতব্বরেরা বিষয়টি আবেগসর্বস্ব করে গান্ধীজীর কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত যুক্তি-তর্ক এবং ইউরোপীয় দেশগুলির আর্থিক উন্নয়নের সূত্র খুঁজতে অনিচ্ছুক ছিলো ; হয়তো তাঁরা কিছুটা অক্ষমও ছিলো। অতএব, সংঘর্ষ অনিবার্য, শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী যথার্থ নিরূপণ করেছেন যে, মানসিক ধর্মে সুভাষচন্দ্র ছিলেন নাগরিক এবং গান্ধীজী অবশ্যই গ্রাম্য ; আর এজন্যেই উভয়ের মধ্যে মূলত বিরোধ উপস্থিত হয়েছে।[২১] নেতাজীর জীবনের অন্য পর্বটি ভারতের বাইরের—দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে,—রক্তের বিনিময়ে হলেও স্বাধীনতা চাই ; তাই বিদেশী সাহায্যের আশায় দেশত্যাগ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছেন। নেতাজীর প্রথম পর্বটি সম্পর্কে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেন :

> তিনি বাল্যকাল হইতেই দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন স্থির করিযাছিলেন, দেশকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিবেন, ইহাকেই নিজের কৃত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে সাংসারিক প্রতিষ্ঠার জন্য এই পথ হইতে তিনি কিছুদিনের জন্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন সত্য। কিন্তু ১৯২০ সনে অসাধারণ ত্যাগ কবিয়া বাঞ্ছিত পথে ফিরিয়া আসিলেন, দেশসেবার স্বাধীনতা পাইলেন। ১৯২১ সনে দেশসেবার জন্যই ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থতারও সম্মুখীন হইলেন। ১৯২১ সন হইতে ১৯৪১ সনে দেশ ত্যাগ করিবাব পূর্ব পর্যন্ত তিনি দেশ সেবা করিবার পূর্ণ সুযোগ বা পূর্ণ অধিকার পাইলেন না।[২২]

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই ব্রিটেনে নির্বাচন এসে যায়। নির্বাচনী প্রচারে শ্রমিক দল ঘোষণা করে যে তারা ক্ষমতায় এলে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে। নির্বাচনের পরে দেখা গেল শ্রমিক দল বিজয়ী হয়েছে এবং তারা ২৬শে জুলাই, '১৯৪৫' মন্ত্রিসভা গঠন করে; প্রধানমন্ত্রী হন অ্যাটলি। শুধু শ্রমিক দলই নয়, প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিও ভারতবন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতীতই শ্রমিক দল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে দৃষ্টি দেয় এবং ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে।

ওয়াভেলের ডাকা সিমলা রাজনৈতিক সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে দেশবাসীর মধ্যে কিছুটা হতাশা দেখা দেয়। অতীতের দু' তিনটে বছরে ('ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়সীমায়) ফলপ্রসূ কোনো অবস্থা-ই ভারতের সাধারণ মানুষ দেখতে পায়নি ; সিমলা চুক্তির পরিণতি দেখে তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কংগ্রেসের বক্তব্য হলো—মুসলিম লীগ আর মিঃ জিন্না যত্তোসব অনিষ্টের মূল ; মুসলমান মুসলমান করে আর দ্বি-জাতি তত্ত্বকে সমানে সামনে তুলে ধরে মূল ব্যাপারটাকেই কেঁচে দিয়েছে। মিঃ জিন্নার বক্তব্যে অধিকতর ক্ষিপ্রতা ব্যক্ত হতে থাকে—তাঁর গোঁ কিছুতেই যাচ্ছে না—কংগ্রেস তো হিন্দুদের দল, তাদের সঙ্গে মুসলমানরা থাকবে কী করে! গান্ধীজী চমৎকারভাবে নিরামিষাশী বক্তব্য তুলে ধরলেন—হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বা কংগ্রেস-লীগের মতান্তরকে ব্রিটিশরাই মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দিক ; আর সমগ্র ব্যাপারটা দেখে স্বাধীনতাকামী সাধারণ

মানুষ নিজেদের অসহায় ভাবা ভিন্ন অন্য কিছু সামনে দেখতে পায়নি। কমিউনিস্ট পার্টি স্বল্প ক্ষমতা নিয়ে এগোতে গিয়ে তাদের অবস্থা 'ন যযৌ ন তস্থৌ'; জওহরলাল নেহরু তো বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থিত করে চলেছেন। বস্তুত কমিউনিস্ট পার্টি তো সেখান থেকেই কাজ চালিয়ে চলছিলো যেখান থেকে বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়েছিলো। ইত্যবসরে নেহরুজীর সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপতিদের একাধিকবার মোলাকাত ঘটেছে ; তিনি ভাবতে পারেননি এই ক'টা বছরে কমিউনিস্টরা সাধারণ মানুষের কাছে এতোটা পৌঁছে যেতে পারবে, আর দলটা পাকাপোক্ত একটা ভিতের উপর দাঁড়িয়ে যাবে। এতোদিনে নেহরুজী সাধারণ মানুষের মধ্যে 'বাম বাম' ভাবের একটা ইমেজ গড়ে তুলেছিলেন, এবারে কমিউনিস্টরা তাঁর 'বাড়া ভাতে ছাই' দিতে চলছে ; নিজের ইমেজটা এর ফলে পেল্লায় রকমের ধাক্কা খেতে পারে ভেবে তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। কেরালা, অন্ধ্র, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিস্টরা যেভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানালে অবাক হওয়ার থাকবে না কিছুই, কেননা এখানে ভিড়তে শুরু করেছে যে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক ; এ. আই. টি. ইউ. সি. আর এ. আই. এস. এফ.-এর মধ্যে কমিউনিস্টরাই অগ্রণী।

এ প্রসঙ্গে ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ বলেন :

> এটা বিশেষভাবেই বলতেই হবে,—কংগ্রেস কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার তো চালাচ্ছেই, সেই সঙ্গে আবার সংগঠিত আকারে অন্য আব সব ব্যবস্থাও নিচ্ছে। এ আই টি ইউ সি এবং এ আই এস এফের মতো গণসংগঠনে কমিউনিস্টদেরই অগ্রণী ভূমিকা। এই সব সংগঠনের পাল্টা সংগঠনরূপে কংগ্রেসের রাজনীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে—এমন সব ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্রসংগঠন তৈরি করতে লেগে গেছে কংগ্রেস এই সময়েই। দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণের অজস্র জীবনসমস্যাবলির ব্যাপার নিয়ে কাজ করবার কথা এই সব গণসংগঠনের। কিন্তু এই সব গণসংগঠনকে ভেঙে চুরে ছারখার করে দিয়ে তাদের জায়গায় কংগ্রেস নিজেদের সংগঠন সব গড়ে তুলতে লেগে গেছে। পরে কংগ্রেসিদের বিবেকে একটুও বাধল না এই কথাটা বলতে যে, শ্রমিক, কৃষক ও অন্য আর সব মানুষের শ্রেণীগত সংগঠনগুলো হচ্ছে কংগ্রেসেরই "লোক জোটাবার সংস্থা।" আজ ট্রেড ইউনিয়নে ও অন্য আর সব গণসংগঠনে যে অনৈক্য বিরোধ বিসংবাদ দেখা যাচ্ছে, তা তো অন্য আর সব পার্টির কংগ্রেসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের দলের "লোক জোটাবার সংস্থা" তৈরিরই কুফল।[২৩]

আমাদের ধন্ধ একটা থেকে যায়, এর জন্যই কি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করেছিলেন?

ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করার পরে অ্যাটলি লেবর পার্টির প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করেন ২১শে আগস্ট, তাঁর মতামত হলো ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হলে তার পূর্বে একটি সংবিধান তৈরী আবশ্যক, আর এই প্রয়োজনে তিনি একটি কনফারেন্স চান ; সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির নির্বাচন করাটা অবশ্য কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হলেন

না, ঘোষণাকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে বড়লাট ওয়াভেলকে লণ্ডনে ডেকে পাঠান। ওয়াভেল ২৪শে আগস্ট লণ্ডনের অভিমুখে দিল্লি ত্যাগ করেন। অ্যাটলি-পেথিক লরেন্স-ক্রিপ্‌স প্রত্যেকের সঙ্গেই ভারতের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে ওয়াভেলের আলোচনা হয়। তিনি 'পাকিস্তান' দাবী সম্পর্কে তাঁদের কাছে মতামত চাইলেন এবং বুঝাতে সক্ষম হলেন যে শুধু স্বাধীনতা দেয়াটাই সমস্যার সমাধান নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিবিধ সমস্যা ভারতকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে—সামান্য জড়ি-বুটি সেখানে কোনো সমাধান ঘটাতে পারবে না; তাই ভারতকে স্বাধীনতা দেয়ার পূর্বে অন্যান্য বিষয়গুলির সমাধান একান্তই আবশ্যিক। ১৯শে সেপ্টেম্বরে ওয়াভেল ব্রিটিশ সরকারের নীতিমালা ঘোষণা করেন, প্রাধান্য পেলো কেন্দ্রীয় পরিষদ, প্রাদেশিক বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ। সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদ গঠন এবং তাদের কার্যকর ভূমিকা পালনে সাহায্য করা, আর ব্রিটেন-ভারতের মধ্যে যে সন্ধি বা চুক্তি হবে তার শর্তগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বড়লাট জানালেন । তবে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন দলগুলির গ্রহণযোগ্য শাসন পরিষদ গঠন হবে ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছার নিদর্শন। ভারত সচিব ৪ঠা ডিসেম্বরে হাউস অব লর্ডসে বক্তৃতার মাধ্যমে জানালেন যে ভারতের জন্য ব্রিটেনের সকল দলের সদস্যদের নিয়ে একটা পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল গঠন করা হবে এবং তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উপস্থিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতাদানের বিষয়টির সঙ্গে—কি করে স্বাধীন ভারত কমনওয়েলথ-এর মধ্যে থাকবে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং ভবিষ্যত সিদ্ধান্তের উপযোগী কথাবার্তা চালাবেন। সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে সামনে রেখে ধরে নেয়া যায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে ডিসেম্বরের শেষ সাধারণ নির্বাচন হলো ; আর নির্বাচনের ফলাফল হলো এরকম।

কংগ্রেস	মুসমিল লীগ	ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট	আকালি	ইউরোপীয়[২৪]
৫৭	৩০	৫	২	৮

হিন্দু এলাকাতে কংগ্রেস এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে লীগ নির্বাচনে জয়ী হয়। পরবর্তীতে বিধানসভাগুলির ক্ষেত্রেও ফলাফল প্রায় একই রূপ ধরলেও বিশেষত্ব হলো এই যে, সিন্ধু ও বাংলা ব্যতীত লীগ অন্য কোথাও সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ব্রিটিশ সরকারের ঘোষণা অনুসারে দশ জন সদস্যের পার্লামেন্টারী বোর্ড ৫ই জানুয়ারি ভারতে আসেন এবং তাঁদের নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক রবার্ট রিচার্ডস। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে আলোচনায় তাঁরা জানেন যে, মিঃ জিন্নার বক্তব্য হলো সংবিধান রচনায় দুটি সংস্থা গঠনের—অবশ্যই দুটি সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর দাবী পৃথক পৃথক সংস্থা গঠনের। মিঃ জিন্না আরো বলেন যে, পাঞ্জাবের হিন্দু প্রধান জেলাগুলো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত না হলে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না। জওহরলাল নেহরু বোর্ডকে জানালেন, ব্রিটিশ সরকার ভাগাভাগি যদি করেন-ই তবে অবশ্যই সীমান্তবর্তী জেলাগুলির অধিবাসীদের যেন এই অধিকার দেয়া হয় যে, তারা ভোট দিয়ে নিজেদের অবস্থান ও মতামত ব্যক্ত করতে সুযোগ পান। লর্ড ওয়াভেল লণ্ডনের পরামর্শ মোতাবেক ২৮শে জানুয়ারি (১৯৪৬) ঘোষণা করেন যে তিনি নতুন কার্যনির্বাহিক পরিষদ গঠন করবেন এবং একটি সংস্থা হবে যাঁরা কাছাকাছি সময়ের মধ্যেই

সংবিধান রচনায় তৎপর হবেন।

একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাটা অনেকখানি থিতু হয়ে পড়ার মুখেই ব্রিটিশরা যুদ্ধবন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের ব্যবস্থা করে এবং খুবই বেয়াক্কেলের মতো তারা লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন জন শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তার বিচারের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভাবতে পারেনি যে তাঁদের বিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে অভাবনীয় উন্মাদনা সৃষ্টি হতে পারে।

ওয়াভেলের ব্রিটিশ স্বার্থবাহী কর্মচারীরা প্রায় ২০ হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে ৭ হাজার জনকে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত করে এবং তাঁদের অনেককে চাকরি থেকে বরখাস্ত, কাউকে শাস্তির মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া, আর কয়েকশ জনকে বেছে নেয় হলো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য। প্রকাশ্যভাবে তারা যে তিনজনের নাম ঘোষণা করলো তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শাহনওয়াজ, সেহ্‌গাল এবং ধীলন; একজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত, একজন হিন্দু, অবশিষ্ট জন শিখ। বিচারপর্বে দেখা গেল, অভিযুক্তদের পাশে দাঁড়ালেন বহু দিনের পরে ব্যারিস্টারের শামলা গায়ে চাপিয়ে জওহরলাল নেহরু, ভুলাভাই দেশাই এবং তেজবাহাদুর সাপ্রু। সময়টা ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাস, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পত্রিকাগুলো অভিযুক্তদের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে সম্পাদকীয় লিখতে শুরু করে ; ফলশ্রুতি ভারতের সর্বত্র এই দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি সাধারণ মানুষ জ্ঞাপন করে। বাংলার পত্রিকাগুলিও চুপ করে থাকেনি, বিশেষত আনন্দবাজার পত্রিকা পূর্বের মতোই গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। আশ্চর্যের হলো, ব্রিটিশের অভিযুক্ত তিন জন ধর্মীয় দিক থেকে তিনটি ধর্মের হলেও সম্মিলিতভাবে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের পক্ষে প্রচার শুরু করে। তিনটি রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যেই 'বন্দী বিচার'-কে সামনে রেখে গড়ে ওঠে সৌভ্রাতৃত্ব ভাব, যদিও পরবর্তীতে এটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে স্বল্পস্থায়ী এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভারতের ইতিহাসে ছিলো নজিরবিহীন—অতীতের সমস্ত গণ্ডি ছাপিয়ে যায়। এই উদ্দীপনা ছড়িয়ে গেল ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যেও। ব্রিটিশ সরকার বিচলিত হলেন, কেননা আরো গুরুতর সংবাদ হলো লাহোরে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তিপ্রাপ্ত সৈন্যদের সংবর্ধনা সভায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর উর্দি-পরা জওয়ানদেরও দেখা গেছে। বস্তুত এ সময়ে যুদ্ধশেষে ভারতের সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ; জওহরলাল নেহরু থেকে ছোট-বড় সব মাপের নেতারা সভা করে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। তবে জওহরলাল নেহরু আগস্ট আন্দোলনের শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে আর আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের মুক্তি চেয়ে জোরালো বক্তব্য রাখার পাশাপাশি কমিউনিস্টদের আক্রমণ করতে ভুলে যাননি। আশ্চর্যের হলেও সত্য 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী এই সময়ের কমিউনিস্ট কাজ-কর্মকে তিনি মেনে না নিয়ে বরং কমিউনিস্টরা জাতীয় আন্দোলন পরিচালনায় ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করছে বলে ক্রমাগত দোষারোপ করতে থাকেন। ফলটা হলো এই, কোথাও কোথাও ছোটখাটো সংঘর্ষ ঘটতে শুরু হয়ে গেল। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ৫ই অক্টোবরে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও

তাঁদের ডিসেম্বরের এ. আই. সি. সি-তে বহিষ্কার করে।[২৫] লক্ষণীয় বিষয় হলো—এই সময়ে কংগ্রেসে ক্ষমতা বিস্তার করে চলেছেন সর্দার প্যাটেল, রাজাগোপালাচারী ; বিড়লাও বর্তমানে প্যাটেলকে তাঁদের স্বার্থ রক্ষাকারী উপযুক্ত ব্যক্তি বলে বিবেচনা করতে শুরু করে দেয়। সত্যি বলতে কি, ১৯৪৪ থেকেই তো কমিউনিস্টরা বন্দীমুক্তির বিষয়টা নিয়ে জোরদার আন্দোলন চালাচ্ছে এবং এখন তাঁরা তাঁদের এই কর্মপ্রয়াসটি বহাল রেখেছেন, এই অবস্থায় নেহরু-প্যাটেলের কমিউনিস্ট বিদ্বেষী মনোভাব থাকাটা স্বাভাবিক।

২১শে নভেম্বর কলকাতায় ছাত্ররা গণ-বিস্ফোরণ ঘটালো, এখানে কংগ্রেস সমর্থিত, কমিউনিস্ট প্রভাবিত এবং লীগ আদর্শে গড়া ছাত্ররা যৌথভাবে আন্দোলনে নামে; যদিও প্রাথমিক অবস্থায় আন্দোলনের সংগঠক ছিলো কংগ্রেস সমর্থিত-প্রভাবিত ছাত্ররা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে ছাত্ররা এটাকে চিহ্নিত করে মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে পুলিসের গুলিতে ২ জন ছাত্র হত হলো, ধর্মীয় দিক থেকে একজনের পরিচয় ছিলো হিন্দু এবং অপরজন মুসলমান। ২২শে ও ২৩শে নভেম্বরে কলকাতা উত্তাল, এবারে সঙ্গী সাধারণ মানুষ—কলকাতা ও শহরতলীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করলো তারা, শ্রমিকরা ধর্মঘটে শামিল হলো; উল্লেখ্য বিষয় হলো শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার ও ট্রামের কর্মচারীদের ধর্মঘট। ১৪টি স্থানে গুলি চললে নিহত হলো ৩৩ ব্যক্তি এবং আহতের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ২০০ জনের কাছাকাছি ; গাড়ি ভাঙ্গচুর হলো ১৫০-এর অধিক, ৭০ জন ব্রিটিশ নাগরিক এবং ৩৭ জন মার্কিন সৈন্য আহত হলো। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি, সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় পুষ্ট প্যাটেল বোম্বাই-এর এক জনসভায় এই আন্দোলনের নিন্দা করলেন।[২৬] কিন্তু আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে না, ১১-১৩ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা আবার প্রতিবাদে উচ্চকিত, কেননা সরকার যে আবদুল রশিদকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ! এবারে আন্দোলনের সূচনা ঘটায় লীগপন্থী ছাত্র সংগঠন ; কিন্তু অতীতের মতোই পথে নামে ছাত্র-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান। ১২ই ফেব্রয়ারি কমিউনিস্টদের ডাকে কলকাতার শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘট পালিত হলো, আর গান্ধীবাদী নেতা সতীশ দাশগুপ্ত বাংলার মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা সোহরাওয়ার্দীকে এবং সোমনাথ লাহিড়ীকে নিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বড় সমাবেশে ভাষণ দিলেন।[২৭] এ সময়ে ৮৪ জন নিহত হলো এবং আহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল ৩০০তে। পর পর দুটো ঘটনায় কলকাতা অশান্ত হয়ে ওঠার পরে বাংলার গভর্ণর এবং বড়লাট ওয়াভেলের হুঁশ হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের কেন্দ্র করে শুধু কলকাতাতেই নয় ভারতের বড় বড় শহরগুলোতে জনতা এক উন্মাদনায় মেতে ওঠে, প্রতিরোধের বাঁধ দিয়ে ব্রিটিশের কার্যাবলীকে আটকে দিতে প্রতিজ্ঞায় তৎপর হয়ে ওঠে। দিল্লি তো 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাবে ভারতীয়দের পরিচয় প্রোথিত করে, পোস্টার ব্যানারে ছেয়ে যায় দিল্লি। কিন্তু এর পরেই এলো ভারতীয়দের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের উপর আর এক চ্যালেঞ্জ। এটা ঠিক যে ১৯৪৫-এর শেষ দিকটা ভারত অশান্ত হয়ে ওঠে, বড়লাট ওয়াভেল তাঁর রোজনামচায় এটাকে The edge of a Volcano (আগ্নেয়গিরির প্রান্তরেখা) বলে উল্লেখ করেছেন, এবং ৬ই নভেম্বরে তিনি ব্রিটিশ সম্রাটকে জানান যে, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই নেহরু-প্যাটেল-পন্থ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সভাসমিতিতে—এমন কি পত্রিকাতে যে ভাষণ ও বিবৃতি দেন তা

আপত্তিজনক। কিন্তু তখনো ওয়াভেল জানতেন না কতোবড় একটা বিস্ফোরণ ব্রিটিশ শাসকবর্গের জন্য অপেক্ষা করে আছে ; ১৮ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে (মুম্বাই) 'তলোয়ার জাহাজের মাল্লারা 'নৌ-বিদ্রোহ'-এর সূচনা করে।

জানুয়ারি মাসে (১৯৪৬) ভারতীয় বিমান বাহিনীর (R I A F) সদস্যরা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিভেদমূলক নীতি ও আচরণের প্রতিবাদে অর্থাৎ বিদ্বেষমূলক আচরণকে মেনে না নিয়ে ধর্মঘটে মিলিত হয়। পূর্ব হতেই নৌ-বাহিনীর ভারতীয়দের মধ্যে এমন ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিলোই, এবারে তা চাঙ্গা হলো, ইন্ধন পেলো। ব্রিটিশ অফিসারদের তুলনায় ভারতীয় অফিসারগণ বেতনক্রমে পিছিয়ে তো ছিলোই, বর্তমানে খাদ্য পরিবেশনে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায় সামগ্রিক ব্যাপারটা জটিল আকার ধারণ করে, রাজকীয় নৌ-বহরের ভারতীয় নাবিকেরা এই অন্যায় ও বৈষম্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ক্রমশ তাঁদের আন্দোলনটা ছড়িয়ে যায় ভারতের সর্বত্র। বোম্বাইতে অবস্থানকারী ২০টি জাহাজ-ই ধর্মঘটে অংশ নেয়, ধর্মঘট পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হলো কেন্দ্রীয় কমিটি। শান্তিপূর্ণ এই আন্দোলন দমনে নৌ-সেনাধ্যক্ষ গড়ফ্রে গুলি বর্ষণের আদেশ দিলেও মারাঠা সৈন্যরা সে আদেশ পালন করেনি, কিন্তু গড়ফ্রে থেমে থাকেননি। তাঁর নির্দেশে ব্রিটিশ সৈন্যরা ভারতীয় নাবিকদের উপর গুলি চালিয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে প্ররোচিত করে সশস্ত্র বিদ্রোহে যেতে। ভারতীয় নাবিকরাও বসে থাকেনি, প্রায় সাত ঘন্টা ধরে উভয়ের মধ্যে গুলি বিনিময় হলো। জাহাজগুলি থেকে ব্রিটিশ পতাকা নামলো, সেখানে উড়ানো হলো কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্টদের পতাকা। এখন আর নৌ-বিদ্রোহ শুধুমাত্র নাবিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বেসামরিক কর্মচারী-শ্রমিক-ছাত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাবিকদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে।

বিদ্রোহের শুরুতেই কর্তৃপক্ষ হুমকি দিয়ে এবং নাবিকদের একটি অংশকে বন্দী করে আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়ে হিতে বিপরীত করে বসে। 'নীলম', 'কলাবতী', 'নাসিক', 'অবাধ' এবং আরো বেশ কয়েকটি জাহাজের নাবিকদের মধ্যে কিছু অংশ বন্দী হলো, আর বাদবাকিদের প্রকাশ্যে অপমান করে সরকারী নির্দেশ অনুসারে ব্রিটিশ সৈন্যরা। 'তলোয়ার' জাহাজের সবাইকে কাজে যোগদানের সরকারী হুকুম এলে এই নাবিকদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে 'রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি' সাহায্যে এগিয়ে আসে ; 'লাহোর', 'ফিরোজ', 'আকবর', 'মছলিমা' প্রভৃতি জাহাজগুলোও বিদ্রোহীদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করে। ১৯-২১শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে, ২২ তারিখে বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থনে 'রয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স'-এর ২০০ জন কর্মী দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কর্মবিরতি করে। করাচীর 'হিন্দুস্তান' জাহাজের বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরকারী সৈন্যের ২৫ মিনিট গোলাগুলি বিনিময়ের পরে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। এই দিন মধ্যরাতে কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃত্ব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন, মিঃ জিন্নাও অনুরূপ নির্দেশ দেন লীগ সমর্থনকারী বিদ্রোহী নাবিকদের। বিদ্রোহীদের সমর্থনে অরুণা আসফ আলীর চেষ্টা কোথাও সমর্থন পেলো না। এ বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতির নিজের বক্তব্য হলো :

> আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে কোনো গণ আন্দোলন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এটা উপযুক্ত সময় নয়। এখন আমাদের ঘটনা প্রবাহের দিকে নজর রেখে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া দরকার। সুতরাং আমি মনে করেছিলাম যে ভারতীয় নৌবাহিনীর

অফিসারদের পক্ষে থেকে এটা ভুল চাল হয়েছে। জাতি বৈষম্যের দরুন দুর্ভোগ, এটা শুধু তাদের একার নয়; সেনাবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর সমস্ত অংশেরই এই এক বালাই। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তারা ঠিক করেছে কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামাটা আমার মতে সমীচীন হয়নি।

শ্রীমতী আসফ আলী নৌ-অফিসারদের পক্ষ নেন এবং তাদের ঘোরতর সমর্থক হন। আমার সমর্থন আদায়ের জন্যে তিনি দিল্লি আসেন। আমি তাকে বলি যে অফিসাবরা সুবিবেচকের মতো কাজ করেনি এবং তাদের কাছে আমার পরামর্শ হল তারা নিঃশর্তে কাজে ফিরে যাক। বোম্বাই কংগ্রেস টেলিফোনে আমার উপদেশ চায় এবং আমি তাদের সেই একই কথা একটি তারবার্তায় জানাই। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তখন বোম্বাইতে এবং তিনিও আমার মত জানতে চান ! আমি তাঁকে বলি যে নৌ-অফিসাররা ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তাদের কাজে ফিরে যাওয়া উচিত। সর্দার প্যাটেল জিজ্ঞেস করেন যে সরকাব যদি তাদের কাজে ফিরে যাওয়াব সুযোগ না দেয় সেক্ষেত্রে কী করণীয় হবে। তার উত্তরে আমি বলি যে আমি পরিস্থিতি যেরকম বুঝছি তাতে মনে হয তারা ফিরে যেতে চাইলে সরকারের আপত্তি হবে না। সরকার যদি কোনোরকম বাদ সাধে তখন আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।[২৮]

লীগ নেতা চুন্দ্রীগড়, কংগ্রেস নেতা এস. কে. পাতিল নিজ নিজ দলের পক্ষে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকারকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। গান্ধীজী RIN বিদ্রোহীদের সমর্থন তো করলেন-ই না, বরং উলটো গাইলেন, কেননা ভারত স্বাধীন হলে সেনারাও তো ভারতের অধীনেই থাকবে ; আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ যদি তারা হারিয়ে বসে তবে সেটা তো স্বাধীন ভারতের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে। অতএব, গান্ধীজীর সমর্থন নয়, তিরস্কারই নাবিকদের প্রাপ্য—এটা তিনি প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন। লাডলীমোহন রায়চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেন :

আজাদ হিন্দ ফৌজেব কোর্ট মার্শাল-করা সেনা ও RIN বিদ্রোহীর দল—উভয়েই ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ-ই কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের কাছে সুবিচার পায়নি। অবশ্য নির্বাচনের চাপের মুখে কংগ্রেসকে বন্দী ফৌজি সেনাদের সপক্ষে সামরিক আদালতে সওয়াল করতে হয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস আজাদী সেনাদের কাউকেই সেনাবাহিনীতে পুনর্নিয়োগ করেনি। আর RIN বিদ্রোহীদের তো প্রকারান্তরে কংগ্রেসই আত্মসমর্পণ করতে প্ররোচিত করেছিল। আজাদী সেনারা কংগ্রেসের কাছ থেকে যৎকিঞ্চিৎ যা পেয়েছিল RIN বিদ্রোহীরা তাও পায়নি—এটাই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।[২৯]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৭৫
ভারত স্বাধীন হল : মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রাগুক্ত : পৃঃ ১১৩
ভারত স্বাধীন হল : মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রাগুক্ত : পৃঃ ১১১
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৮৭
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস : প্রাগুক্ত · পৃঃ ৩৮৮
. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত : পৃঃ ২৬৯
. নেতাদের মধ্যে তিনি নেতাজি · পবিত্রকুমার ঘোষ : বর্তমান (বিশেষ ক্রোড়পত্র) . ২৩শে জানুয়ারি, ১৯৯৭
. আরাকানে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা : অতীশ দাশগুপ্ত : আজকাল (বিশেষ ক্রোড়পত্র) : ২৩শে জানুয়ারি,
. 'প্রিয় সম্পাদক'-এ প্রকাশিত একটি চিঠি : ওসিউর রহমান : আজকাল (দৈনিক পত্রিকা) : ২৩শে জানুয়ারি,

রাজনীতিতে ধর্ম : গণহত্যা

নৌ-বিদ্রোহ বন্ধ হলো। ভারতে ওয়াভেল অ্যাণ্ড কোং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্লাইভদের মতো নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বিদ্রোহটা যে ভারতের চারদিকে নতুন কবে সাধারণদের অসাধারণ করে তোলার চেষ্টা করছে। যতোই বশংবদরা আশ্বাস দিক না কেন ১০ তারিখে ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর (বন্দী আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন) বিচারকে সামনে রেখে নষ্ট করতে সমর্থ বললে যে কম করে বলা হয় একথা গভর্ণর কেসি বা বড়লাট ওয়াভেল বুঝেছিলেন। ১২ তারিখে সন্ধ্যার পূর্বেই পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়দের উপর বিশ্বাস হারান কর্তৃপক্ষ, তাই তাদের তুলে নিয়ে রাত আটটায় পথে নামানো হলো ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে—যারা ব্রিটেনের স্বার্থটাই দেখবে। গভর্ণর কেসি বেতারে ঘোষণা করলেন সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনে গুলি চালনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[১] এক অসম খণ্ডযুদ্ধে গুলি চালিয়ে (ইট-পাটকেলের বিরুদ্ধে রাইফেল, টৌমিগান ব্যবহার করে) ব্রিটিশ সৈন্যরা রাজপথ দখল করলেও ছোট রাস্তা, অলি-গলি ছিলো জনতার নিয়ন্ত্রণে।

> ১২ই ফেব্রুয়ারি রাতে কলকাতাস্থিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের সহকারী ডিরেক্টার বেভেরীজ দিল্লির স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জরুরী বার্তা পাঠিয়েছিলেন : "অবস্থা খুব বিশ্রী ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগ্নেয় বিস্ফোরণের মত বিক্ষোভের ব্যাপ্তি ঘটেছে। বিক্ষোভকাবীরা সমস্ত যানবাহন আটকে দিচ্ছে—বিশেষত যেগুলি ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের টহলের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৭টি সাঁজোয়া গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। মহানগরীর প্রধান রাস্তাগুলি জনতা অচল করে দিয়েছে নানা ধরনের ব্যারিকেড তৈরী করে।"[২] ["সিচুয়েশন রিপোর্ট. কলকাতা : গোপনীয়," স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক), ফাইল নং . ৫/২২/৪৬, ভারতের জাতীয় লেখ্যাগার (আর্কাইভস্)]

এ দিনেই গভর্ণর কেসি চিন্তামুক্ত হতে না পেরে বড়লাট ওয়াভেলকে তারবার্তা পাঠালেন "সর্বাপেক্ষা জরুরী" শিরোনাম দিয়ে। এই তারবার্তায় তিনি বলেন যে, সন্ধে সাড়ে ছ'টায় তিনি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর আঞ্চলিক কমাণ্ডার জেনারেল বুচার, ব্রিগেডিয়ার গিবন্সের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং পুলিস কমিশনারের সঙ্গেও কথা বলে অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীকে প্রয়োজনীয় কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩] কিন্তু ১৩ তারিখে কলকাতার সামরিক গোয়েন্দা শাখাও দিল্লির সদর দপ্তরে ক্রমান্বয়ে চারটি গোপন তারবার্তা পাঠায়, যাতে তাদের উদ্বেগ লক্ষণীয়, কলকাতাকে যে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে ১৩ তারিখেও সক্ষম নন—সে বিষয়টির উল্লেখের পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সহ আহত-নিহত মানুষদের কথা থাকে। গান্ধীজী, নেহরু, মিঃ জিন্না, মৌলানা আজাদ এসময়ে জনগণকে শান্ত থাকতে পরামর্শ দেন এবং বাংলাতে সোহরাওয়ার্দী ওয়েলিংটনে বাধ্য হয়েই ছাত্রদের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ; জাতীয় কংগ্রেসের নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত বক্তব্য রাখেন। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সংগ্রামের কথা বিভিন্নভাবে সমাবেশে উল্লেখ করেন যথাক্রমে ননী ভট্টাচার্য, গুণদা মজুমদার, সোমনাথ লাহিড়ী, মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদেব বিচারে কলকাতা উত্তাল হলো এবং গোটা ভারতকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে প্রেরণা দিলো, ১৩-১৮ই ফেব্রুয়ারি ঢাকাতে হরতাল হলো ; বোম্বাই,

করাচী, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লি, আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, নাগপুর, পুণাতে ১৩ এবং ১৪ তারিখে ধর্মঘট হলো এবং মিছিলকারীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, আর এই সব স্লোগানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের আহ্বানও থাকে।" কিন্তু ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এবং মুসলিম লীগের কর্মকর্তাদের এই আন্দোলনের প্রতি কতোটা আত্মীক সম্পর্ক ছিলো সে বিষয়টি অধ্যাপক অতীশ দাশগুপ্ত তথ্য-প্রমাণ দিয়ে এভাবে উপস্থিত করেন :

> কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র অরুণা আসফ আলী—১৯৪২ সালেব 'ভাবত-ছাড়ো' আন্দোলনের স্বনামধন্যা নেত্রী—১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেব কলকাতার গণ-অভ্যুত্থানের সপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। (১৫ই ফেব্রুয়াবি ১৯৪৬ তারিখে নাগপুরে অরুণা আসফ আলি প্রদত্ত ভাষণ, অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)
>
> মুসলিম লীগের নেতাদের অবস্থা ছিল দুর্ভাগ্যজনক। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির বিচার মুসলমান ছাত্র সমাজকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেই ব্রিটিশ-বিরোধী আবেগের পরিবেশে মুসলিম লীগের নেতারা কলকাতায় ১২ই ফেব্রুয়াবির ঐতিহাসিক সমাবেশ ও মিছিলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভূমিকায় সততার অভাব ছিল। এই রাজনৈতিক অসাধুতার প্রসঙ্গটি স্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছিল তদানীন্তন ইংরেজ পুলিস কমিশনারের গোপন প্রতিবেদনে : "বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন সমাসন্ন বলে সুরাবর্দী মুসলমান যুবসমাজের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারানোর ঝুঁকি নিতে চাননি। তিনি গোপনসূত্রে খবর পেয়েছিলেন যে ১২ই ফেব্রুয়ারির বিশাল মিছিলটিকে সংরক্ষিত এলাকার মাঝ দিয়ে অগ্রসর হতে পুলিস বাধা দেবেনা ডালহৌসী স্কোয়ার পর্যন্ত। এই গোপন তথ্যের সুযোগ গ্রহণ করে সুরাবর্দী মিছিলের পুবোভাগে কিছুক্ষণ অংশগ্রহণ করেন এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ধ্বজাধারী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন সাময়িকভাবে।" [স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) ফাইল নং : ৫/২২/৪৬, ভারতের জাতীয় লেখ্যাগার (আর্কাইভস)][৫]

১৯৪৬-এর ৫ই জানুয়ারি অধ্যাপক রিচার্ডস-এর নেতৃত্বে যে পার্লামেন্টারী বোর্ড ভারতে এসেছিলেন তাঁরাও এই আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। অবশ্য এই প্রতিনিধি দলটি ভারতের বৃহত্তম দুটো রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক আলোচনায় অংশ নিয়ে তাঁদের বুঝতে চেষ্টা করেন। এই সময়ে মিঃ জিন্না ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধান গঠনের জন্য দুটি পৃথক সংস্থা বা সমিতি গঠনের দাবী জানান।

১৯শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাটলি ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে তিনজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত ক্যাবিনেট মিশনকে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতির জন্য অধিক ক্ষমতা দিয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং সেই অনুসারে ২৪শে মার্চে ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যারা ভারতে আসেন। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যারা ভারতে আসার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন ত্যাগ করার পূর্বেই ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তর তাদের কাছে পৌঁছানো তথ্যগুলির মূল বক্তব্য উপস্থিত করে। আমরা দেখতে পাই, ভারত বিভক্তি বা পাকিস্তান সৃষ্টি তখনো খুব গুরুত্বের সঙ্গে তারা দেখেননি, যদিও মিসেস উইন্ট (ফ্রেডা মার্টিন) এবং পেণ্ডেরেল মুনদের পরামর্শ ছিলো মুসলমানদের জন্য একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র দেয়ার,[৬] এবং পাঞ্জাব ও বাংলা থেকে হিন্দু প্রধান

জেলাগুলিকে চিহ্নিত করে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের। তবে একথাও সত্য যে ভাইসরয়ের পবিকল্পনা অনুসারে ইত্যবসরে ভাবতের প্রদেশগুলির নির্বাচন ঘটায় লীগ বা কংগ্রেস উভয়ের সম্পর্কেই একটা স্বচ্ছ চিত্র প্রশাসন ও জনসাধারণের সামনে এসে যায়। বাংলার সম্পর্কেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য।

১৯৪৩-এর ২৪শে এপ্রিল বাংলাতে খাজা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে। তাঁর ১৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বেসামরিক সরবরাহ), তমিজুদ্দিন খান (শিক্ষা), খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন (কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন), নবাব মোশাররফ হোসেন (বিচার ও ব্যবস্থাপনা), খাজা শাহাবুদ্দিন (বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প), খান বাহাদুর জালালউদ্দিন আহম্মদ (জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন), তুলসীচরণ গোস্বামী (অর্থ), বরদাপ্রসন্ন পাইন (পূর্ত ও যানবাহন), তারকনাথ মুখার্জি (রাজস্ব ও রিলিফ), প্রেমহরি বর্মা (বন ও আবগারি), পুলিনবিহারী মল্লিক (প্রচার), যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (সমবায়, ঋণ ও পল্লী দারিদ্র্য) স্থান পেয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) হিসেবে রেখেছেন স্বরাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়।[৭] লক্ষণীয় বিষয় হলো ১৩ জনের মন্ত্রিসভায় ৬ জনই হিন্দু, (তিনজন তফসিলী অন্য তিনজন অ-তফসিলী), তবে এঁরা হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করেন না বা হিন্দুদের নেতৃস্থানীয়ও নন। উল্লেখ্য, ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে প্রজা পার্টির অনেক সদস্যই লীগের সান্নিধ্যে আসেন, আর এই দলছুটের ব্যাপারে ফজলুল হককেই কিয়দংশে দায়ী করা চলে। খাজা নাজিমুদ্দীন প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) হলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের প্রভাবশালী অন্যতম বঙ্গীয় নেতৃত্বের অধিকারী সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভাতে স্থান পেলেও নানা কারণেই তাঁকে মেনে নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে 'পশ্চিমবাংলা' বনাম 'পূর্ববাংলা' এই দ্বন্দ্বের চেয়েও মুখ্য হয়ে ওঠে নাজিমুদ্দীনের স্বজন-পোষণ, আরো ব্যাপক অর্থে ঢাকার নবাব পরিবারই যেন লীগের পার্লামেন্টারী নেতৃত্ব কবজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ; তাঁদের দশজন সদস্য আইন সভায় মনোনয়ন পান এবং নির্বাচিত হন। আর এটাও সত্যি, কেউ ভুলে যেতে পারেননি যে, খাজা শাহাবুদ্দিন খাজা নাজিমুদ্দীনের ভাই। এ সময়ে মুসলিম লীগের মধ্যকার সুবক্তা আবুল হাশিম খাজাদের পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার না হয়ে সংগঠনে বাম বা কমিউনিস্ট আদর্শের আদলেই প্রগতিপন্থী কাজকর্মের মাধ্যমে সংগঠনকে শক্তিশালী এবং রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ করতে তৎপর হন। তাঁর এই প্রচেষ্টা লীগকে বাংলার সাধারণ মুসলমানদের কাছে ধর্মীয় উগ্রতা ব্যতীতই অনেকখানি গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

খাজা নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে জনসাধারণ এবং লীগের মধ্যে দুটি বিষয় খুব বেশী আলোচিত হতে থাকে। প্রথমত—দুর্ভিক্ষ চলাকালীন খাদ্য যোগানে এই মন্ত্রিসভার ব্যর্থতা, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত—অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে স্বজনপ্রীতির রেকর্ড গঠন। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের ভাই মন্ত্রী শাহাবুদ্দিনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন 'শালিমার এণ্ড কোং' একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ব্যক্তিজীবনে খাজা নাজিমুদ্দীন দুর্নীতিমুক্ত হলেও, তাঁর মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য নিজ নামে বা বেনামীতে আর্থিক লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে, অনেকে আবার নিকট আত্মীয়কে অবৈধভাবে সুযোগ-সুবিধে দিতে

থাকেন। ইস্পাহানী কোম্পানী কলকাতায় ব্যবসা চালাতে গিয়ে বাংলা সরকারের কাছ থেকে সোল এজেন্সি নিয়ে নিজের স্বার্থকে মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়। বাংলায় দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণের মধ্যে বিশেষত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গরিব ভূমিহীন কৃষক-নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ দুর্ভিক্ষের ছোঁবলে প্রাণ হারাতে থাকলেও মন্ত্রিসভার সদস্যদের একাংশের লোভ এবং স্বার্থপরতা, দুর্নীতি এবং অমানবিক আচরণ অন্যান্যদের সঙ্গে বিধানসভার সদস্যদের বৃহৎ অংশকে ভাবিয়ে তোলে। অথচ মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও লঙ্গরখানা খুলে এবং রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। খাজা নাজিমুদ্দীন এবং সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার মূল্যবোধে হের-ফের ছিলো : সমসাময়িক সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। মন্ত্রিসভার হিন্দু সদস্যরাও ক্রমান্বয়ে খাজা নাজিমুদ্দীনের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং সমর্থন প্রত্যাহারের চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। ২৮শে মার্চ, (১৯৪৫) বাজেট বরাদ্দকে সামনে রেখে ভোট হলে ১০৬—৯৭ ভোটে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

প্রদেশগুলিতে নির্বাচন হলো মার্চ মাসের (১৯৪৬) মধ্যেই। বাংলা ও পাঞ্জাবের ফলাফল খানিকটা ব্যতিক্রমী হলো। যে সব অঞ্চলে লীগ সাফল্য অর্জন করে সেই এলাকায় বা প্রদেশে লীগ পাকিস্তান দাবীর পক্ষে তৎপরতা বৃদ্ধি করে চলে।

কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে বাংলার অবস্থাটা হলো : কংগ্রেস-৭, লীগ-৬, ইউরোপীয়ানরা-৩, নির্দল-১। ক্ষমতা দখলের কলহে নাজিমুদ্দীন-সোহরাওয়ার্দী যা-ই করুন না কেন, ভোটের পূর্বে কিন্তু তার কোনোই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, অবশ্য মিঃ জিন্না বাংলাতে লীগের ঘরোয়া কোন্দলে সরাসরি কোনো ইন্ধন না দিয়ে যে বার্তা পাঠালেন তা হলো "Pakistan against Akhand Hindustan।" নাজিমুদ্দীন সরকারের পতন ঘটলে বাংলায় যে ৯৩ ধারা দেয়া হলো তাতে লাভটা হলো লীগের। ২৫০ সদস্য সংখ্যা বিশিষ্ট বাংলার আইন পরিষদ নির্বাচনে ফলাফল হলো নিম্নরূপ :

মুসলিম লীগ —	১১৫
নির্দল —	
মুসলিম —	২
মুসলিম শ্রম —	১
কৃষক-প্রজা পার্টি —	৫
তফসিলী (সং) —	২৪
নির্দল তফসিলী —	৫
ইউরোপীয়ান —	২৫
	১৭৭
কংগ্রেস —	৬২
নির্দল হিন্দু —	১
হিন্দু মহাসভা —	১
খ্রীশ্চান —	২

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান —	৪
কমিউনিস্ট —	৩
	৭৩
সর্বমোট —	২৫০

বাংলায় লীগেব ঘরোয়া কোন্দলে নাজিমুদ্দীন কোণঠাসা হয়ে মিঃ জিন্নাকে পুঁজি করতে চাইলেন, অন্যদিকে হামবড়া ফজলুল হক বাংলাব রাজনীতিতে আদৌ হালে পানি পাচ্ছিলেন না। সোহরাওয়ার্দী-হাশিমরা কৃষক-প্রজা পার্টি আর তার নেতাকে বাংলার মুসলিম স্বার্থ বিবোধী বলে প্রচার চালিয়ে সাফল্য লাভে সক্ষম হন। নির্বাচনেব পরে এলো মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্নটি। ২রা এপ্রিলে বাংলার লীগ অফিসে এক সভায় সোহবাওয়ার্দীকে পার্টির পার্লামেন্টারী নেতা নির্বাচিত করে তাঁর সভাপতিত্বে দলীয় খসড়া কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে শামসুদ্দীন আহমেদ, নুরুল আমিন, ফজলুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, আহমেদ হোসেন, হাবিবুল্লাহ চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী, এম. এ. হামিদ এবং আবুল হাশিমকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। বস্তুত এ দিনেই সোহরাওয়ার্দী নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা দলীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমেই খাজা নাজিমুদ্দীনকে দলের মধ্যে 'অকেজো' করার পথটি প্রশস্ত করেন।[৮] বাংলার নতুন গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজ চেষ্টা করেন যাতে বাংলায় লীগ এবং কংগ্রেস যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে, ২রা এপ্রিলেই তিনি সোহরাওযার্দীকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন : কিন্তু সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন— এ কথা স্যার ফ্রেডারিক বারোজকে জানান :

> সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম উভয়েই উপলব্ধি করলেন যে, ১৯৩৭ সাল থেকে হিন্দু সম্প্রদায় বাংলার শাসন ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণ কবতে না পারায় তাদেব মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হযেছে। এর ফলে হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে সম্পর্কেব অবনতি হবে। তাই ১১ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেস পার্লামেন্টারি দলেব নেতা কিবণশঙ্কব রায়কে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখেন। উভয় নেতার মধ্যে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত পত্রালাপ চলে। মুসলিম লীগের খাজা নাযিমুদ্দীনের সমর্থক উপদল ছিল। খাজা গ্রুপ যুক্ত, মন্ত্রিসভা গঠনেব প্রস্তাবকে মুসলমানদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে প্রচাব চালায়। গভর্নর বারোজ যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। সোহরাওয়ার্দী অনুপ্রাণিত হয়ে দিল্লিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কোলকাতা ও দিল্লিতে উভয় দলের মধ্যে আলোচনা চলে।[৯]

বস্তুত ভেস্তে গেল বাংলার লীগ-কংগ্রেস যৌথ মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ যে সব শর্তাবলী দিয়েছিলেন লীগের পক্ষে তা পালন করা বা নীতিগত-ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু মৌলানা আজাদের শর্তগুলোকে অবাস্তব বা অভিসন্ধিমূলক বলা চলে না, যদিও লীগের একটি অংশ মৌলানা আজাদের দেয়া শর্তগুলিকে মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে প্রচার চালাতে শুরু করে। লীগ ও কংগ্রেসের (মিঃ জিন্না এবং মৌলানা আজাদের মধ্যকার একগুঁয়েমীপনা) দ্বন্দ্বই এক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। সোহবাওয়ার্দী লীগ ও কংগ্রেস নেতাদ্বয়েব কূট-বিতর্কে সম্ভবত নিজেকে জড়াতে চাননি, তাই

সহজভাবেই লীগ-কংগ্রেস যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের প্রয়াস থেকে সরে এসে ২৪শে এপ্রিল মন্ত্রীসভা গঠন করেন। উল্লেখ্য, বাংলায় লীগে প্রাধান্য এবং বাংলার মন্ত্রিসভায় এই প্রথম ঢাকার নবাবদের আধিপত্যে ভাটাব টান লাগে, স্বজন-পোষণের মহাকারিগর খাজা নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভা গঠনের কোনো পরামর্শেই থাকেন না। ফলজুল হকের মন্ত্রিসভার সদস্য এবং নাজিমুদ্দীনের মন্ত্রিসভার সদস্য সোহরাওয়ার্দী এবারে ফজলুল হক ও নাজিমুদ্দীনকে ঘায়েল করে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর (মুখ্যমন্ত্রী) আসনে বসেন।

কংগ্রেস নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান মৌলানা আজাদ সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হলে তার কারণ-গুলি সম্পর্কে ধারণা নিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, ব্রিটিশের সঙ্গে স্বাধীনতা দেয়া বা নেয়ার বিষয়টি অগ্রগতি লাভ করতো যদি কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান উপস্থিত করা সম্ভব হতো। তাঁর ধারণা একমাত্র ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান-শিখদের ধর্মীয় অবস্থানে গোঁড়া মানসিকতাই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো, বর্তমানে ক্যাবিনেট মিশন ভারতের স্বাধীনতা প্রদান বিষয়টি সরাসরি উল্লেখ করলেও এবং ঐ কমিটিতে ভারত-হিতৈষী বলে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ থাকলেও বাস্তবে ভারতীয়দের উগ্র ধর্মান্ধতায় শেষটায় ক্যাবিনেট মিশনের প্রচেষ্টা ভেস্তে না যায়। তিনি এমন একটা পন্থা উদ্ভাবনে ব্রতী হলেন যাতে স্বাধীনতা লাভে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। প্রকৃতপক্ষে মৌলানা আজাদ নিজেও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন 'পাকিস্তান' হাসেল হলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হবে না, বরং নোতুন নোতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে ভারতকে—ভারতের স্বাধীনতাকে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এক অচলায়তনের দিকে ঠেলে দেবে। উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিষেধক কখনোই 'পাকিস্তান' হতে পারে না। ক্যাবিনেট মিশনের সামনে উপস্থিতির পূর্বেই তিনি নিজের মধ্যে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করেন।

> আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, যা আমাদের সমস্যা তাতে ভারতের সংবিধানকে স্বভাবতই যুক্তরাষ্ট্রীয় হতে হবে। তাছাড়া, এমনভাবে তা রচনা করতে হবে যাতে প্রদেশগুলির পক্ষে স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির সঙ্গে জাতীয় ঐক্যের দাবিকে আমাদের মেলাতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা আর কাজকর্মের বণ্টনের ব্যাপারে একটি সন্তোষজনক সূত্র বার করলেই এটা সম্ভবপর। কিছু ক্ষমতা এবং কাজকর্ম মূলত কেন্দ্রীয় হতে হবে, অন্যগুলো হবে প্রধানত প্রাদেশিক এবং সম্মতিসাপেক্ষে হয় প্রাদেশিকভাবে অথবা কেন্দ্রীয়ভাবে কিছু পরিচালিত হবে। প্রথম ক্ষেপেই একটি সূত্র নির্ধারণ কবতে হবে যাতে করে একটি ন্যূনতম সংখ্যক বিষয়াবলীকে মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হিসারে ঘোষণা করা যায়। এই বিষয়গুলো বাধ্যতামুলকভাবে ইউনিয়ান সরকারে বর্তাবে। এছাড়া তালিকাভুক্ত কয়েকটি বিষয় থাকবে যা প্রদেশগুলি ইচ্ছা করলে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হবে। একে বলা যেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ঐচ্ছিক তালিকা এবং কোনো প্রদেশ ইচ্ছা করলে এই তালিকাভুক্ত সমস্ত অথবা যেকোনো বিষয়ের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে পারে।
>
> আমার কাছে এটা স্পষ্ট ছিল যে প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এবং পররাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কেবলমাত্র সর্বভারতীয় ভিত্তিতে যথাযথভাবে পরিচালিত হতে পারে। প্রাদেশিক স্তরে এই বিষয়গুলি হাতে রাখতে গেলে গোটা উদ্দেশ্যই পণ্ড হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আদত ভিতটাই

ধ্বংস হয়ে যাবে। তেমনি অন্য কিছু বিষয় আছে যা স্পষ্টতই প্রাদেশিক দায়িত্ব হবে কিন্তু কয়েকটি বিষয়ের তৃতীয় একটি তালিকা থাকবে যা প্রাদেশিক বিষয় হবে, না কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে প্রাদেশিক আইন সভা।

বিষয়টি নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমার কাছে ক্রমে এটা বেশি করে স্পষ্ট হতে লাগল যে এছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ভারতীয় সমস্যাব সমাধান হতে পারে না। এই মূল নীতিকে আত্মস্থ করেই যদি কোনো সংবিধান তৈরি হয় তাহলে মুসলিম প্রধান প্রদেশে তিনটি ছাড়া অন্য সব বিষয় সেই প্রদেশই যে পরিচালনা করতে পাববে তার নিশ্চযতা থাকবে। এটা হলে মুসলমানদের মনে হিন্দুদেব আধিপত্যেব সমস্ত ভয় ঘুচে যাবে। এই ভয় একবার দূর কবতে পারলে প্রদেশগুলি অন্য আরো কিছু বিষয়ে কেন্দ্রীয় সবকাবের হাতে ছেড়ে দেওয়াব যে সুবিধা আছে, এটা বোঝাবাব সম্ভাবনা হবে। এবিষয়েও আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, এমনকি সাম্প্রদায়িক বিবেচনা ছাড়াও ভারতের মত দেশে এটাই সবচেয়ে ভালো রাজনৈতিক সমাধান।[১০]

৬ই এপ্রিলে মৌলানা আজাদ ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের মতামতের ব্যাখ্যা দেন। ১২ই এপ্রিলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনি নিজের মতামতকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন, ফলশ্রুতি গান্ধীজী সহ নেহরু-প্যাটেলকে নিজের বক্তব্যের অনুকূলে আনতে সক্ষম হন। তিনি একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন ১৫ই এপ্রিলে (১৯৪৬) যার অন্তস্তলে থাকে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের—বিশেষত মুসলমান কংগ্রেস কর্মীদের—এমন কী লীগপন্থী বিবেচনাসম্পন্ন সাধারণ মানুষদের সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং রাজনীতিকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতার প্রশ্নটি। আর তাঁর এই বিবৃতিটির আদ্যপান্ত জড়িয়ে থাকে যুক্তির সাহায্যে 'পাকিস্তান' দাবীকে অস্বীকার করার প্রচেষ্টা এবং অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা লাভে মুসলমান জনজীবনের সম্মতি আদায়ের লক্ষ্যে বাস্তবধর্মী যুক্তির সঙ্গে আবেগ-মিশ্রিত প্রস্তাবনা।

ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যবৃন্দ মৌলানা আজাদের বক্তব্য শুনলেন, কিন্তু সরকারী তরফে অর্থাৎ ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে তাঁদের তো সরকারী মনোভাবের পাশাপাশি ভারতের সাম্প্রদায়িক অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়া হয়েছিলো। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা দপ্তর এ ব্যতীত অন্য কিছুও ভাবছে,—অখণ্ড স্বাধীন ভারত হলো ব্রিটেনের পক্ষে সবদিক রক্ষাকারী ব্যবস্থা যাতে স্বাধীন ভারতেও ব্রিটিশ স্বার্থ পরোক্ষভাবে রক্ষিত হতে পারে। কিন্তু মিঃ জিন্না স্বাধীনতার বিষয়টিকে সেভাবে মানবেন না, মুনের মতো অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে মিঃ জিন্না কখনোই সহমত দেখাবেন না; বরং 'পাকিস্তান' দাবী মেনে নিলে অনেকগুলো বিষয়ে সমঝোতায় আসতে মিঃ জিন্নাকে সম্মত করা সহজ হবে। তবে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রশ্ন ছিলো আরো গভীরে, পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করেই যদি ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হয় তা হলে বাংলার পূর্বাংশ নিশ্চিতভাবেই দুর্বল হবে—এই পূর্বাংশ সম্পর্কে তার স্থায়িত্ব বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রতিরক্ষামূলক কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? ক্যাবিনেট মিশন পূর্বাহ্ণেই ব্রিটিশ সেনাপতিদের মনোভাব জানলো :

There should co-ordinated machinery for defence of geographical India, and that there should be a single common defence authority with whom H.M.G. could deal.[১১]

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি জানতেন ভারতকে স্বাধীনতা দেয়া এবং ব্রিটিশ স্বার্থ একই সঙ্গে রক্ষিত না হলে তাকেও সমালোচিত হতে হবে, তিনি ভবিষ্যতে সমালোচনার মুখে নিজেকে এবং লেবর পার্টিকে দাঁড় করাতে ইচ্ছুক নন। বস্তুত ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসার পূর্বেই ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দ—স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভারতের পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের রূপরেখা নিরূপণে যত্নবান হলেন। তাঁরা ভারতে এসেও ভাইসরয় ওয়াভেল এবং বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হন। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে এবং ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে ভারতে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মতামত পেলেন, উল্লেখ্য—গ্লান্সি-ওয়াইলি-কেসি তো ছিলেনই এই দলে। উপরন্তু কেসি-র পরিবর্তে বাংলার দায়িত্ব নিয়ে আসা নয়া গভর্ণর স্যার বারোজও প্রস্তাব দেন পৃথক তিনটি যুক্তরাষ্ট্রের—তাদের প্রতিটির থাকতে হবে আলাদা সংবিধান এবং সবার উপরে তিনটি যুক্তরাষ্ট্রকেই জড়িয়ে থাকবে Super Constituent Assembly।[১২] এসব চিন্তা-ভাবনা থাকলেও প্রত্যেকের মনেই শঙ্কা ছিলো মিঃ জিন্না তাঁর দাবী থেকে এতটুকু সরবেন কি? ক্যাবিনেট মিশনের সদস্য মিঃ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স এবারে মৌলানা আজাদের সঙ্গে কথা বললেন, গান্ধীজীর কাছে নিজে গেলেন এবং মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেন। ক্রিপ্‌স মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় নিশ্চিত হলেন যে 'পাকিস্তান' দাবী থেকে তাঁকে নড়ানো কষ্টকর ব্যাপার—পেল্লায় গোঁজ গেঁড়ে বসে আছেন পাকিস্তান ধরে ; মিঃ জিন্না প্রতিরক্ষার উপর গুরুত্ব দিলেন সর্বাধিক এবং বলেন যে, পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে পাকিস্তানকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মুসলিম লীগকে সামনে তুলে নিজের মতামতটা এভাবে গোঁজিয়ে তুললেন, 'পাকিস্তান' আর 'হিন্দুস্থান' এই দুটো সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চুক্তি হওয়া সম্ভব—তা হতে পারে প্রতিরক্ষা, বিদেশ সংক্রান্ত, যোগাযোগ ইত্যাদি।[১৩]

ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে, আর এজন্যে অবশ্য প্রয়োজন সংবিধান রচনার—যা দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারে ; সংবিধান রচনায় অনেকটা সময় লাগবে বলেই প্রশাসন পরিচালনার জন্যে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আশু প্রয়োজন—ক্যাবিনেট মিশন বিষয়টিকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতিতে আগ্রহী হলো। মিশন সদস্যরা এপ্রিলের (১৯৪৬) ১-১৭ পর্যন্ত নানাজনের সঙ্গে, ভারতের রাজনৈতিক মুরুব্বীদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন, মোট ১৮২টির মতো বৈঠক করে বসেন তাঁরা এবং সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও নথি-পত্র বগলদাবা করে সপ্তাহ খানেকের জন্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা প্রয়াসে কাশ্মীরে যান। ২৪শে এপ্রিলে মিশন সদস্যরা ফিরে এসেই নিজেদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুটো কাজে হাত দিলেন, প্রথমত লীগ-কংগ্রেস উভয়কেই চিঠি দিলেন, দ্বিতীয়ত কতগুলো নীতি নির্ধারণ করে সেগুলিকে কংগ্রেস-লীগ নেতৃত্বের দ্বারা অনুমোদনের ইচ্ছায় সিমলাতে বৈঠক ডাকার কথাটা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু মিশন সদস্যরা ভাবলেন না যে তাঁদের গৃহীত নীতিগুলো ভারতের বড়ো দুটো রাজনৈতিক দলের কাছে কতোটা গ্রহণযোগ্য হবে। মূলত তা হয়নি। মৌলানা আজাদ কিছুটা নরম সুরে গাইলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাগড়া দিয়ে বসে;

তা বলে তাঁরা কিন্তু সিমলা না গিয়ে থাকেননি। কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই সিমলা গেল, আলোচনাও হলো। কিন্তু কোনো সমঝোতায় পৌঁছানো গেল না। সব দেখেশুনে ক্যাবিনেট মিশনের ঝানু সদস্যদের আক্কেলগুড়ুম, তাঁরা মূল প্রস্তাবটাকে ঠিকঠাক রেখে এবং কিছুটা এদিক-ওদিক করে সাজালেন ; তাহলেও কংগ্রেস-লীগ কারোর কাছেই সেটি গ্রহণযোগ্য হলো না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং মিঃ জিন্নাকে এক টেবিলে বসিয়েও মিশন সুফল পেলো না। ভাইসরয় ওয়াভেল বিপদের গন্ধ পেলেন, এখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি,' কংগ্রেস যে চাইছে অখণ্ড সার্বভৌম ভারত, কিন্তু লীগ (মিঃ জিন্না) তো নাছোরবান্দা—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের জন্য স্বতন্ত্র দুটি সংবিধান প্রণযন সভা তাদের চাই-ই।

সদ্য ডানা গজানো কমিউনিস্ট পার্টিও এ সময়ে বেশ বড়ো ধরনের একটা প্রস্তাব রাখে। তাঁদের বক্তব্যের মূল ছিলো বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে সামনে রেখে জাতিসত্তাকে স্বীকার করে নেয়ার এবং স্বায়ত্তশাসন দেয়ার। তবে কেন্দ্র একটা থাকবে এবং কেন্দ্রটা মোড়লীপনা না করে নির্দিষ্ট ক্ষমতার মাধ্যমে প্রদেশগুলিকে যোগসূত্রে গ্রথিত করে রাখবে। একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কেন্দ্রের হাতে থাকবে মূলত পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অনেকটাই যেন ক্যাবিনেট মিশনেব দেয়া ক্ষমতাগুলির উল্লেখ মাত্র। কংগ্রেস-লীগ কেউ-ই কমিউনিস্ট পার্টির ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিসত্তাকে মেনে নিতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যকে ছেড়ে দিলেও দেখা যায় কংগ্রেস চাইছে অখণ্ড ভারতে প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসন লাভ করেলেও তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে থাকবে—তা মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশ হলেও ; কিন্তু লীগ তো তার বিপরীতে উচ্চগ্রামে সুর তুলে বসে আছে।

এপ্রিল মাসটা-ই ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা আলাপ-আলোচনায়, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দিল্লি তো অনেক দূর! তরুণ লীগ নেতা নবাব এম. এ. গুরমানির পূর্বেকার দেয়া 'ক্ষুদ্র পাকিস্তান' প্রস্তাব মিশন সদস্যরা দেখলেও মিঃ জিন্নার কারণে এগোয়নি। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মিশনের উদ্যোগে লীগের মিঃ জিন্না, লিয়াকত আলী খান, ইসমাইল খান, আবদুর রব নিস্তারের সঙ্গে নেহরু-আজাদ-প্যাটেল ও আবদুল গফ্ফার খান প্রমুখের সপ্তাহখানেক ধরে আলোচনাটাও নতুন মাত্রালাভে ব্যর্থ হলো ; মিঃ জিন্না তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে একমত হলেন যে দুই জোটকেই আইন ও শাসন পরিষদ দিতে হবে, আর তা হলেই লীগ য়ুনিয়নে যোগ দেবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দ্বিধা না করেই জানালেন যে, প্রথমেই য়ুনিয়নে যোগ দিতে হবে এবং গণপরিষদের অধীনে। ব্যাপারটা দাঁড়ালো এরকম মিঃ জিন্না (লীগ) চাইছেন দুই জোটের দুই গণপরিষদে নিজ নিজ তালিকাভুক্ত প্রদেশগুলির এক একটা জোটের সংবিধান হয়ে যাওয়ার পরেই দুই জোট একত্রিত হয়ে য়ুনিয়নের সংবিধান রচনায় হাত দেবে। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে মিঃ জিন্না চাইলেন কোনো জোট বা প্রদেশ য়ুনিয়নের বাইরে যেতে চাইলে অন্তত তাকে পাঁচ বছর য়ুনিয়নের মধ্যে থেকে যেতে হবে (যা পূর্বে বলা হয়েছিলো দশ বছর), পরিকল্পনাটা ছিলো পাঁচ বছরের পরেই লীগ য়ুনিয়ন ছেড়ে গিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান গঠন করার সুযোগ পাবে। কিন্তু নেহরু আর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আপত্তি তোলেন। ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা এর পরে চেষ্টা করেন গান্ধীজীর মতামত গ্রহণের।

৬ই মে সন্ধ্যায় গান্ধীর সঙ্গে মিশনের দেখা হল। গান্ধী বললেন, জোট বাঁধার পরিকল্পনা— "Worse than Pakistan." [মুন (সং) ভাইসরয়জ জার্নাল, পৃঃ ২৬০] হয় কংগ্রেস না হয় লীগ কারুর মত বেছে নিতে হবে— "There was no half way house." গৃহযুদ্ধের ভয়ে তিনি আদৌ বিচলিত নন। ওয়াভেলের মনে হয় প্যাটেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তিনি—যদি সরকার দৃঢ় থাকেন, মুসলিমরা লড়াই করবে না। ৭ই মে হোরেস অ্যালেকজাণ্ডার ও অ্যাগাথা হ্যারিসনের সঙ্গে তাঁর ৬ই মে-র আলোচনা বিষয়ে কথা হয়। গান্ধী হোরেসকে বলেন—ব্রিটেনের রোয়েদাদের প্রশ্নই ওঠে না। অ্যাটলি তো সে সম্ভাবনা বাতিল করে দিয়েছেন। যে পক্ষের মত ন্যায়সঙ্গত মনে হবে তাকেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। প্যাটেল বলেন, মিশন বোধহয় জিন্নার সঙ্গে কোন সমঝোতায় এসেছে। মিশন বলতে চাইছে—''যদি গৃহযুদ্ধ এড়াতে চাও, আমাদের প্রস্তাব নাও। এ তো লীগকে গোলমাল বাধাতে উৎসাহ জোগাবে।[১৪] (মহাত্মা গান্ধী, সম্পূর্ণ রচনাবলী, ৮৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩-৪৬৪)

৭ই মে ক্রিপ্‌স নিজের দেয়া প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন ঘটালেন এবং সংশোধিত প্রস্তাবে কেন্দ্রকে কর বসানোর ক্ষমতা দেয়ার পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলমানদের সমান প্রতিনিধিত্বের উল্লেখ থাকে যুনিয়নের আইন ও শাসন পরিষদে। ৮ই মে প্যাটেল মিঃ ক্রিপ্‌সের সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আপত্তি তুললেন, গান্ধীজীও এটা মানতে পারেননি বলে মিঃ ক্রিপ্‌সকে লিখলেন, 'লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের চেয়েও এটা খারাপ হয়েছে।' মৌলানা আজাদ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৯ই মে ক্রিপ্‌সকে জানালেন যে প্রস্তাবটি সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা জোটবাঁধা আর জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বিচার না করে এ একধরনের সমতার প্রস্তাব মাত্র। মিঃ জিন্না সম্মতি জানালেন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র গণপরিষদের কথা বলতে দ্বিধা করেননি। ১১ই মে-এর পরে মিঃ জিন্না তো ছ'টি মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশকে একটা জোট ধরে তাদের নিমন্ত্রণের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, এবং সংবিধান রচনার পরে তাদের যুনিয়ন থেকে স্বতন্ত্র পথে যাওয়ার অধিকারের প্রশ্ন তোলেন। মৌলানা আজাদ জানালেন—প্রথমটায় গণপরিষদ বসার প্রয়োজন, সংবিধান রচনার কাজ এগিয়ে গেলেই বিবেচিত হতে পারে যুনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটি (মিঃ জিন্নার দাবী), এবং ইতিপূর্বে এই দাবী নিয়ে আলোচনা অবান্তর।

প্রকৃতপক্ষে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষেই ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যারা বুঝেছিলেন যে কংগ্রেসের মোড়ল-মাতব্বরেরা মিঃ জিন্নার (লীগের) দাবীকে অযৌক্তিক মনে করেছেন আর বুনো ষাঁড়ের মতো একগুঁয়েমী সঙ্গী করে ধূর্ত মিঃ জিন্না ভারত যুনিয়ন থেকে পৃথক হয়ে 'পাকিস্তান' গঠনে বদ্ধপরিকর এবং এর জন্য সর্বাধিক মূল্য দিতেও তিনি সম্মত।

> The mission now felt obliged to propose its own settlement a final move in this stalemated game. It had listened to all the arguments, studied all the documents, and questioned all the witnesses. Judgement could be deferred no longer. The prime minister demanded an account of his mission's progress. The cable between Simla and London was kept hot and humming through many a mid-May night. The Labour government seemed almost ready to break apart, if not topple from

power, over the Congress League struggle.[১৫]

মিশনের সদস্যারা বুঝলেন কংগ্রেস-লীগে ঐকমত্য এখন আর সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতাকেই প্রয়োগ করা বুদ্ধিমানের যথোচিত কাজ হবে। ১৬ই মে রাত্রে দিল্লি থেকে মিশনের বক্তব্য বা 'Award' বা হুকুমনামা প্রচারিত হলো। নিশ্চিতভাবেই বলা চলে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার এটাই শেষ বাণী।

মিশনের এই হুকুমনামা বা Award-এ কংগ্রেস খুশি হতে পারেনি, মিশনের বক্তব্য মেনে না নিয়ে কংগ্রেস ভাবছে য়ুনিয়নের সংবিধান রচনায় জোট আবশ্যিক কিনা, লীগ কিন্তু জোটকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ; মিশনের বক্তব্যটা হলো সেকশান ব্যবস্থাটা অবশ্যই জরুরী—ঐচ্ছিকের মধ্যে পড়ে জোটের বিষয়টি। কিন্তু মোদ্দা প্রশ্ন দাঁড়ালো সংবিধান রচনার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠন নিয়ে, যা গঠনে একান্তভাবেই প্রয়োজন হবে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা, বিশেষত কংগ্রেস ও লীগের। ১৬ই মে-র ঘোষণার পরে কংগ্রেস নেতৃত্ব কিছুটা দুশ্চিন্তার শিকার হলো, ১৬-১৮ মে-র মধ্যে ক্রিপ্স এবং পেথিক লরেন্সের সঙ্গে গান্ধীজীর পরপর তিনদিন সাক্ষাৎ ঘটে ; কিন্তু গান্ধীজীও যার-পর-নাই অস্বস্তিতে। তিনি মিশনের Award-এ বর্ণিত কতগুলো বিষয় নিয়ে মিশন সদস্যদের কাছে প্রশ্ন রাখেন। গান্ধীজীর বক্তব্য এবং চিঠিকে কেন্দ্র করে মিশনের সদস্যগণ এবং বড়লাট ওয়াভেল চিন্তিত হন, উপরন্তু মিশনের সদস্যগণ ও ওয়াভেল একমত হয়ে সিদ্ধান্ত দিতে ক্রমশ অপারগ হয়ে ওঠেন ; এ অবস্থায় ভারতে নতুন করে কোনো আন্দোলন হলে তা মিশনের ব্যর্থতাকেই বহন করবে, অন্যদিকে বড়লাট ওয়াভেলকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে জবাবদিহিও করতে হতে পারে। ২৩শে মে বড়লাট ওয়াভেল কংগ্রেসের অনুরোধক্রমে জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কংগ্রেস তো অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে আগ্রহী। ২৪শে মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিলো যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হওয়া উচিত ক্যাবিনেটধর্মী এবং পক্ষান্তরে স্বাধীন। মৌলানা আজাদ ২৫শে মে কংগ্রেসের বক্তব্যকে জানালেন—ডোমিনিয়ান ক্যাবিনেটের মর্যাদাসম্পন্ন সরকারের দাবী উত্থাপন করে। কিন্তু ভাইসরয় ওয়াভেল তো কংগ্রেসের হাতে সরকার ছাড়তে নারাজ, এমনটি হলে মিঃ জিন্নার কথামতো হিন্দুদের হাতেই সরকার গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়, এভাবে সরকার গঠিত হলে ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও গোলযোগ দেখা দেয়া অসম্ভবের নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য চাই কোয়ালিশন ব্যবস্থা—অর্থাৎ লীগকেও মন্ত্রিসভায় যোগদানের সুযোগ দিতে হবে। ভাইসরয়ের ধারণাটা যথার্থ, লীগ তো কংগ্রেস বা গান্ধীজী আর বামপন্থীদের বিশ্বাস করে না, অতএব, মিঃ জিন্না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নামক শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করার সুযোগ না পাক (বিশেষত, বাংলা, বিহার, ইউ. পি., সিন্ধ এবং পাঞ্জাবে) তার ব্যবস্থাও করতে হবে ; গণবিদ্রোহ হলে তাকে এই মুহূর্তে সামাল দেবে কে? মিশনের রিপোর্টেও সে বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় :

> We and our Government and countrymen hoped that it would be possible for the Indian people themselves to agree upon the method of framing the new constitution under which they will live. Despite the labours which we have shared with the

Indian Parties .... this has not been possible. We therefore now lay before you proposals which...we trust will enable you to attain your independence in the shortest time and with the least danger of internal disturbance and conflict. These proposals may not, of course, completely satisfy all parties ... We ask you to consider the alternative to acceptance of these proposals .... a grave danger of violence, chaos, and even civil war. The result and duration of such a disturbance cannot be foreseen, but it is certain that it would be a terrible disaster for many millions of men, women and children ... We appeal to all who have the future good of India at heart to extend their vision beyond their own community or interest to the interests of the whole four hundrend millions of the Indian people ... we look forward with you to your ever increasing prosperity among the great nations of the world, and to a future even more glorious than your past.[১৮] (Mansergh Transfer of Power, Vol. VII, P. 591)

মিঃ জিন্না যে এই হুকুমনামাতে আংশিক সম্মতি জানাননি তা নয়, কিন্তু তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের বক্তব্য—কংগ্রেস কোন্ কোন্ বিষয়কে প্রাধান্য দেয় ; অথবা কংগ্রেস নীতির প্রশ্ন তুলে এই হুকুমনামাকে কতোটা গ্রহণ ও বর্জনের পাশাপাশি নতুন কোনো দাবীর উল্লেখ করে কি না। ১৮ই মে মিঃ জিন্না টেলিফোনে বড়লাটকে জানিয়ে দিলেন, মুসলমানরা বা লীগ ১৬ই মে-এর প্রস্তাবে বা হুকুমনামায় খুশি নয়। মিঃ জিন্না টেলিফোনে বিশদভাবে না জানিয়ে বড়লাটকে অনুরোধ করলেন যে, আসছে ওয়ার্কিং কমিটির সভার প্রতি দৃষ্টি রাখতে;বড়লাটের প্রতি টেলিফোনে এই বক্তব্য বস্তুত মিঃ জিন্নার তরফ থেকে প্রাথমিকভাবে সতর্কবাণী ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। ১৯ তারিখে মিশনের পক্ষ থেকে লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং বলা হলো বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ সময়ে লীগ বা মিঃ জিন্নার মতামতের জন্য এক মাসের মতো অপেক্ষা করা কী সম্ভব হবে? কংগ্রেস—বিশেষত গান্ধীজীর সঙ্গে মিশন সদস্যদের এই পর্যায়ের আলোচনায় তাঁরা স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, অন্যদিকে লীগ বা মিঃ জিন্নাকে নিয়েও যে বিব্রত থাকতে হচ্ছে। যেহেতু পাকিস্তানকে সরাসরি স্বীকার করা হয়নি, তাই করাচীর মতো প্রধান প্রধান শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না ; বাংলা থেকে গভর্ণর স্যার বারোজ চট্টগ্রামে পাকিস্তানপন্থী ছাত্রদের তাণ্ডবের কথা মিঃ ওয়াভেলকে জানিয়ে দিয়েছেন ইতোমধ্যেই ; হিন্দুদের অবস্থানও ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিপদ অন্য দিক দিয়েও আসতে পারে, বিশেষত মিঃ জিন্না যদি বাংলার প্রাদেশিক সরকারকে পদত্যাগ করতে বলেন (যেহেতু বাংলায় লীগ মন্ত্রিসভা) তবে তাকে সামাল দেয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠবে। ইত্যবসরে ২৪শে মে মিঃ জিন্নার সঙ্গে কথা হলো মেজর উড্রো ওয়াটের ; Wyatt noted, about the strong Muslim reaction against the missions statement and thus most hesitant to support

it openly." একটা প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে, মিঃ জিন্না কি কিছুটা সময় নিয়ে ভারতের মুসলমানদের—নিজ সমর্থকদের মনোভাব খুঁটিয়ে দেখছিলেন?—দেখা যাক না হুকুমনামায় পাকিস্তানের অস্তিত্ব না থাকলে মুসলমানদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়? তিনি সার্থকভাবেই মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলির অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে মিশন প্রদত্ত award মেনে নিলেও পাকিস্তানের জন্য যুদ্ধের প্রথম পর্বে তিনি জয়ী হয়েছেন। অতএব, এবারে মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে লেখা ২৬শে মে-তে পেথিক-লরেন্সের বক্তব্য সমসাময়িক পরিস্থিতি বুঝতে আমাদের খুবই সহায়ক হবে :

> What is going to happen I don't know. Gandhi is provokingly enigmatic and blows hot and cold. Azad, Nehru and Jinnah I think all want a settlement. But already we are up against the second hurdle. ... Azad and Nehru and the Congress generally are willing to waive any formal or legal change in the interim constitution, but they want almost absolute power in reality and they want something to be able to say about it to their people. Jinnah not only does not want the Viceroy to relinquish his authority but he positively wants him to retain it. The Viceroy is now I think convinced that he must go to the limit of what is possible in satisfying the Congress ... I have not ... abandoned hope that we may surmount this difficulty and that both Congress and Muslim League may both express a grudging acquiescence in our plan sufficient to enable us to go ahead with summoning the Constituent Assembly ... on or before June 15th. There are many people who would welcome our positively getting on with the job.[৭] (May 26, 1946, Mansergh, Transfer of power, Vol. VII, P. 705-6)

মিঃ জিন্না দিল্লিতে ফিরে এলেই ভাইসরয় ওয়াভেল হার্দিক পরিবেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের বিষয়টি উত্থাপন করেন, এবং প্রয়োজনীয় লীগ সদস্য তালিকা চান। কিন্তু মিঃ জিন্না জানান যে লীগের কাউন্সিল সভা ব্যতীত এভাবে নাম দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষত লীগ এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি যে তারা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে সম্মত কি না। ৫ই জুন (১৯৪৬) লীগের কাউন্সিল সভা বসলে মিঃ জিন্না দ্বিধা পোষণ করেন,—লীগ যদি আগেভাগেই মিশনের প্রস্তাব মেনে নেয় এবং তারপরে কংগ্রেস যদি মিশনের প্রস্তাবাবলী না মানে তখন লীগ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। মিশনের প্রস্তাব সমর্থনের বিষয়ে তিনি লীগ কাউন্সিলে যেভাবে বক্তব্য উপস্থিত করেন তা অত্যন্ত নাটকীয় হলেও তাঁর নিজস্ব মতামত গুরুত্ব সরকারে ব্যক্ত হয় :

> I advised you to reject the Cripps proposal, I advised you to reject the last Simla Conference formula. But I cannot advise you to reject the British Cabinet Mission's proposal. I advise you to accept it.[১৮]

প্রথম দিনের এই সভাতে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানান, ভারতে মুসলিম জাতিসত্তাকে বিকশিত করার মানসে লীগের এই কাউন্সিল সভাকেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে, নিষ্পত্তি ঘটাতে হবে—মুসলমানরা কি ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করবে, নাকি ভারতের হিন্দুদের অধীন হয়ে থাকবে? লীগ সদস্যরা যদি স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য চান তবে শীঘ্রই তাদের বেছে নিতে হবে কী ভাবে ব্রিটিশ এবং হিন্দু কংগ্রেস উভয়কেই 'পাকিস্তান' স্বীকার করানো যায়। ৬ই মে লীগ কাউন্সিল সভা শেষ হওয়ার পূর্বেই বিপুল সংখ্যাধিক্যে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে লীগ গ্রহণ করে প্রস্তাব পাশ করে। অর্থাৎ মিঃ জিন্নার উপদেশ মোতাবেক লীগ কাউন্সিল সদস্যরা বুঝতে পারেন—আর মিঃ জিন্না তাদের বোঝাতে সক্ষম হন যে, মিশনের বক্তব্যটাই এখানে শেষ কথা নয় পাকিস্তান হাসেলের পক্ষে, বরং এটা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি সদস্যদের দৃঢ়তার সঙ্গে বোঝালেন যে শাসন পরিষদে 'পাকিস্তান' গঠনের বিপক্ষে বিরূপ কোনো প্রচেষ্টা হলে তা প্রতিহত করার জন্যে লীগ চেষ্টা চালিয়ে যাবে ; আর সে সংগ্রামে অবশ্যই মুসলিম স্বার্থ রক্ষা হবে। তিনি মিশন প্রস্তাবিত ABC এই তিনটি গ্রুপকেই সমর্থন জানালেন, তাঁর বিশ্বাস এর ফলেই 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার কাজ নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করা যাবে।

> This was advertised by Mr. Jinnah as "unconditional" acceptance of the Cabinet Mission's Plan. It was a forward movement, taking particular care to see that the path of retreat was not blocked. The Muslim League was fascinated by the virtue of "compulsory Grouping of the six Muslim provinces in Sections B and C."[১৯]

৬ই জুনের লীগের কাউন্সিল সভা শেষে মিঃ জিন্না ৭ই জুনে ভাইসরয় ওয়াভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারে মিঃ জিন্না অন্তর্বর্তী সরকারে নিজের জন্যে 'Defence Portfolio' এবং লীগের অন্যান্যদের মধ্য থেকে কম করে দুজনের জন্যে 'Foreign Affairs' ও 'Planning' এই দুটি Portfolio দাবী করেন। যদিও তিনি জানেন যে আপাতত Portfolio ভাগ হওয়ার কথা কংগ্রেস-৫, লীগ-৫, অন্যান্য-২, মোট ১২ জনের মধ্যে। তিনি আশা করেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে নিশ্চিত তাঁর লীগ সভাপতির আসনটি ত্যাগ করতে হবে না। অর্থাৎ তিনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশটা নিজে এবং লীগের জন্য বরাদ্দ করতে আবেদনের পাশাপাশি লীগের সভাপতির আসনটি যে খোয়াতে অনিচ্ছুক সে কথা জানিয়ে দিলেন। তাঁর মতে গণ্ডগোলটা পাকিয়ে তুলতে চলেছেন জওহরলাল নেহরু এবং মৌলানা আজাদ, তাঁরা যে মিশনের প্রস্তাবে উল্লিখিত 'সমতা' সম্পর্কে অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।[২০] অবশ্য বিষয়টাকে খুঁচিয়ে তাঁদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বিড়লা। কেননা, গত বছরে যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যে বিষয় যেভাবে সমঝোতা করা সম্ভব ছিলো তা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বা নির্বাচনের পরে সাধারণের আসনে কংগ্রেসের সাফল্য দাঁড়ালো আশাতীত এবং সর্বাধিক—তাই লীগের সঙ্গে একই দৃষ্টিতে আসন বিষয়ে 'সমতা' রক্ষা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। যুক্তির দিক দিয়ে জনসংখ্যার আনুপাতিক হার নিশ্চিত উপেক্ষার নয় এবং এখন তো

যুদ্ধ-শেষে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার আদর্শ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পরিস্থিতি ক্রমশ জটিলতার দিকে এগিয়ে চলছে দেখে ক্রিপ্স একটা উপায় উদ্ভাবন করলেন—ভাইসরয় নিজে জওহরলাল নেহরু ও মিঃ জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেসে উত্থাপিত 'সমতা' নিয়ে কথা বলবেন, এবং কংগ্রেসকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেয়ানোর জন্যে ক্রিপ্স যাবেন গান্ধীজীর কাছে এমন একটা প্রস্তাব নিয়ে যে মিঃ জিন্না ও জওহরলাল নেহরু এই দুজনেই সরকারে থাকবেন নির্দিষ্ট portfolio ব্যতীত এবং উভয়েই এখানে 'Vice-President' পদে থাকবেন। ভাইসরয় সন্ধ্যায় জওহরলাল নেহরু এবং মিঃ জিন্নাকে 'ডিনার'-এ নিমন্ত্রণ জানিয়ে খুবই উৎসুক তাঁদের সঙ্গে 'ডিনার' টেবিলে আলোচনা শুরু করতে, তাই ক্রিপ্স নিজে যান মিঃ জিন্নার কাছে। কিন্তু তিনি দীর্ঘক্ষণ মিঃ জিন্নার সঙ্গে কাটিয়েও সক্ষম হলেন না তাঁকে 'ডিনার' টেবিলে উপস্থিত করতে। ঘটনাটা হলো—মিঃ জিন্না তো নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল।

> Mr. Jinnah said that he was not prepared to discuss parity with anyone. He had had great opposition in his own party to accepting the Mission's proposal, he did not think that opposition was fully appreciated, nor what he had gone through. The only way he had been able to persuade the Muslim League Council and Working Committee to accept the Statement was by promising them that he would not join the Interim Government unless the Muslim League had parity with Congress. He was now pledged to that. He could not go back on that. He was not his own master.[২১] (Mansergh, Transfer of Power, Vol. VII, p. 867.)

মিঃ ক্রিপ্স অবশ্য পরবর্তীতেই বুঝতে পেরেছেন যে, মিঃ জিন্নার 'সমতা' প্রশ্নে অনড় থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নেই, কেননা তিনি তো লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে খোলাখুলিভাবে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে সদস্যদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন—অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিলে অবশ্যই তিনি 'সমতা' রক্ষা করার অবস্থান-ই নেবেন। গান্ধীজী অবশ্য এ সময়ে নেহরু-আজাদ-প্যাটেলের পাশে দাঁড়িয়ে 'সমতা' প্রশ্নে মিশনের প্রস্তাব নিয়ে নতুন করে ভাবলেন এবং মন্ত্রিসভার জন্যে লীগের প্রদত্ত নাম তালিকায় এন. পি. এনজিনিয়রের উপস্থিতি দেখে (যিনি আই. এন. এ.-র বিচারের সময় পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন) অগ্নিশর্মা—এমনতরো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে তিনি মেনে নেবেন কী করে! কংগ্রেস ভাইসরয়ের কাছে যে চিঠি পাঠাতে ইচ্ছুক তার মুসাবিদা করলেন তিনি। যথারীতি এই মুসাবিদায় স্থান পেলো : (ক) লীগ তো স্বীকৃত মুসলিম সংগঠন, তাদের ফর্দে কোনো অ-মুসলমানের নাম থাকতে পারবে না, (খ) কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম মিলিত জাতীয় দল, তারা মুসলমান সদস্য পাঠালে কোনো আপত্তি করা চলবে না, (গ) লীগের নিজ সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো সদস্য সম্পর্কে মতামত কংগ্রেসের অভিপ্রেত নয়, (ঘ) সরকারকে অবশ্যই নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের কাছে দায়বদ্ধতা স্বীকার করে নিতে হবে।[২২]

কিন্তু কংগ্রেস তো কংগ্রেস-ই, মন্ত্রিসভা গঠন প্রাক্কালে গান্ধীজীর কথায় ওয়ার্কিং

কমিটির সদস্যরা ততোধিক গুরুত্ব দিতে চায়নি। যদিও তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধিকার ও কর্ম পদ্ধতি বিষয়ে ভাইসরয়ের খবরদারির বিরুদ্ধেই ছিলেন। বড়লাটও তাদের দাবীর আংশিক মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ২২শে জুন ভাইসরয় ওয়াভেল কংগ্রেসকে জানিয়ে দিলেন, কংগ্রেসী মশাইরা মস্করা করেও কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য হিসেবে মুসলমানের নাম ফর্দে পাঠাতে পারবেন না, সে হোক না কেন যতো বড়োই জাতীয়তাবাদী নেতা। মোদ্দা কথা হলো, ভারতীয় মুসলমানদের ধর্ম-কর্মের সবটারই ইজারা নিয়েছেন মিঃ জিন্না আর তাঁর মুসলিম লীগ। কংগ্রেস ওয়াভেলের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি, তারা সিদ্ধান্ত নিলো, বরং অন্তর্বর্তী সরকারে অংশগ্রহণ করবে না ; যদিও এই সিদ্ধান্ত মৌলানা আজাদ ব্যক্তিগতভাবে মানতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর মনোভাবটা দেখে নিয়ে জানিয়ে দিলো সিদ্ধান্তটা, তবে তাদের ব্যাখ্যা সরকার গ্রহণ করলে এই সরকারে কংগ্রেস যোগ দেবে। ভাইসরয় ওয়াভেলের সামনে উপস্থিত হলো মস্ত বড়ো ফাঁড়া, আগেভাগেই যে তিনি মিঃ জিন্নাকে এ বিষয়ে একপ্রকার কথা দিয়ে বসে আছেন ; এখন তো আর মস্করা করা চলে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওয়াভেলের প্রতি মিঃ জিন্নার লেখা চিঠি এবং তাঁকে দেয়া ওয়াভেলে চিঠি এ বিষয়ের সাক্ষ্য বহন করে।

জুন মাসের (১৯৪৬) দ্বিতীয়ার্ধেই ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস ও লীগের দ্বন্দ্ব নোতুন মাত্রা লাভ করে। সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হয়, ক্যাবিনেট মিশনের তিন সদস্য এবং ভাইসরয় ওয়াভেল এঁরাও ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে দ্বিধাবিভক্ত হলেন (অনেকটা ভারতীয় জলবায়ুর কারণেই হয়তো)। ক্রিপ্‌স-লরেন্স তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেস ও লীগকে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভারতে থাকা ওয়াভেলের মতামতকে গুরুত্ব দিলেন আলেকজাণ্ডার। ২০শে জুনে মিঃ জিন্নাকে লেখা ওয়াভেলের চিঠি প্রণিধানযোগ্য।[১১] পরিস্থিতিকে সামাল দিতে ওয়াভেলের যুক্তি ও সমাধানের ইচ্ছে অপেক্ষা লীগ বা মিঃ জিন্নাকে তুষ্ট করার প্রয়াস লক্ষণীয়। অবশ্য স্বীকার করতেই হয়, গান্ধীজী বা কংগ্রেস ১৯৪২ থেকেই গণআন্দোলন এবং রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তাঁকে তাঁর দায়িত্ব পালনে বিব্রত করেছেন একাধিকবার। তবু আশ্চর্য হতে হয়, কংগ্রেস বা লীগ কেউ-ই তাঁকে সহজভাবে হিতাকাঙ্ক্ষী ভাবেনি। যদিও এই সময়ে ভাইসরয়ের দায়িত্ব এবং কর্মকাণ্ড ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ আর জটিলতায় পিনদ্ধ। ১৭ই এবং ১৯শে জুন গান্ধীজী প্রচেষ্টা চালালেন লীগ যেভাবে হিন্দু-বর্ণহিন্দুদের দল কংগ্রেস বলে প্রচার চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে কংগ্রেসকে তুলে ধরার, লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে অংশগ্রহণের জন্যে যে নামের ফর্দ-ই দিক না কেন, কংগ্রেসের দেয়া নামের বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলার এক্তিয়ার থাকতে পারে না, এমন কী অসাম্প্রদায়িক মুসলমানের নাম ফর্দে পাঠালেও লীগের কিছুই বলার থাকতে পারে না। কিন্তু ২২শে জুনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিলো ১৬ই জুনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে, কিন্তু ২৩শে জুনেই গান্ধীজীর পরামর্শে ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ই জুনের প্রস্তাবটি অনুমোদন করে ; অবশ্য এদিনেই পেথিক-লরেন্স দেখা করেছিলেন গান্ধীজী ও প্যাটেলের সঙ্গে। ২৩-২৫শে জুনের মধ্যেই গান্ধীজী সহ নেহরু-আজাদ-প্যাটেল ১৬ই মে-র ঘোষণার ১৯(৫) উপধারাকে সামনে রেখে ভাইসরয় ওয়াভেলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে

চলেছেন, আবার মৌলানা আজাদ ওয়ার্কিং কমিটির মতামত ওয়াভেলকে জানিয়েছেন ইতিবাচক হিসেবে।[১০]

ভাইসরয় ওয়াভেল গান্ধীজীর প্রতি নানা কারণেই বিরূপ ছিলেন অথচ তাঁকে উপেক্ষা করার মতো সাহস বা ক্ষমতা কোনটাই প্রত্যক্ষভাবে তিনি দেখাননি। ওয়াভেল, না গান্ধীজী, না কংগ্রেস কাউকেই রাজনীতির দিক থেকে অধিক সুবিধে দিতে সম্মত নন, অথচ লীগের যা অবস্থা তাঁকেও সরকারের পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভবের বিষয়। যদিও মুসলিম লীগ অতীতে ওয়াভেলের শুধু সাহায্যকারীই ছিলো না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে খোদ ব্রিটিশ সরকারকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু বর্তমানে মিঃ জিন্না বা লীগকে ক্ষমতায় দিয়ে তিনি ভারত গৃহযুদ্ধ ঘটার ইন্ধন দিতে পারেন না এবং তিনি মিশন সদস্য আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন—ভারত সরকার চালানোর শক্তি ও সংগঠন লীগ এখনো অর্জন করতে পারেনি। ২৬শে জুনে মিশন এক ঘোষণায় জানায় যে, কংগ্রেস-লীগের মধ্যে ঐকমত্য না ঘটলেও একটা সরকার গঠন করতে হবে এবং সেটি হবে অস্থায়ী কার্যবাহী সরকার (Caretaker Government)। ২৯শে জুন মিশন সদস্যরা ব্রিটেনের উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে ভি. পি. মেননের বক্তব্য হলো :

> In fact, the Mission did not succeed in all that they had set out to do. The Congress and the Muslim League had indeed accepted the long-term plan, but their acceptances had been conditioned by their own interpretations of almost all the controversial issues. However, there were two positive achievements. First, the problem of the future of India had been brought down from the clouds of nebulous theories to the plane of hard realities ; secondly, there had been the welcome realization that the Labour Party in England meant to keep their pledge to withdraw from India as soon as possible. Hereafter it was not to be so much a struggle to wrest power from the British, as a dispute as to how that power, once inherited, should be shared by the parties concerned.[১১]

ঘটনাটা হলো ক্যাবিনেট মিশন এবং ভাইসরয় ওয়াভেলের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন বিষয়ক ঘোষণাকে কংগ্রেস দ্বিধা ও দোদুল্যমানতা নিয়ে দেখছে বলেই মিঃ জিন্না এবং ওয়াভেল কেউ-ই স্বাভাবিক বলে মনে করেননি। তবে ক্রিপ্স ও পেথিক-লরেন্সের পরামর্শ তো কংগ্রেস গ্রহণ করেছিলো, তবু বড়লাট বললেন 'insincere'; যদিও গণপরিষদ ও প্রদেশসমূহের ইচ্ছের ব্যাপারে একাধিকবার তারা সাবলীল বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, আর ঘোষণার ১৫ ধারা বা ১৯ ধারায় যদি কোনো অসঙ্গতি থাকে তা উল্লেখ করা নিশ্চয় দোষের মধ্যে পড়ে না। শর্তসাপেক্ষে লীগও একে গ্রহণ করেছিলেন, ক্যাবিনেট মিশন চেয়েছিলো ঘোষণায় 'পাকিস্তান' বিষয়টি উপেক্ষা করতে, কিন্তু লীগ ঘোষণাকে গ্রহণ করে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক সোপান হিসেবে। অবস্থাগতিকে ওয়াভেলের চৈতন্যে 'breakdown plan' 'হামি' খাচ্ছে।[১২]

১০ই জুলাই কংগ্রেসের নোতুন প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত নেহরু গদাইলস্করী-চালে প্রেস সাক্ষাৎকার দিলেন। আর এটাই একটা বিড়ম্বনা ঘটিয়ে দিলো। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেই বসেন, ১৬ই মে-র প্রস্তাবিত ABC গ্রুপের মধ্যে A গ্রুপিংটা মানতে চাইবে না, সীমান্ত তো লীগের আওতার বাইরে (যদিও জনসংখ্যা বিচারে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সেখানে সংখ্যাধিক) ; যদি A ও B গ্রুপিং থেকে সরে যায় তবে C কী করবে? আসাম তো এমনিতেই বাংলার সঙ্গে থাকতে চাইছে না, সম্ভবত আসাম বাংলার সঙ্গে মিশে গ্রুপ C-এর মাধ্যমে A ও B-এর অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ করতে চাইবে না। আর গণপরিষদের ভূমিকা কী হবে? সংখ্যা-গুরুদের সিদ্ধান্ত যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সহায়ক বলে বিবেচিত হবে, তার উপর ব্রিটেনের খবরদারি গণপরিষদ কী মেনে নেবে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নেহরু জানান যে গণপরিষদে যোগ দিতেই কংগ্রেস সম্মত হয়েছে এবং প্রয়োজনে ও পরিস্থিতি বিচারে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাকে সংশোধন আর পরিমার্জনও করা যেতে পারে।

কংগ্রেস সভাপতির এই বক্তব্য প্রকাশ পেলে বিচক্ষণ আর লক্ষ্যে অবিচল একগুঁয়ে মিঃ জিন্নার প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। মৌলানা আজাদও নেহরুর এই বক্তব্যকে 'এক আজব 'বিবৃতি' বলে উল্লেখ করেছেন, ফ্যাসাদ কতদূর বাধবে তা তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। যদিও ১৬ই মে-র মিশনের ঘোষণা এবং ১৬ই জুনের বিষয়টা লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে মিঃ জিন্না পাশ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবুও একটা অংশ মনে করতো মিঃ জিন্না এর ফলে ইসলামী আদর্শে রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে চাহিদার তুলনায় তাঁর প্রাপ্তি তো সামান্যই ছিলো, এবারে সুযোগটাকে তিনি কাজে লাগালেন—ব্রিটিশ থাকতেই কংগ্রেস ভোল পালটাতে চায়, অতঃপর?

মিঃ জিন্না গোটা ব্যাপারটার-ই পুনর্বিচার (review) চান লীগ কাউন্সিল সদস্যদের দ্বারা, লিয়াকত আলী খানকে তিনি সভা ডাকতে বললেন ; ২৭শে জুলাই লীগ কাউন্সিল সভা বসে বোম্বাই (মুম্বাই)। অবশ্য ইতিপূর্বে ২২শে জুলাই লীগ সভাপতির কাছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের আমন্ত্রণের পাশাপাশি নিয়ম-বিধি প্রকাশ করে ভাইসরয়ের চিঠি পৌঁছালো। তিনি ঘটনা বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তে এলেন জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের নোতুন প্রেসিডেন্ট হয়েই নিজেদের অতীতের দেয়া প্রতিশ্রুতি বে-মালুম ভুলেছেন সংখ্যাধিক্যের গুরুত্ব প্রকাশ করে, প্রকৃতপক্ষে নেহরু কংগ্রেসের মানসিকতাই তুলে ধরেছেন যার অন্তর্নিহিত সত্য হলো দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অস্বীকার করা।

> Jinnah's reading of the situation was that the British Government wanted to appease the Congress because they were afraid of the Congress launching a civil disobedience movement against them. Particulary as the Labour Pary, which was in power then, had all along supported the Congress and would not like to be placed in a position in which its representative, the Viceroy would have to suppress the Congress movement. The result was that Jinnah took a leaf from the Congress book and thought that the only way of compelling the British Government to treat the Muslim League as an equally important

> party was the threat of 'Direct Action.' Jinnah's view had always been that the Congress had launched the 'Quit India' movement to cocrce the British Government during the war to surrender power to them. He thought that this was the most effective way of dealing both with the British Government and the Congrerss.

বিষয়টিকে আরো সহজ করে আবেগমণ্ডিতভাবে দেখি 'Cabinet Mission and After'-এ :

> Our motto should be discipline, unity and trust in the power of our own nation. If there is not sufficient power, create that power. If we do that, the Mission and the British Government may be rescued, released and freed from being cowed down by the threats of the Congress that they would launch a struggle and start non-co-operatiion. Let us also say that[১১] (Mohammad Ashraf, ed., Cabinet Mission and After, Lahore : Ashraf, 1946, p. 291)

২৭শে জুলাই থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত জরুরীভিত্তিতে লীগের কাউন্সিল সভা বোম্বাইতে (মুম্বাই) অনুষ্ঠিত হলো। মিঃ জিন্নার বাগ্মিতা এবং যুক্তির প্রাধান্যে এই প্রস্তাব সভায় পাশ হলো যে লীগ ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যদের কাছে আব কোনো দাবী উত্থাপন করবে না, ভারতের ভাইসরয় ওয়াভেলেব সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক বছরের আন্তরিকতাপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্র বা আবাসের যখন কোনো নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা গেলো না তখন নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য 'ডু অর ডাই' নীতির মতোই কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হচ্ছে। ২৯শে জুলাইতে সিদ্ধান্ত হলো লীগ Direct Action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে অর্থাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হবে যাতে ভারত সরকার লীগের আদর্শ বা নীতিকে গ্রহণ করে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে ভারতীয় মুসলমানদের দাবীর প্রতি নমনীয় হন, পাকিস্তান দাবীকে মানতে বাধ্য হন। প্রকৃতপক্ষে মিঃ জিন্না এক ঢিলে দুই পাখিরও বেশী মাবতে চেষ্টা করলেন। প্রথমত কংগ্রেসকে বুঝিয়ে দেয়া লীগের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বর্তমানে কংগ্রেসের একার পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়, দ্বিতীয়ত ভাইসরয় ওয়াভেল ভারতের সেনাধ্যক্ষ থাকাকালীন যেভাবে লীগের সাহায্য পেয়েছিলেন এবং পরবর্তী ভাইসরয় হিসেবেও তিনি সর্বদা লীগের সহানুভূতিমূলক সাহায্য পেয়েছেন। কিন্তু লীগ প্রয়োজনে সেখান থেকে আমূল বদলে যেতে পারে অর্থাৎ লীগকে দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই ওয়াভেলের। উপমহাদেশের মুসলমানরা সংখ্যাবিচারে হিন্দুদের সমান (এখানে কংগ্রেস বলাই যুক্তিসঙ্গত) না হলেও নিজেদের দাবী আদায়ের যুদ্ধে কোনো প্রকারেই অবহেলার পাত্র নয়। তৃতীয়ত বলা চলে, পাকিস্তান আন্দোলন থেকে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় লীগের সম্মত হওয়ার পিছনে মিঃ আলেকজাণ্ডারের পরামর্শ ও উৎসাহ থাকলেও এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সুনিপুণ একটি গোপন রূপরেখা বাস্তবতার দিকে ক্রমশ প্রকাশিতব্য হলেও লীগের ভেতরেই কিছুটা জঙ্গী এবং আপষহীন একটি উপদল

যারা ক্রমান্বয়ে মিঃ জিন্নার ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলছিলো এই বলে যে, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মিঃ জিন্না লীগের ১৯৪০-এর প্রস্তাব থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন,— মিঃ জিন্না 'Direct Action Day' পাশ করানোর মাধ্যমে তাদের শান্ত করার পাশাপাশি নিজেকে লীগের কর্তাব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন এবং সক্ষমও হলেন। বোঝা গেলো না কিসের ভিত্তিতে তিনি এই উন্মাদনা বোধ করেন, কোন্ ভরসাতে তিনি অসহযোগ আন্দোলন বা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের মতোই Direct Action-কে ভারতব্যাপী ছড়িয়ে দিতে উদ্যত? কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়ে তাঁর আশ্রয়স্থলের চিত্রটা যদি এরকমই :

	মুসলমান	মুসলমান নয় এমন
পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, ব্রিটিশ, বেলুচিস্তান	৬২·০৭%	৩৭·৯৩%
বাংলা ও অসম	৫১·৬৯%	৪৮·৩১%[১৮]

তবে সমগ্র ভারতে তাঁর অবস্থান কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে পারে তা কি তিনি ভাবেন নি? হয়তো ভেবেছেন, ভিন্ন পন্থায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টির কলাকৌশলে তিনি মুসলমানদের জাতিসত্তা গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে পেরেছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের জন্য ভাইসরয় ওয়াভেলের ৩১শে জুলাইয়ের আমন্ত্রণকে তিনি ফিরিয়ে দিতে পেরেছেন এই বলে যে লীগ কাউন্সিল বর্তমানে সরকারে যোগ দিতে সম্মত হবে বলে তিনি মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে মিঃ জিন্না দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নতুন ইতিহাস সৃষ্টিতে, যুক্তিতর্ককে উপেক্ষা করতে পারেন সাবলীল গতিতে, প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—কেন? এমন কী তাঁর গোপন অভিব্যক্তি? ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বর যে অসুখে তিনি ইন্তেকাল করেন সে অসুখে খুব কম-ই তো মানুষ হঠাৎ করে মারা যায়, হয়তো তাঁর এই দুরারোগ্য টিউবারকোলোসিসের কথা জানতেন মিস ফতেমা জিন্না আর ব্যক্তিগত চিকিৎসক Dr Bakhsh ; তিনি নিজে কি জানতেন না? Dr. Bakhsh যদিও বলেন ৫ই সেপ্টেম্বরে মিঃ জিন্না Pneumonia-য আক্রান্ত হন এবং এই রোগেই তিনি মারা গেলেন।[১৯] কিন্তু পূর্বের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন : "On July 29, X-ray photographs proved the damage to the Quaid's lungs to be more terrible then was supposed."[২০] এটা স্বচ্ছ যে মিঃ জিন্নার অসুখটা কী ছিলো—আরো পূর্ব থেকেই দেখা যায় তিনি প্রায়শ-ই ইনফ্লুয়েঞ্জাতে ভুগছেন। তখনো তো Tuberculosis-এর চিকিৎসার তেমনটি উন্নতি ঘটেনি—বর্তমানের ক্যানসারের মতোই নিশ্চিত মৃত্যুই ছিলো পরিণতি।[২১] মিঃ জিন্না কি জানতেন তাঁর জীবনের অন্তিম পর্বের শুধু সূচনা নয় পরিসমাপ্তি এগিয়ে আসছে, তাই কি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে) তাগিদ নিজের ভেতরেই উপলব্ধি করছিলেন আরো গভীরভাবে। হয়তো তাঁর নিজের কাছেই প্রশ্ন ছিলো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অপূর্ণ থাকলে এবং ভবিষ্যতে অন্য কোনো লীগ নেতা পাকিস্তান পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হলে ইতিহাস তাঁকে কতটুকু স্থান দেবে! তিনি ১৯২১ থেকেই নিজেকে যুদ্ধে জড়িয়ে রেখেছেন কংগ্রেসের সঙ্গে—গান্ধীজীর সঙ্গে

প্রতিযোগিতায় নেতৃত্বের শিখরে আরোহণ করতে চেয়েছেন ; নিজেকে ক্ষণজন্মাদের ঐতিহাসিক স্থানে দাঁড় করাতে গিয়ে শুনতে পাচ্ছিলেন কী অন্তিম প্রহরের করুণ বাদ্য 'এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে'। মৃত্যুকে তিনি লঙ্ঘন করতে চান আরো রূঢ় বাস্তব দিয়ে, অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'Direct Action Day'-কে ; এ যেন অসংখ্য মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে শেষ মৃত্যুকে পরিহাসের প্রাণান্তকর একান্ত প্রচেষ্টা। যদি এটাকেও একটা কারণ ধরি তবে সেখানেও তিনি কূটবুদ্ধি আর চাতুর্যে নিশ্চিতভাবেই উতরে গিয়েছেন।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, 'এয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
বলে যাবে 'গগন, বিপিন, শশী পাথুরেঘাটার ;
মানিকতলার শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের এন্টালির—'
কোথাকার কেবা জানে ;

—জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭' কবিতার অংশবিশেষ।

লীগের প্রস্তাব ছড়িয়ে গেলো, সভাপতি মিঃ জিন্নার নির্দেশ গেলো বিশেষভাবে মুসলমান প্রধান ছ'টি প্রদেশে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। কিন্তু লড়াইটা কার বিরুদ্ধে? কংগ্রেস? নাকি ব্রিটিশরাজ? উভয়ের বিরুদ্ধেই কি ? মিঃ জিন্না বুঝাতে চাইলেন হিন্দু আধিপত্যবাদের অপর নাম কংগ্রেস, কিছু 'গৃহশত্রু' জাতীয়তাবাদী মুসলিম নামে সেখানে এখনো থেকে গেছে। সাগরের ওপারে প্রত্যাবর্তনমুখী একদল ব্রিটিশ কেষ্টবিষ্টুরা মিঃ জিন্নাকে মদত দিচ্ছেন; ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে, —ব্রিটিশ অধিকারের পূর্ববর্তী ভারতে 'ভারতীয়' নামে বৃহত্তর কোনো জাতির উল্লেখ দেখা যায় কী!—এই সন্ধিক্ষণে ভারতীয় রাজনীতির কয়েক বছর পূর্বেকার ঘটনাপঞ্জীকে সংক্ষেপে হলেও পুনরায় উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলে বোধ করছি।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন মূল্যবোধের চেতনা প্রকাশে তিনি তৎপর হলেন। হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত শক্তিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে আহ্বান জানালেন কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে।

খিলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'অসহযোগ' পরিচালনার লক্ষ্যে গান্ধীজীর সঙ্গে মতপার্থক্য ঘটলো মিঃ জিন্নার। গান্ধীজীর চেতনায় খিলাফত আন্দোলন তো ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের সেতু, মিঃ জিন্না এটাকে বললেন, 'গেঁয়ো মানুষ ক্ষেপানোর কাজ'। কিন্তু তৎকালীন মুসলিম নেতৃত্ব গান্ধীজীর পাশে এসে যৌথ আন্দোলনে শরীক হলেন, একদা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত মিঃ জিন্না অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই। ১৯৩৮-৩৯-এ কংগ্রেসের

নতুন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে গান্ধীজী নেতৃত্বের কোন্দলে বিশেষত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যজনিত মতভেদে জড়িয়ে পড়েন। গান্ধীজী যে স্বরাজ চান তা তো বাস্তবকে উপেক্ষা করে অধ্যাত্ম চেতনার বিকাশ বা প্রকাশ ঘটাতে উৎসুক। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের তো সবটাই রাজনৈতিক বাস্তবের, দেশীয় অর্থনীতি হবে যার মূল লক্ষ ; এই লক্ষ্য পূরণের একমাত্র উপায় রাভী নদীর তীরে উত্তোলিত স্বাধীনতার পতাকাকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে পরাধীনতাকে অস্বীকার করা। তাই দেখা যায় স্বরাজ বা স্বাধীনতার আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র এবং গান্ধীজীর আচরণ ভিন্নতর, একজন অহিংস—আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী এবং সহনশীলতা তাঁর মূল অস্ত্র। অন্যজন স্বদেশী, কিন্তু স্বদেশের মাটি থেকে বিদেশী শোষক তাড়নে বদ্ধপরিকর, রক্তের বিনিময়েও 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'। বস্তুত দুজনের পথ ও পাথেয় আলাদা যদিও লক্ষ্য একই, গান্ধীজী পারলেন না সুভাষচন্দ্রকে মেনে নিতে। রাজনীতির পাশা খেলায় বয়োবৃদ্ধের কাছে ধরাশায়ী হলেন অনুজ সুভাষচন্দ্র, কিন্তু একে অন্যের উপর শ্রদ্ধাবোধ হারালেন না, সুভাষচন্দ্র তো তাঁকে 'জাতির জনক' বললেন। কিন্তু সব সত্য হলেও শেষ সত্য নয়, গান্ধীজী কেমন করে মেনে নেবেন সুভাষচন্দ্রকে—সুভাষ যে সমাজতন্ত্রকে আশ্রয় করতে চায় আর বামপন্থীরা সাম্যবাদীরা তাকে হাওয়া দিচ্ছে। ১৯৪২-এ সুভাষচন্দ্র দেশে নেই অথচ গান্ধীজীর চেতনায় সুভাষ বিরোধিতা তীব্র, বলা চলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন তো তাঁর 'অহংবোধের অভিব্যক্তি' ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এ আন্দোলনটার শুরুতে কি কংগ্রেস কি ভারতের বড়লাট সবার কাছেই তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম, কিন্তু জেল থেকে মুক্তিলাভের পরে তিনি রিক্ত—একান্তভাবেই নিঃস্ব। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিত ব্যস্ত হয়েছিলো আর এর দীপশিখা ম্লান হওয়ায় তাঁরা বর্তমান ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর গুরুত্ব অনুধাবনের সুযোগ পেলেন।

গান্ধীজী চমৎকারভাবে একটা কাজ করে বসেন, মিঃ জিন্নাকে খুশী করতে নিজে থেকেই যোগাযোগ করলেন আর ঘোরেল মিঃ জিন্না একে সুস্বাদু করে প্রচারে টানলেন। ইতিমধ্যে মিঃ জিন্না আসাম, সিন্ধু, বাংলায় নিজের ভিত অনেকটাই মজবুত করে নিয়েছেন। এখন দুরমুশ করতে কোনো আশঙ্কা থাকতে পারে না। ১৯৪৬-এ লীগ জিতলো বিপুল ভোটাধিক্যে সংখ্যালঘু আসনে আর মিঃ জিন্না গর্বের সঙ্গে ঘোষণা দিলেন লীগ-ই একমাত্র সংখ্যালঘুদের হয়ে কথা বলার দাবীদার। তাঁর এ দাবীকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কংগ্রেসের থাকে না, আর গান্ধীজী এখন তো নেহরু-প্যাটেল-আজাদ প্রমুখের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে স্থান লাভের গুরুত্ব থেকে গৌণ ; রাজধানীতে জনাকয়েক সমর্থক সহ পরোক্ষভাবে অবাঞ্ছিত হয়ে আছেন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন প্রথমেই স্বাধীনতা, অতঃপর মুসলমানদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যা মিঃ জিন্না বা লীগ কিছুতেই মেনে নেয়নি ; ভাইসরয় ওয়াভেল পূর্ব থেকেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন গান্ধীজীর বিপক্ষে। নিঃসঙ্গ গান্ধীজী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়েই কথা বললেন, কিন্তু তিনি পূর্বের গুরুত্ব কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে পেলেন না, তবে বড়লাট এখনো গান্ধীজীকে ভয় পান—আর একটা 'ভারত ছাড়ো' হলে এই মুহূর্তে ব্রিটেনের লেবর পার্টি তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। ওয়াভেলের পক্ষে সম্ভব নয় লীগের নেতা মিঃ জিন্নাকে সরকার গড়তে ডাকা, দু'একটা প্রদেশে লীগের যা শক্তি বা তাঁর যা গুরুত্ব অন্যান্য প্রদেশে

তিনি তো ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ নন, লীগ সরকার গড়লেও চলবে কি? সে ভিন্ন মিঃ জিন্না তো কখনোই নমনীয় নন, একগুঁয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা রহিত। তবে কংগ্রেসই তাকে শেষ পর্যন্ত মন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে বলে মিঃ জিন্না ওয়াভেলের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন, বর্তমানটা যে বড়োই কঠিন—নিজের অস্তিত্ব খিলাফত আন্দোলনেব সময়কার মতোই বিপন্ন হওয়ার মুখোমুখি। মিঃ জিন্নার চেতনায় প্রাধান্য পেলো নিজের অস্তিত্ব—যে-কোনো প্রকারেই হোক টিকে থাকা—এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ন্যায়-অন্যায়-মানবিকতা, এমন কী জন্ম-মৃত্যুকেও উপেক্ষা করে চাই নোতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা; পাশ হলো লীগ কাউন্সিলে Direct Action। প্রয়োজন হলো এমন কোনো প্রদেশের যারা তাঁর ইচ্ছেকে বাঙ্‌ময় করে তুলবেন জনসংখ্যার আধিক্যের বীরত্বে, নিষ্ঠুরতায় এবং সর্বোপরি নির্বুদ্ধিতায়; নতুন মাত্রা পেলো বাংলা—হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তো বাংলায় একমাত্র লীগ সরকারেব নেতৃত্বে রয়েছেন।

বাংলার রাজনীতিতে খাজা নাজিমুদ্দীন ক্ষমতাচ্যুত হলেন, মুসলিম লীগের শীর্ষে মিঃ সোহরাওয়ার্দী। তিনি বাংলার মুসলমান যুবাদের নেতৃত্বদানকারী লীগের বাংলা সম্পাদক আবুল হাশিমের কাঁধে ভর করলেন। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বাবস্থা উল্লেখ করে আবুল হাশিম বলেন :

> ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দশ বছর মুসলমানরা বাংলায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো এবং ১৯৪৬ সালের পরে আরও ষোলো মাস। তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য (accredited) হিন্দু নেতাদের ক্ষমতা থেকে আলাদা রেখেছিলেন। দু'তিনজন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতেন না। তাঁরা ছিলেন লোক দেখানো এবং গৃহশত্রু। এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়াব বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম যার ফলশ্রুতি হিসাবে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলো। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ গঠনেব জন্য আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম। কংগ্রেসের দিক্‌পালরা এতে রাজি হতে পারেননি। তাঁরা সন্দেহ পোষণ করেন যে, যদি বাংলায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় তাহলে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও একইভাবে যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ গঠনের দাবি করবে।[৩৩]

যাহোক, সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলার মন্ত্রিসভা ২৪শে এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে, কংগ্রেস বা হিন্দু-মহাসভা লীগের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে অস্বীকার করে, তবে লোক-দেখানো এবং গৃহশত্রুরা এখানেও স্থান পেলো! ২৯শে জুলাই লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত Direct Action-কে সার্থক করতে স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন, নবাব ইসমাইল এবং চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে নিয়ে তিন সদস্যের এক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দীনকে স্যার খেতাব বর্জন করতে হচ্ছে মিঃ জিন্নার নির্দেশক্রমে, অন্যদিকে ব্রিটিশের প্রতি বিনীত ভাবটা ষোল আনা দেখাতে গিয়ে কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউটে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নাজিমুদ্দীন বলেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামটা কোনো অবস্থাতেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে এটি সংগঠিত করার আহ্বান রয়েছে।[৩৪] কোনো সন্দেহ নেই যে, এর ফলে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী হিন্দুরা প্রতিকার ও প্রতিরোধের কথা চিন্তা করে, এবং সাধারণ শান্তিপ্রিয় হিন্দুরা ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।[৩৫] ১১ই আগস্টে লীগের কলকাতা জেলা শাখার সম্পাদকের একটা বিবৃতি থাকে Direct Action-এর দিনে হরতাল ও সাধারণ

ধর্মঘট হবে, আর ওই ধর্মঘট থেকে রেহাই দেয়ার কথা বলা হলো জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক ও তার বিভাগ, হাসপাতাল, ক্লিনিক, মাতৃসদন ইত্যাদি। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর দিনের অর্থাৎ ১৬ই আগস্টে অনুষ্ঠিতব্য অক্টারলোনী মনুমেন্টের পাদদেশে সভার আমন্ত্রণপত্র পেলো সংখ্যালঘু খ্রীস্টান সম্প্রদায়, তফসিলী জাতি, আদিবাসী উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ ১৩ই আগস্টে এক বিবৃতির মাধ্যমে লীগের বঙ্গীয় সম্পাদক আবুল হাশিম জানালেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লীগের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতির কথা। অক্টারলোনী মনুমেন্টের পাদদেশে জনসভাতে ভাষণ দিতে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন বলেন, "আমাদের সংগ্রাম কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে।" কিন্তু মঞ্চে থাকা আবুল হাশিম তাঁকে ঠেলে মাইক্রোফোন দখল করে জনসভায় ঘোষণা করেন, "আমাদের সংগ্রাম ভারতের কোনো জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের সংগ্রাম ফোর্ট উইলিয়ামের বিরুদ্ধে"।[৬৬] এইচ. ভি. হডসনের বক্তব্য হলো :

> On that day, meetings would be held all over the country to explain the League's resolution. These meetings and processions passed off–as was manifestly the central League leaders' intention–without more than common place and limited disturbances, with one vast and tragic exception. In Calcutta the League Ministry under Mr. Suhrawardy, who had adopted a much more bellicose attitude than Mr. Jinnah, declared 16th August a public holiday, an extremely dangerous thing to when communal passions were inflamed, Satan would find work for idle hands to do, and any gathering or group in a crowded city might invite reactions from hostile bystanders.[৬৭]

প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নেয়া প্রয়োজন, মিঃ জিন্নার চেষ্টাতেই বা নেতৃত্বেই ২৯শে জুলাই ঐতিহাসিক Direct Action-এর সিদ্ধান্ত হলেও এবং ঐতিহাসিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হলেও সম্ভবত তখনো সত্যিকার অর্থে কোন্ কোন্ কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে দৃষ্টান্তবিহীন হিসেবে ইতিহাসে তুলে ধরা হবে তাব সিদ্ধান্ত নিতান্তই আটপৌরে মিছিল-মিটিং বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। মিঃ জিন্না তো তাঁর বক্তব্যের এভাবে ইতি টেনেছিলেন :

> He concluded his speech by quoting Firdousi, the Persian Poet: "If you seek peace, we do not want war. •But if you want war, we will accept it unhesitatingly."[৬৮]

এমন কী ঘটনা ঘটলো যার ফলশ্রুতি লীগ মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে এ ধরনের প্রাণ, ধন, নারীর সম্ভ্রম এবং সহিষ্ণুতা হারানোর পরিবেশে নিজেদের জড়িয়ে নিলো, না কি তাদের উপর এই অমানবিক এবং পাশবিক পরিবেশকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীরও বেশী ব্যবধানে জাগলেও উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই অবান্তর হবে না, আবার ইতিমধ্যে অনেক ঐতিহাসিক গবেষক এ প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধান যে করেননি তাও নয়। যদিও সর্বজনবিদিত যে ইসলামেব আদর্শ হিসেবে উপর্যুক্ত বিষয়গুলি রক্ষা করা এবং

নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন অবশ্য কর্তব্য ও প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে, পত্র 'হাদিস' তো আমাদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে বাঁচতে শেখার পাঠ দেয়। প্রশ্ন ওঠে মিঃ জিন্নার যদি প্রচেষ্টা থাকে ধর্মীয় জীবনকে রাজনৈতিকভাবে জাতিসত্তা গঠনের মাধ্যমে ভাবতে স্বাধীনতা দেয়ার—তবে যা তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে ঘিরে প্রকাশ করেছেন তার বাইরেও অনুক্ত রেখেছিলেন অনেক কিছুই।

১৯৪৫-এ ব্রিটেনে রাজনৈতিক পালাবদলে নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন মিঃ এ্যাটলি, বিরোধী পক্ষে বসলেন পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল। ভারতের ভাইসরয় ওয়াভেল নতুন প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ্যাটলির সরকারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকলেও ভারতে সেনাবাহিনীর দায়িত্বে এবং পরবর্তীতে ভাইসরয়ের নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিলের সৌজন্যে—স্বভাবতই তাঁর প্রতি মিঃ ওয়াভেল ছিলেন বিনম্র এবং শ্রদ্ধাবনত। পক্ষান্তরে নতুন প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ক্যাবিনেট মিশন পাঠালে মিশনের সদস্যদের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত হতে পারেননি ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন বিষয়ে। ভারতে ক্যাবিনেট মিশনের কর্মকাণ্ডের শেষ প্রহরে মিঃ ক্রিপ্স, মিঃ পেথিক-লরেন্স-এর সঙ্গে পৃথক মত পোষণ করতেন মিঃ আলেকজাণ্ডার (অন্যতম সদস্য), ওয়াভেল মিঃ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে ঐকমত্য হতে পেরেছিলেন বলেই ভারতে থাকাকালীন উভয়ে জোটবদ্ধও হয়েছিলেন বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে। বস্তুত ভারতে দায়িত্ব নিয়ে আসার প্রথমাবস্থা থেকেই কংগ্রেস, বিশেষত গান্ধীজী, নেহরু-প্যাটেল-আজাদ তাঁকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিলেন এবং সেটা স্থায়ী হয়েছিলো ১২ই আগস্ট (১৯৪৬) কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ; প্রকৃতপক্ষে মিঃ ওয়াভেল তাঁর ভারতে থাকা দিনগুলিতে কংগ্রেসের কার্যক্রমে কখনোই খুব সুস্থির থাকতে পারেননি। গান্ধীজী তাঁর প্রতি বরাবরই ছিলেন অনমনীয়। লর্ড ওয়াভেলের সামরিক মানসিকতায় এবং ব্যক্তিত্বে একের পর এক হাতুড়ি পেটাচ্ছিলেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। ভাইসরয় ওয়াভেল সেকথা ভোলেননি অথবা ভুলতে পারেননি, সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যদের মনোভাবও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ; তিনি যে আর বেশীদিন ভারতে থাকবেন না তার আঁচ পেয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন। কিন্তু মানসিক দিক থেকে কোনো অবস্থায়ই কংগ্রেসকে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না, অথচ তিনি উপায়হীন, ভারতের সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক দল যে কংগ্রেস!

কংগ্রেস ১২ই আগস্টে (বলিথো বলেছেন—৮ই আগস্টে) অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে সম্মত হলে লীগও সম্ভবত তার Direct Action পরিকল্পনায় নোতুন কোনো সংযোজন করে থাকবে, কেননা মিঃ জিন্না আরো বৃহৎ এক অস্তিত্বের সঙ্কটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। সম্ভবত নিজের জীবন আর রাজনৈতিক জীবন দুটোই যে তাঁর চরম সন্ধিক্ষণ।

> Mr. Churchill loves colourful language and colourful implications. In his view, the strife and massacres were precipitated, because the British Government invited the Congress on August 12 to nominate all the members of the Viceroy's Council. He described the riots, started by the League, as "unparalleled" in India "since the Mutiny of 1857." Making a speech in the House of Commons in December 1946, Mr.

Churchill made the rhetorical declaration :
"It is certain that more people have lost their lives or been wounded in India by violence since the Nehru Government was installed in office four months ago than in the previous 90 years, four generations of men, covering a large part of five reigns."
Mr. Churchill's game was to discredit the Nehru Government, but the fact remained that riots resulted from the direct action policy of the Muslim League. The League leaders were not repentent ; they made speeches in defence of the direct action policy of the League ; they wanted to cast into shade the atrocities of Timur Lane and Chengiz Khan. Mr. Churchill was also not sorry for these riots, but he was sore about caste Hindu domination upon 90 million Muslims and 60 million untouchables.[৩৯]

সম্ভবত এবারে আমরা একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারি, মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বা অক্টারলোনী মনুমেন্টের (শহীদ মিনার) পাদদেশের জনসভায় খাজা নাজিমুদ্দীন যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার পিছনে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিলো। এই পরিকল্পনার বিষয়বস্তু জানতেন লাহোরের রাজা গজনফর আলী খান (যিনি মুসলিম সমাজে বিশেষ পরিচিতি ব্যতীতই কেবলমাত্র মিঃ জিন্নার শুভেচ্ছা ও প্রচেষ্টায় এতদূরে পৌঁছেছেন) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (বাংলার নতুন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী), আর স্বয়ং খাজা নাজিমুদ্দীন ; প্রকাশ্যে বিষয়বস্তুর উন্মেষ ঘটানোর দায়িত্ব পড়েছিলো খাজা নাজিমুদ্দীনের উপর—অথবা খাজা নাজিমুদ্দীন নিজেই এ কর্তব্য পালনে এগিয়ে এসেছিলেন। বাংলায় মুসলিম লীগের মধ্যে তিনি যে এ সময়ে অপাংক্তেয়, তাঁরই মন্ত্রিসভার সদস্য সোহরাওয়ার্দী তাকে টোকা মেরে ঝেড়ে ফেলেছেন। অতএব, এবারে নাজিমুদ্দীন এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেষ্টা করলেন, নিজ কাজের জন্য প্রশংসা পাবেন মিঃ জিন্নার কাছে (কেননা এখন যে তিনিই একমাত্র ভরসা, সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমরা মিলে তো ঢাকার নবাব পরিবারের রাজনৈতিক প্রতিপত্তিকেও গঙ্গা-বুড়িগঙ্গায় বিসর্জন দিতে উদ্যত), অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী বাংলার সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি কালিমা লেপনের এমন সুযোগ হাশিম চাইলেও হামেশা আসবে না—এর ফলে বাংলার হিন্দুরাও আরো অধিক পরিমাণে সোহরাওয়ার্দীর উপর বিরূপ হবে। অতএব, খাজা সাহেব বাঙ্ময় হলেন। কিন্তু পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে, আবুল হাশিম এই অভিসন্ধির কিছুই জানতেন না। মিঃ জিন্না ও খাজা নাজিমুদ্দীনেরা একরোখা মানুষটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন, কেননা সমসাময়িক বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে হাশিম ছিলেন আদর্শপরায়ণ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী। তাঁকে জানালে যে বাংলা সম্পর্কে মিঃ জিন্নার সমস্ত পরিকল্পনাটা-ই ভেস্তে যেতে পারে, আবুল হাশিম যে না কংগ্রেস, না ইংরেজ কাউকেই পরোয়া করে না এবং প্রয়োজনে লীগ নেতাদেরও ছেড়ে কথা বলেন না।

১৯৪৬ সালের ২৪শে আগস্ট, ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল কলকাতা সফর করলেন।

তিনি সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা এবং ত্রাণ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে ২৬শে আগস্ট দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। খাজা নাজিমুদ্দীন, সুহরাওয়ার্দী, মির্জা আহমেদ ইস্পাহানী, কলকাতা মুসলিম লীগের সেক্রেটারী এস. এম. ওসমান, হামিদুল হক চৌধুরী, শেঠ আদমজী, হাজী দাউদ এবং আমি ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে খাজা নাজিমুদ্দীন বললেন, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর **(Your Excellency)** আমার উচিত স্পষ্টভাবে কথা বলা। ইনি হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম। ইনি আপনাদের ভারত ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগ্রহে বিশ্বাসী নন।" ফল দাঁড়াল এই যে, ভাইসরয় দাঙ্গার ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। সমালোচনা করতে গিয়ে আমি বললাম, "কলকাতার প্রতিটি হত্যা, অগ্নিকাণ্ড এবং ধর্ষণের জন্য মহামান্য বড়লাট বাহাদুর দায়ী।" ভাইসরয় জানতে চাইলেন কেন তাঁকে অপরাধের জন্য আমি দায়ী করছি।[৮০]

ভাইসরয়কে তিনি জানিয়েছিলেন কংগ্রেসের অন্যতম নেতৃত্ব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ব্রিটিশদের কাছ থেকে কীভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চাইছেন, পাশাপাশি মিঃ জিন্নার ইচ্ছের কথা। তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতার দাঙ্গায় নিশ্চুপ থাকাটাকেই হাশিম ওয়াভেলের কর্তব্যে অবহেলার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু মিঃ জিন্নার বা সোহরাওয়ার্দীর চাতুর্যের কাছে আবুল হাশিম তো নাবালক, ফজলুল হক পর্যন্ত হালে পানি পাননি। তবে একথা সত্য যে রাজনীতির কুটিল প্রশ্ন কখনো সরল রেখায় গমন করে না। ১৬ই আগস্টে সোহরাওয়ার্দী সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করার পরে কলকাতা তথা বাংলার ব্রিটিশ শাসকবর্গ এটাকে কীভাবে দেখেছেন ? অন্তত ১৬ই আগস্টের কলকাতাকে দেখে তাঁরা কি মানবতার এই পরাজয়কে ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির অশুভ প্রেতাত্মার হিংসুক বিচরণ বলে মনে করতে পেরেছেন? বোঝা দুরূহ, বাংলার ছোটলাটের কাছ থেকে দুঃসংবাদ জেনেও লর্ড ওয়াভেল ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেননি কেন? গভর্ণর বারোজ তাঁকে ১৬ তারিখের রাত্রেই জানান যে, সকাল ৭টা থেকেই উত্তর-পূর্ব মানিকতলায় যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত তা ক্রমশ সমগ্র কলকাতাতে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে সাফল্য দিতে অবশ্য ইতিপূর্বে সোহরাওয়ার্দী ১৬ই আগস্ট এভাবে ছুটির দিন ঘোষণা করাতে অফিস-আদালত কর্মচারীরা সপ্তাহে তিন দিনের পরপর ছুটি পেয়ে গেল। মনুমেন্টের পাদদেশে সোহরাওয়ার্দীর ভাষণের কিছুটা অংশ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি :

> The Cabinet Mission was a bluff, and that he would see how the British could make Mr. Nehru rule Bengal. Direct Action Day would prove to be the first step towards the Muslim struggle for emancipation. He advised them to return home early and said ... that he had made all arrangements with the police and military not to interefere with them. Our intelligence patrols noticed that the crowd included a large number of Muslim *goondas* [hoodlums]. and that ... their ranks ... swelled as soon as the meeting ended. They made for the shopping centres of the town where they at once set to work to loot and burn Hindu shops and houses ... At 4.15 p.m. Fortress

H.Q. sent out the codeword "Red" to indicate that there were incidents all over Calcutta.[৩] [Francis Tuker, While Memory Serves, (London ; Cassell, 1950). P. 158]

১৬ই আগস্ট থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত অশুভ শক্তির ভয়ঙ্কর দাপাদাপির কলঙ্কিত ক্ষতচিহ্ন বুকে নিয়ে কলকাতা শান্ত হলো। প্রথম তিন দিন অবশ্য ছিলো বীভৎসতার চূড়ান্ত, চতুর্থ দিন থেকে প্রশাসন কলকাতাকে দখল নিতে শুরু করে, কিন্তু প্রথম তিন দিনে সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত এ নগরী; কাদের হাতে এ মহানগরীর ভার? পথে পথে—সে রাজপথ কি অলিগলি এতো সব মৃতদেহ কাদের? তারা কি হিন্দু না মুসলিম? নাকি সাধারণ মানুষ? কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার খেটে-খাওয়া সাধারণ শ্রমিক-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষ কি এরা? মিঃ জিন্না বা সোহরাওয়ার্দীর মতো কোনো প্রাসাদে থাকা নেতৃত্ব তো এখানে আহত বা নিহত হননি, অথচ তাঁদের গদির জন্যে—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে প্রতিবেশীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক চুকিয়ে আত্মহননের সংঘর্ষে ইন্ধন দেয়া হলো অতি সাধারণ মানুষদের! স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ সেদিনের ইতিহাসের বিষয় সংবাদপত্রে দেখে শিউরে উঠতে হয়, যদিও সে দিনের ঘটনার নায়ক-মহানায়কেরা আজ আর কেউ-ই বেঁচে নেই। কেউ কেউ মহামানব হয়ে গিয়েছেন খেটে-খাওয়া গরিব-গুর্বো শিক্ষাদীক্ষাহীন সাধারণ মানুষের রক্ত দোহন করে, কিন্তু এ উপ-মহাদেশে (ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ) সেদিনকার সেই অশুভ প্রেতাত্মারা আজো জেগে আছে—প্রতিটি দিন তারা ধর্মীয় মৌলবাদের আলখেল্লায় নগ্ন-পাশবিক চেতনাকে ঢেকে কাজ করে চলছে ; কেননা প্রেতাত্মারাও বংশধর তৈরী করে। ধর্মীয় মৌলবাদ খাদ্য শিক্ষা স্বাস্থ্যের কথা বলে না, দুর্বিষহ বেকার সমস্যা থেকে যুব-সমাজকে মুক্তি দিতে শিল্পের উন্নতির কথা বলে না, উৎসাহ দেয় বিভেদের প্রাচীর তুলে মন্দির মসজিদ ভাঙ্গতে এবং গড়তে ; মৌলবাদ বহন করে আনবে অশিক্ষা ও গোঁড়ামি, দীর্ঘস্থায়ী হবে শোষণের যাঁতাকল!

১৬ই আগস্টের (১৯৪৬) সকাল থেকেই কলকাতার মানিকতলাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রাথমিক বিকাশ দেখা যায়, দুপুরের পূর্বেই দক্ষিণ কলকাতার হাজরার কাছাকাছি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে ওঠে ; বিকেল ৪-৩০ মিনিটের পরে উত্তর-দক্ষিণ-মধ্য কলকাতা লুটেরাদের হাতে—লীগ সমর্থনকারী গুণ্ডাবাহিনীর হাতে চলে যায়। একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালরাই সুপরিকল্পিতভাবে এই মারণযজ্ঞের আয়োজন করে।[৪] লীগ অবশ্য Direct Action ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই যুদ্ধের মেজাজে প্রতিপক্ষকে বিশেষত কংগ্রেস এবং হিন্দুদের একহাত নিতে চায়, যদি 'দালাল' বলতে হয় তবে সে তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নয় মিঃ জিন্নারই ; এবং এটা সহজবোধ্য যে খাজা নাজিমুদ্দীনের অক্টারলোনী মনুমেন্টের পাদদেশের ভাষণ পরিস্থিতিকে অনেকটাই বাঙ্ময় করে তোলে।[৫] মোদ্দা কথা হলো মিঃ জিন্নার ইচ্ছেকে বাস্তবায়িত করতে বাংলাই ছিলো একমাত্র এগিয়ে আসা প্রদেশ, কেননা লীগ-ই এখানকার মন্ত্রিসভা গঠন করে প্রশাসনকে নিজেদের আদর্শ অনুসারে পরিচালিত করতে সক্ষম ছিলো ; আর সোহরাওয়ার্দীর আচরণবিধি যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো সেকথা অকপটেই স্বীকার করতে হয়। তবু আমরা দেখি তিন দিন কেটে গেলে সোহরাওয়ার্দী প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ১৯শে আগস্টে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর

হয়েছেন। যদিও তার কারণটাও সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু যে সাম্প্রদায়িক ঘূর্ণীঝড় বাংলার সমাজ জীবনকে বিধ্বস্ত করে তুলেছিলো, তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা সোহরাওয়ার্দীর (যদিও মধ্য কলকাতার অবাঙ্গালীপ্রধান অঞ্চলে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিলো রূপকথার নায়কের মতোই) বা খাজা নাজিমুদ্দীনের ছিলো না ; আগুন লাগানো যতোটা সহজ, নিভানো কী ততোটা সহজ বা অনায়াসের!

লর্ড ওয়াভেল ২৪শে আগস্টে দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতাকে পরিদর্শন করেন (পূর্বেই বিষয়টি আবুল হাশিমের বক্তব্য টেনে উল্লেখ করা হয়েছে), কলকাতার রাজপথে তখনো রক্তের দাগ অমলিন, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের ভৌতিক উদাহরণ বর্তমান।

> প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ডাকার সময় জিন্না বলেছিলেন," I am not prepared to discuss ethics." বিপদ হবে বুঝেও জিন্না সামন্ততান্ত্রিক, এমন কি মধ্যবিত্ত, মুসলিমদের মাথার ওপর দিয়ে 'পথের রাজনীতি'র কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। ওয়াভেল মন্তব্য করেছেন .
>
> পথেব অনুগামীরা (অধিকাংশই যুক্তিহীন বেকার, গুণ্ডা, ছাত্র)-ই তাঁকে থামতে দেবে না। জিন্না যতদূর যে গতিতে চলতে চেয়েছিলেন তা হয়েছিল অনেক বেশি দূর, অনেক বেশী দ্রুত।" (ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়াব, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭)।

একদিকে মিঃ জিন্না এবং অন্যপাশে জওহবলাল নেহরু (কখনো কখনো গান্ধীজী তাঁকে উপদেশ দেন) এই দুই বিরুদ্ধবাদী ব্যারিস্টার নেতার মাঝখানে সৈনিক লর্ড ওয়াভেল আগস্টের (১৯৪৬) পরিস্থিতি নিয়ে হাবুডুবু খান ; মিঃ জিন্না আর তাঁর মুসলিম লীগ তো দীর্ঘদিন ধরেই ভারতে ব্রিটিশ সরকারকে প্রশ্নাতীতভাবে সাহায্য করে গিয়েছেন। বর্তমানে Direct Action-এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মিঃ জিন্নার মধ্যে কোনো অনুশোচনার প্রকাশ দেখা যায়নি, বরং তিনি মনে করতেন এর ফলেই লীগের ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে—দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের পথ খুলে গিয়েছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আর দূরে নয়, সময়ের অপেক্ষা মাত্র। ২৭শে আগস্টে নেহরু সহ গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন ওয়াভেল, গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হলেন—রক্ত ঝরানো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পরেও বড়লাট মিঃ জিন্নার প্রতি আনুকূল্য দেখাচ্ছেন দেখে। ভাইসরয়ের যুক্তি হলো, আইনের আওতাব বাইরেও কখনো-সখনো যেতে হয় বাস্তব সমস্যাকে মোকাবিলা করার নিতান্ত গরজে,—তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানেব জন্য তিনি লীগকে এখনো অনুরোধ করে যাচ্ছেন। গান্ধীজী-নেহরু-প্যাটেল-মৌলানা আজাদ কলকাতায় জিন্না-নাজিমুদ্দীন-সোহরাওয়ার্দীর ঘটানো দাঙ্গায় ব্যথিত হলেও ওয়াভেলের কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন যে, লীগ নেতৃত্বকে তিনি বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বলবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল লর্ড ওয়াভেল বরং 'The great Calcutta killing'-কে সামনে রেখে মিঃ জিন্নার অনুকরণেই বলতে চাইছেন—লীগকে সরকারে না নিলে দাঙ্গা থামবে না, অর্থাৎ দাঙ্গাকে সামনে রেখে ভাইসরয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে 'ব্লাকমেইল' করছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।" তবুও শেষ পর্যন্ত সরকার একটা গঠন করা হলো, ২রা সেপ্টেম্ববে ৭জন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন।

'The great Calcutta Killing'-এ নিহত এবং আহতের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব না হলেও ঐ দিনগুলিতে দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রকাশিত সংবাদ এবং বিভিন্ন দেশী-

বিদেশী ঐতিহাসিকদের দেয় তথ্যকে ভিত্তি করে বলা চলে নিহতের সংখ্যা এগার হাজার অতিক্রম করেনি। আহতের সংখ্যাটা অবশ্য আরো বেশী। লীগ সরকারকে মৃতদেহ সংগ্রহের জন্য ঘোষণা করতে হয় 'মৃতদেহ প্রতি পাঁচ টাকা' দেয়ার কথা, কেননা সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না এই বিপুল সংখ্যক মৃতদেহ উদ্ধার করা কলকাতার রাজপথ বা অলি-গলি থেকে।[৪৬] কিন্তু জেনারেল Tukar মনে করেন নিদেনপক্ষে ১৬ হাজার 'বাঙ্গালী' এই হত্যাকাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন, অনেকের কোনো হদিস মেলেনি এই কারণেই যে, বহু মৃতদেহ ব্রিজের উপর দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো।[৪৭]

হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে, কলকাতা ত্যাগ করতে চলছে মানুষজন; আশ্চর্যের বিষয় এখানে এসেও প্রাণভয়ে ভীত মানুষের দল দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে অপেক্ষমান থাকে রেলগাড়ির জন্যে। অথচ তারা সবাই প্রাণ বাঁচাতে কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছে শিশু পুত্র-কন্যা সহ, কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহ আর অবিশ্বাস মৃত্যুর ভয়াল ছায়া নিয়ে বর্তমান, হয়তো সেকারণেই বলা চলে, 'It was only the beginning of Partition.'[৪৮] প্রসঙ্গত, একটি সত্যকে স্বীকার করে নেয়া ভালো, কলকাতায় এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় খুবই সংখ্যালঘু থাকা সত্ত্বেও শিখদের ভূমিকা কিন্তু কোনো প্রকারেই মানবতার পক্ষে ছিলো না, তাদের মুক্ত কৃপাণ মৃত্যুর সংখ্যাকে নিশ্চিতভাবেই বাড়াতে সাহায্য করেছিলো। সোহরাওয়ার্দী উদ্‌গ্রীব হলেন, ১৮ তারিখেই তিনি বুঝলেন হিসেবে ভুল হয়ে গেছে—হিন্দু নয় মুসলমানরাই মারা যাচ্ছে বেশী, পুলিস হেড-কোয়ার্টার ঠেকাতে পারছে না, বিশেষত কলকাতার বাইরে থেকে আসা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গের অতি সাধারণ মুসলমানেরা এই দাঙ্গার অন্যতম প্রধান শিকার হয়েছেন। ১৯ তারিখ সকাল থেকেই তিনি দাঙ্গা দমনে আন্তরিক হলেন, কিন্তু বড়ো বেশী বিলম্ব ঘটে গেছে! প্রসঙ্গত একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শেখ মুজিবর রহমান তখন শুধু লীগপন্থী ছাত্র সংগঠনেই নয় বাংলার লীগ নেতৃত্বের কাছে কর্মী-নেতা হিসেবে বেশ পরিচিত ; হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণার উৎসস্থল।

এখন আবার মনে পড়ছে।
প্রান্তরে জরায়ু-ভাঙা রক্তভ্রূণ,
শকুন ! শকুন !
কয়েকবার পাখ্‌সাট মেরে ফের আকাশে উঠল।
করোটি, হাড়পোড়া, ধুলো—
চাপ চাপ জমাট রক্ত। ছায়ামূর্তি কে দাঁড়িয়ে?
ধুলো, ধুলো। আমি ইয়াসিন,
পূরব-চটির হাটে যাব; লাহেরীডাঙা ছাড়িয়ে
সে কত দূর। সেই এক ভাবনা ঘুরছে।
জল! জল! মরচে-পড়া চুল উড়ছে।

—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কাঁচ-রোদ্দুর, ছায়া-অরণ্য' কবিতার অংশবিশেষ।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু। কিন্তু ভাইসরয় ওয়াভেল তাঁর জেদ ছাড়লেন না। একথা ওয়াভেল ভেবেছেন কি না বলা শক্ত—তাঁর অনুরোধে ও নির্দেশক্রমে লীগ মন্ত্রিসভায় এলে কংগ্রেস তো মন্ত্রীপরিষদ ছেড়েও চলে যেতে পারে, আর এরকম একটা ঘটনা ঘটলে ব্রিটিশ সরকারের অবস্থানটা কেমন হবে? একটা বিষয় অবশ্য ক্রমশ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, ওয়াভেল কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি মিঃ জিন্নাকেও সন্তুষ্ট করতে প্রয়াস চালাচ্ছেন। নানা দাবীকে কাট-ছাঁট বা টানা-হেঁচড়া করে শেষটায় মিঃ জিন্না ঘোষণা করলেন লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যাবে, কিন্তু তিনি নিজে কোনো Portfolio নেবেন না। লীগের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভায় স্থান নিলেন নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান, আবদুর রব নিস্তার, আই. আই. চুন্দ্রীগড়, রাজা গজনফর আলী আর আবুল হাশিমের 'লোকদেখানো এবং গৃহশত্রু' বিভ্রান্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। ২রা সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করলে মিঃ জিন্না ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হন, এতোদিন তিনি ভাবছিলেন একা কংগ্রেস কোনো প্রকারেই মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে না। এবারে তাঁর ভ্রম ঘুচে গেল এবং লীগকে সরকারে নেয়ার জন্যে নিজে থেকেই 'নরম' হলেন ; বোম্বাই সহ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে যে ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক অবস্থাটা সমাজ জীবনকে ঘায়েল করতে উদ্যত হয়েছে।

১৬ই আগস্টে লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' কলকাতায় শুরু হওয়া গণহত্যা ২০শে আগস্ট থামলেও লীগ কিন্তু ধরে নিয়েছিলো উদ্দেশ্য সাধন বা পাকিস্তানেব পথে অগ্রগতির জন্যে এ একটি পন্থা হতে পারে, রাজা গজনফর আলী তো বিবেক-বিবেচনা থেকে দূরে গিয়ে সরাসরি বক্তব্য রাখতে শুরু করেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পক্ষে; কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁকে কি আরো সাম্প্রদায়িক করেছিলো? অপরপক্ষে কলকাতায় দাঙ্গাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হওয়া নোয়াখালির অতি সাধারণ দরিদ্রদের পক্ষে লীগ কথা বলতে গিয়ে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রাধান্য দেয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বেই নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বীভৎস রূপে প্রকাশ পায়, কলকাতার গণহত্যায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিলো আর সম্পত্তি পুড়েছিলো। কিন্তু এবারে নোয়াখালিতে একচেটিয়া হিন্দুদের ওপর গণহত্যা লীগ দ্বারা সংগঠিত হলো। হত্যা, স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস করা ব্যতীত আরো অধিক বর্বরতার নগ্ন প্রকাশ ঘটলো—কিশোরী, কুমারী, যুবতী, গৃহবধূ নির্বিচারে ধর্ষিতা হলো সংখ্যাতীত, কোথাও কোথাও ধর্মান্তর ঘটিয়ে একটা অংশকে ঘরে তুলেও নিলো তারা। কলকাতায় হানাহানিতে সোহরাওয়ার্দী শেষটায় বিচলিত হলেও এখানে কিন্তু দাঙ্গা প্রতিরোধে যথাযথ কোনো ব্যবস্থা-ই গ্রহণ করেননি। কিন্তু অল্পতেই তাঁর ঘুম ভাঙ্গলো, দেখলেন মিঃ জিন্না নিজের ইচ্ছেটা পূরণ করছেন বাংলাতে এবং মাধ্যম হলেন তিনি-ই ; পৃথিবী জানলো সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার মানসিকতা—খাজা নাজিমুদ্দীন মধুর প্রতিশোধের দ্বারা সোহরাওয়ার্দীকে কলঙ্কিত করলেন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একাগ্রতা নিয়ে গান্ধীজী এলেন নোয়াখালিতে, বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী কিছুটা বিনম্র হলেন বটে কিন্তু চেতনায় মানবতার প্রকাশ যৎসামান্যই।

কলকাতার সাম্প্রদায়িক হানাহানিকে সামনে রেখে মৌলানা আজাদ ব্যথিত হলেন, তাঁর আশঙ্কা দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য হলো, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিলো বিহারে। বিহার জ্বলে ওঠে হিন্দু মৌলবাদের বর্বর আচরণে—মুসলমান কিশোরী কেঁদে ওঠে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণায়, মাতা ও ভগিনীরা হলো চরম সর্বনাশের শিকার! কেঁদে ওঠে মানবতা—ধর্মান্ধ মৌলবাদকে প্রতিহত করবে কোন্ শক্তি!

আসুন! আসুন! কার তাজা মাংস চাই
হাতে যেন থাকে খাঁটি খদ্দরের থলি
ভীষণ সস্তা মাংস নিয়ে যান ভাই
অহিংসার হাড়িকাঠে দিয়েছি এ বলি,
পরম সাত্ত্বিক মাংস গঙ্গাজলে ধোয়া
রামধুন গেয়ে গেয়ে তবে বলি দেওয়া।

সর্বভাষী মাংস পাবে সব দেশী পাঁঠা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
তিনরঙ্গা খাঁড়া দিয়ে সব মাংস কাটা।

যৌবনবিলাসী এসো নেবে ত এখন
গর্ভবতী রমণীর রক্তমাখা ভ্রূণ
বাৎসল্য রসিক যদি থাকো কোন জন
কচি শিশু মাংস পাবে সদ্য করা খুন।

ভয় নেই আমাদের মাংস নিরামিষ
সর্বত্রই ব্রাঞ্চ আছে দিল্লি হেডাপিস।

মাংসাশীর জন্য বিজ্ঞাপন.—
১৯৪৬ : সলিল চৌধুরী।

'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দুরপনেয় কলঙ্ক নোয়াখালির দাঙ্গার পাশাপাশি আমরা বিপরীতমুখী চিত্রও দেখি, বাংলার কৃষক সভার হিন্দু-মুসলমান সদস্যারা যৌথভাবে দাঙ্গাকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলো; নোয়াখালিতে তা ব্যর্থ হলেও কুমিল্লায় তা আংশিক সার্থকতা খুঁজে পায়। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি আলোচনা প্রসঙ্গে কমরেড গোলাম কুদ্দুসকে জানিয়েছিলেন, ছেচল্লিশের নোয়াখালিতে দাঙ্গা যতোই বীভৎস হোক না কেন, ধর্মীয় উগ্র মৌলবাদ যতো শক্তি নিয়েই সাম্প্রদায়িক গণহত্যায় নামুক না কেন—পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে তারা কিন্তু দাঙ্গাকে মহামারী আকারে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। বিশেষত কুমিল্লাতে এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে কৃষক সভার সদস্যারা কমরেড কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক ও কমরেড ইয়াকুবের নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে দাঙ্গা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সবাইকে নিয়ে তাঁরা ছিলেন অস্ত্র হাতে নিদ্রাহীন প্রহরী। নোয়াখালির দাঙ্গা হয়তো তাই পার্শ্ববর্তী

জেলাগুলিতে ছড়াতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে কমিউনিস্ট পার্টি চেষ্টা করেছিলো সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে এক আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং সেটা হবে 'শ্রেণী-সংগ্রামের' দৃষ্টিভঙ্গিতে। আমাদের স্বীকার করতেই হয় এই সামাজিক অভ্যুত্থান নাম নিয়েছিলো 'তেভাগা আন্দোলন' রূপে।[২০] তবে 'তেভাগা' আন্দোলনটা আরো কিছু সময় পূর্বেই গ্রাম-বাংলায় মাটির গন্ধে জন্ম নিয়েছিলো—একথাও বলা অত্যুক্তি হবে না। যাহোক, গান্ধীজী নোয়াখালিতে থাকাকালীন আমিশাপুরের নিকটে নবগ্রামে সমর্থন জানালেন এই আন্দোলনকে ৩০শে জানুয়ারি, কিন্তু প্রকাশিত 'তেভাগা বিল'-কে সাম্প্রদায়িক বিষয়ের কথা বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন (১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭)। নানা কারণে এই আন্দোলন সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়।[২১]

১. অতীশ দাশগুপ্ত : দেশহিতৈষী, শারদ সংখ্যা, ১৪০১ : প্রবন্ধ : পৃঃ ৭০ (১৯৪৬ সালের গণ-আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের ভূমিকা)
২. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৭০-৭১
৩. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৭১
৪. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৭১
৫. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৭২
৬. অমলেশ ত্রিপাঠী : স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস : পৃঃ ৪০৪
৭. হারুণ-অর-রশিদ : বাংলাদেশের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) : পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯ ("বঙ্গীয় মন্ত্রীসভা, ১৯৩৭-১৯৪৭)
৮. সিরাজউদ্‌দীন আহমেদ . হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী : ভাস্কর প্রকাশনী : ঢাকা : পৃঃ ৮২
৯. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৮২
১০. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ : ভারত স্বাধীন হল : ওরিয়েন্ট লংম্যান : ১৯৮৮ : পৃঃ ১৩৫
১১. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪০৫ : [ম্যানসরাগ ইত্যাদি (সং), ট্রান্সফার অব পাওয়ার, ৬ খণ্ড, পৃঃ ৫২১ ; টমলিনসন, দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অব দ্য রাজ ১৯১৪-১৯৪৭ (কেমব্রিজ, ১৯৭৯), পৃঃ ১৪৭-১৪৮]
১২. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪০৫
১৩. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪০৬
১৪. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪১২
১৫. Stanley Walpert ; Jinnah of Pakistan, 1988, p. 267
১৬. Stanley Walpert : Ibid, p. 268
১৭. Ibid., p. 171-172
১৮. Dr. Sachin Sen, The Birth of Pakistan. General Printers Ltd., Calcutta-13, 1955, p. 155
১৯. Ibid, p. 156
২০. Stanley Walpert, Ibid, p. 273

২১. Ibid., p. 274
২২. ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড) : পৃঃ ৮৭৭
২৩. Quaid-e-Azam Jinnah's Correspondence, Edited by Syed Sharifuddin Pirzada ; Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd. New Delhi (Indian Edition-1981), p. 356-357
২৪. অমলেশ ত্রিপাঠী : স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪২৭
২৫. V.P. Menon, The Transfer of Power in India, Orient longmans,

২৬. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৩০-৪৩১
২৭. Khalid B. Sayeed, Pakistan, The Formative Phase 1857-1948, London, Oxford University Press, Second Edition-1968, p. 151-152
২৮. Ibid., p. 152
২৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ (দলিলপত্র : প্রথম খণ্ড) : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় : নভেম্বর ১৯৮২ : পৃঃ ১৮) ক্যাবিনেট মিশনেব ১৬ই মে-র ঘোষণায় যে সংখ্যাতত্ত্ব দেয়া হয়েছে তা সি. এইচ. ফিলিপস তাঁর 'দি ইভল্যুশান অব ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান' গ্রন্থের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় তুলে ধরেছেন, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় সেখানে থেকে গ্রহণ করেছেন।
৩০. Hector Bolitho, Jinnah Creator of Pakistan, London, Reprinted October 1960, p. 223
৩১. Ibid., p. 221
৩২. Streptomycin. A new era of hemotherapy dawned in 1944 when Schatz Bugie and Waksman published their paper on streptomycin and its action on mvcobacterium tubercle bacillus and related organisms. Feldman and Hinshaw tested its action on animals and man, as they tried promizole before. By 1947, the drug was available in quantity and came into general use by 1949.

Since the introduction of streptomycin, several synthetic antimicrobials and antibiotics have been discovered from time to time. They are among other, para-amino salicylic acid by Lehmann (1946), isonicotinic acid hydrazide by Grunberg et al. (1951), pyrazinamide by McCune (1955), ethionamide, cycloscrene, kanamycin, viomycin, capreomycin, ethambutol and ritampicin.

Lessons of history tell us that the need of the hour is the effective treatment of cases with chemotherapy by combination of drugs for sufficiently long time, through periodic laboratory tests for sensitivity of drugs to the tubercle bacillus, lest drug resistance become a great social danger. One remarkable effect of chemotherapy is the protection afforded to surgical procedures like lung resection. Therapy has marched a long way from the days of empirical drug giving to specific chemotherapy and surgical

excision. The use of Rifampicin in combination with Isoniazid etc., as a primary drug has revolutionized the therapy of tuberculosis and shortened the duration of treatment.*

*ডাঃ কে. এন. রাও, ডাঃ কে. এন. রাও (সম্পাদিত) 'Text Book of Tuberculosis' (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ৮

৩৩. আবুল হাশিম : আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি : দ্বিতীয় প্রকাশ,

৩৪. অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি, ১৯৪৫-৭৫ দ্বিতীয় সংস্করণ · পৃঃ ১৫

৩৫. প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৬

৩৬. আবুল হাশিম : প্রাগুক্ত : পৃঃ ১২১

৩৭. H. V. Hodson, The Great Divide, p. 166

৩৮. Dr. Sachin Sen, Ibid., P. 159

৩৯. Ibid., p. 160-161

৪০. আবুল হাশিম : প্রাগুক্ত : পৃঃ ১২৩

৪১. Stanley Walpert, Ibid., p. 285

৪২. সিরাজউদ্দীন আহমেদ : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৯০-৯১

৪৩ আবুল হাশিম : প্রাগুক্ত : পৃঃ ১২১ (সংক্ষিপ্ত হলেও মূল বিষয়টিকে এখানে তুলে ধরা হলো। জনাব সিরাজউদ্দীন আহমেদের বক্তব্য সেদিনের পুলিস রিপোর্টের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।)

৪৪. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত পৃঃ ৪৪৪

৪৫. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৪৬

৪৬. Stanley Walpert, Ibid., p. 286

৪৭. Ibid., p 286

৪৮. Ibid., p. 286

৪৯. আলাপচারিতা : কমরেড গোলাম কুদ্দুসের (কবি) সঙ্গে বর্তমান লেখকের : ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ : সকাল দশটা

৫০. মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল : কৃষক সভাব ইতিহাস : নবজাতক প্রকাশন : কলকাতা . তৃতীয়

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা

সেপ্টেম্বরের (১৯৪৬) শুরুতেই অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভার সাত সদস্য শপথ নিলেন, নামভূমিকায় (প্রধানমন্ত্রী) অবতীর্ণ হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। কিন্তু পুরোনো সমস্যা নতুন করে উপস্থিত হলো দুভাগে। প্রথমত, ভাইসরয় চাইছেন যে কোনো উপায়ে লীগকে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই করে দিতে, ২৪শে আগস্টে কলকাতা সফরকালে তিনি কি খুব ভয় পেয়েছিলেন? নাকি মিঃ জিন্নার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি কংগ্রেসের প্রতিপত্তিকে গণ্ডিবদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ক্যাবিনেট মিশন উল্লেখিত গ্রুপিং-কে স্মরণ করান, কেননা এটা কার্যকর হলে লীগের মন্ত্রিসভায় যোগদান সহজ হবে—সুগম হবে। প্যাটেল গ্রুপিং বিষয়টি একটুখানি ঘুরিয়ে বলতে চান, Simple majority-কে তো মেনে নেয়া চলে না, তিনি অসমকে কোনো অবস্থায়ই বাংলার সঙ্গে রাখতে সম্মত নন। বড়লাটের সেই এক কথা—ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাটাই বাস্তবায়িত করতে হবে। ৭ই সেপ্টেম্বরে জওহরলাল নেহরু বেতার ভাষণ দিলেন বটে, কিন্তু খোলসা করে কিছুই বললেন না। প্রশ্ন তো পাঞ্জাবের শিখদের নিয়েও, Simple majority-র ফলে শিখরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—তারা কি এটা মেনে নেবে! মিঃ জিন্নাকে ভজাতে গিয়ে বড়লাট তো Simple majority-র প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর বিশ্বাস ক্যাবিনেট মিশনকে যেহেতু তিনি অনুসরণ করছেন তাই খোদ ব্রিটিশ সরকার বা কংগ্রেসের গান্ধীজী নৈতিকভাবে এটাকে মেনে নিতে বাধ্য। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিয়ে বেচারা জওহরলাল না পাঞ্জাব, না অসম, কোনোটাকেই গুরুত্ব দিয়ে উপস্থিত করতে পারছেন না। আগস্টের কলকাতাকে মনে রেখে মিঃ জিন্নাকে সমঝে চলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ, যদিও ২রা সেপ্টেম্বরের পরে বোম্বাই (মুম্বাই) ও আহমেদাবাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি মিঃ জিন্নাকে কতকটা বেকুফ করে দিয়েছিলো; ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধও হয়ে পড়েছিলেন। নেহরুর জন্য দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল কংগ্রেসের মধ্যেই।

অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পরে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না কংগ্রেসের সভাপতির পদটা দখলে রাখা। তিনি জানেন গত দলীয় নির্বাচনে গান্ধীজীর প্রচেষ্টার ফলেই তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হতে পেরেছিলেন, প্যাটেল বাহ্যত এটা মেনে নিয়েছিলেন; মন্ত্রিসভাতে এসে প্যাটেল কী তাঁর প্রতি আন্তরিক হবেন!

২রা সেপ্টেম্বরে মন্ত্রিপরিষদের সাত সদস্য শপথ নিলে লীগ নেতৃত্বের ওপর তার একটা প্রতিফলন ঘটে, এ যাবত মিঃ জিন্নার বিশ্বাস ছিলো লীগকে উপেক্ষা করে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনে বড়লাট সম্মত হবেন না। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রদেশগুলির জোটবদ্ধতা বিষয়ের বিরোধকে ফেডারেল কোর্টের রায়ের উপর নির্ভরশীল হবে বলে অভিমত দিলে ব্রিটিশ সরকার অযথা কালক্ষেপ না করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং গণপরিষদের বিষয় লীগের ওপর ভবিষ্যৎ ছেড়ে না দিয়ে বর্তমানে ঘোষিত কংগ্রেস মনোনীতদের নিয়ে দুটি কর্মই সমাধা করার নির্দেশ পাঠান ওয়াভেলকে। ব্যক্তি ওয়াভেলের ইচ্ছে অনিচ্ছার বিষয়টি এক্ষেত্রে গৌণ বা অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়, তাঁকে অনেকটা বাধ্য হয়েই নেহরুর মন্ত্রিসভাকে স্বীকার করে নিতে হয়। মিঃ জিন্না পড়লেন মহা ফ্যাসাদে, কংগ্রেস যদি মন্ত্রিসভা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা

করতে সক্ষম হয় তাহলে লীগ কি মন্ত্রিসভার বাইরে-ই থেকে যাবে, 'পাকিস্তান' আন্দোলনের বাস্তবতা—গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা তো থেকেই যাচ্ছে, কলকাতার দাঙ্গা তাঁর ইচ্ছে পূরণে সহায়ক হলেও এর দীর্ঘস্থায়ী ফললাভ কতোটা আশা করা সমীচীন হবে—রক্তপাত তো কোনো একটি সম্প্রদায়েরই ঘটছে না!

কংগ্রেস মন্ত্রিসভাতে অংশ নিয়েছে এবং প্রয়োজনে লীগের অংশগ্রহণ ব্যতীত তারা যে মন্ত্রিসভার পূর্ণাঙ্গতা দিতে সক্ষম হবে সে কথা ওয়াভেলেব চেতনায় ছিলো বলেই তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন লীগকে মন্ত্রিসভায় স্থান করে দিতে। এককভাবে কংগ্রেস দ্বারা দেশ শাসিত হলে তিনি নিজেও যে হীনবীর্য হয়ে পড়বেন, বিলক্ষণ এ ধারণা ওয়াভেল পোষণ করছিলেন;এতদ্ব্যতীত সিমলাতে মিঃ জিন্নাকে কংগ্রেসের অজ্ঞাতসারে দেয়া ওয়াদা—Simple majority-র প্রশ্নে যাকে তিনি বাস্তবায়িত করতে ইচ্ছুক। ১৬ই সেপ্টেম্বরে উভয়ের কথা হলো, মিঃ জিন্না বাস্তব অবস্থাটা বুঝে এখন অনেকখানি নরম, তবে দুটো দাবী তাঁর থাকলো, নেহরুর মতো তাঁকেও সহ-সভাপতি করতে হবে, আর এটা হবে অবশ্যই পরস্পরকে সময়ের ভিত্তিতে পালা বদলের নীতি গ্রহণ করে ; বড়লাটকে দেখতে হবে কংগ্রেস যেন অসম্মানজনক শর্ত চাপিয়ে না দেয়। ওয়াভেল দেখলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের প্রধান অবলম্বন হতে পারেন তাঁর সর্বাধিক অপছন্দের ব্যক্তি গান্ধীজী-ই ; ২৬শে সেপ্টেম্বরে ওয়াভেল কথা বললেন গান্ধীজীর সঙ্গে। ভাইসরয়ের ধারণা হলো গান্ধীজী কংগ্রেসের আধিপত্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী, তিনি কাউন্সিলে জাতীয়তাবাদী মুসলিম সদস্যদের (কংগ্রেস) অন্তর্ভুক্তির দাবী ছাড়েননি,—কংগ্রেস কাকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরূপে মনোনয়ন দেবে সেটা কংগ্রেসের-ই বিষয়, সেখানে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের খবরদারি তিনি মেনে নিতে সম্মত নন। ভাইসবয় তাঁর লাগাতার চেষ্টায় শেষঅব্দি তীরে পৌঁছলেন। ১০ই অক্টোবরে লীগ সিদ্ধান্ত নিলো তাঁরা মন্ত্রিসভায় অংশগ্রহণ করবে। লর্ড ওয়াভেল পণ্ডিত নেহরুকে জানাবেন, ১৬ই মে-র ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা বা ঘোষণাকে মেনেই লীগ মন্ত্রিসভায় অংশ নিতে ইচ্ছুক এবং মিঃ জিন্না তাঁকে জানিয়েছেন, লীগ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে এবং গণপরিষদে যোগ দেবে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়েই। H V Hodson লীগের এই যোগদানকে ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু অন্যভাবে:

> This unpromising missive had at least the virtue of telling truthfully why the League was joining the Government Its motives, unless subsumed under the unspecified 'other very weighty grounds and reasons which are obvious', were neither to avert a communal war in India nor to prepare the way for reconciliation in a Constituent Assembly, nor even to discharge a duty to share in the good governance of the country, but to avoid leaving the Congress with a monopoly of central executive power or giving an opportunity for non-League Muslims to appear as national figures and powerful Ministers Once again Mr Jinnah had shown that his perennial tactics had two faces the obverse, refusal

of any compromise or commitment while negotiations were proceeding and while the opposition could be counted upon, out of frustration if for no other reason, to make concessions or commit mistakes , the reverse, to accept less than the whole loaf, though without remitting any jot of claim, when negotiation could achieve no more and the alternative would be to leave the opposition in a situation of long-term advantage.[১]

১৩ই অক্টোবরে (১৯৪৬) মিঃ জিন্না লিখিতভাবে জানালেন যে লীগ অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় যোগ দেবে। কিন্তু এ কথা প্রকাশ পেলো লীগ মন্ত্রিসভাতে যোগ দিচ্ছে 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়ে, মন্ত্রিসভার সুষ্ঠু পরিচালন নয়, লীগের অস্তিত্ব এবং পাকিস্তান গঠন প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতেই এটা তাদের একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত বই অন্য কিছুই নয়। বড়লাট নেহরুকে জানালেন লীগের জন্যে কোন্ কোন্ Port Folio বরাদ্দ করতে হবে, তাঁর ইচ্ছে অর্থ, বিদেশ, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা এই তিনটির যে কোনো একটি লীগের জন্য অবশ্যই দেয়া হোক ; শেষ পর্যন্ত অর্থ দপ্তরই বরাদ্দ হলো লীগের জন্যে। প্রশ্ন হয়েছিলো, মৌলানা আজাদ অর্থ দপ্তরকে কংগ্রেসের হাতে রেখে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরকে লীগের হাতে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন কেন? কংগ্রেস তাঁর এই প্রস্তাবকে শুধু যে অস্বীকারই করেছে তা-ই নয়, একাংশ তাঁকেও বাঁকা চোখে দেখেছে ; কেননা বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধের বর্তমানে যে অবস্থা সেখানে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা লীগের হাতে ছেড়ে দেয়া শুধু নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে না, পক্ষান্তরে লীগের উত্থানকে উৎসাহিত করে বলা চলে। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই চেতনা ছিলো যে ভুল তা পরবর্তীতে ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে, সরকারের মূল চাবিকাঠি যে অর্থ দপ্তর তাকেই তারা গুরুত্ব দেয়নি। জওহরলাল নেহরু সিদ্ধান্ত নিতে প্রথমটায় চিন্তায় পড়লেও রফি কিয়োদাই-এর পরামর্শে এবং প্যাটেলের স্বরাষ্ট্র দপ্তর চাই বলে একগুঁয়েমীতে শেষটায় লীগকে অর্থ দপ্তর দিয়ে প্যাটেলকে খুশি করতে বাধ্য হলেন তিনি। লীগের পক্ষে ব্যাপারটা হলো 'মেঘ না চাইতেই জল'-এর মতো। যদিও প্রথমটায় লিয়াকত আলী খান শঙ্কিত ছিলেন—এই বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে পরিকল্পনামাফিক কতোটা তিনি এগোতে পারবেন, তাঁর মানসিক দোদুল্যমানতাকে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করলো কয়েকজন মুসলমান উচ্চপদস্থ ঝানু আমলা—বিশেষ করে মহম্মদ আলীর আশ্বাস। লীগের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভায় আসন নিলেন লিয়াকত আলী খান, আই. আই. চুন্দ্রীগড়, আবদুর রব নিস্তার, গজনফর আলী খান এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। The Great Calcutta Killing-এ মিঃ জিন্নার প্ররোচনা ছিলো বা ছিলো না এই বিতর্কে না গিয়েও সহজভাবে বলা চলে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা যে এর ফলে আপাতদৃষ্টিতে মদত পেয়েছিলো এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকা চলে। লীগ মন্ত্রিসভাতে এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে উজ্জীবিত না করে বা এ বিষয়ে চেষ্টা না চালিয়ে বরং মন্ত্রিসভাকে অচল করে কংগ্রেস লীগ বিরোধকে ক্রমশ প্রকট করে তোলে। লীগ মন্ত্রিসভায় যোগ দিলো কিন্তু তাঁদের ২৯শে জুলাইয়ের সিদ্ধান্ত (ক্যাবিনেট মিশনের

পরিকল্পনা বর্জন) প্রত্যাহার না করে বরং গণ-পরিষদের বৈঠক যাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রাখা যায় তার প্রচেষ্টা চালালো।

১০ই অক্টোবরে লীগ কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভাতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আর ওই দিনেই নোয়াখালি সদর ও ফেণী মহকুমায় কলকাতার গণহত্যার বদলা নিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। কলকাতার গণহত্যার প্রতিরোধে শেষদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তৎপর হলেও নোয়াখালির গণহত্যায় (হিন্দু নিধন কর্মে) তাঁকে প্রথম থেকেই অপূর্ব নীরবতা পালনে দেখা যায়, অবশ্য এখানেও শেষ পর্যন্ত তিনি সক্রিয় হতে বাধ্য হয়েছিলেন (আন্তরিক ছিলেন কি-না তা বলা দুরূহ), কিন্তু সেই বাধ্য-বাধকতাও ছিলো অনেকটাই লোক-দেখানো। ভাবতে বিস্ময় জাগে, বর্বরতা বা পাশবিকতার প্রতিউত্তর একই আচরণ দ্বারা যে সম্ভবপর নয় সে কথা কি সোহরাওয়ার্দীর চেতনায় আসেনি ; একই ধরনের বর্বরতা হিন্দুদের একাংশ বিহারেও ঘটায়, প্রশাসন কি দীর্ঘ সময়ের অপেক্ষায় থেকেছে? সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার চরিত্র যদিও কাটারের (এম. ও. কাটার) মতে—খুন, ধর্ষণের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা মামলাগুলো বার বার তুলে নেয়ার নির্দেশ দেয়, বিহারেও দু'দফায় হত্যাকাণ্ড সংগঠিত কিন্তু গভর্ণর Dow ও কংগ্রেস মন্ত্রিসভা একে দমনেও দৃঢ়তা দেখায়—যা বাংলার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিলো। বাংলার গভর্ণর বারোজ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন, কেননা লীগ তো এবারেও বাংলাকে হাতিয়ার করেছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উপায় হিসেবে। বড়লাট নিজে যুদ্ধের সেনানী হওয়া সত্ত্বেও ভারতের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে স্বীয় তৎপরতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন, অনেকের ধারণা (অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁদের অন্যতম) লীগ, মিঃ জিন্না এবং তাঁদের Direct Action-এর কাছে ওয়াভেল নতি স্বীকার করেছিলেন—প্রশাসনে থেকে যা তাঁর পক্ষে করা একান্তই জরুরী ছিলো মানবতা বাঁচাতে ও প্রাণহানি নিবারণের জন্য তা তিনি উপেক্ষা করেছেন জেনেশুনেই।

যা হোক, এবারে বড়লাটকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে গণপরিষদ আহ্বানের এবং তিনি ২০শে নভেম্বরে লীগ-কংগ্রেস উভয়কেই আমন্ত্রণলিপি দিলেন ৯ই ডিসেম্বরে গণ-পরিষদের অধিবেশনের। মন্ত্রিসভাতে নিজে না গিয়েও মিঃ জিন্না লীগের প্রতিনিধিদের মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, কিন্তু ভাইসরয়ের গণপরিষদের সভা ডাকার বিষয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন:

> Mr. Jinnah described this as a grave and serious blunder, and accused the Viceroy of appeasing the Congress in blindness to the realities of the situation. He called on Muslim Leaguers not to participate in the Constituent Assembly and emphasised that the League still rejected the Cabinet Mission plan[২]

কংগ্রেসের বক্তব্য হলো, হয় লীগ গণ-পরিষদের সভায় যোগ দেবে নয়তো তারা মন্ত্রিপরিষদ থেকে ইস্তফা দিক। লীগও প্রয়োজনে দৃঢ়তা দেখাতে কুণ্ঠিত হলো না:

> On November 21, Jinnah ordered that no member of the Muslim League was to take his seat he said, "I deeply regret that the Viceroy and His Majesty's Government have decided to summon the Constituent Assembly on December 9. In my

অতএব, লীগ মনোনীত মন্ত্রীদের পদত্যাগ করাই সমীচীন, স্মরণযোগ্য বিষয় হলো গত জানুয়ারি থেকেই বিভিন্ন প্রদেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটতে থাকে। প্যাটেলের সন্দেহ নিরর্থক ছিলো না এই জন্যে যে, এরকম হলে প্রশাসন তো দূরের কথা—সৈন্যবাহিনীতেও বিভাজন দেখা দিতে পারে এবং সেটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

> The general situation in the country was alarming. The central Government was a house divided against itself. In further communal disorders, it was doubtful if the loyalty of the Army and the Services could be relied upon His Majesty's Government therefore took a bold and momentous decision, namely to fix a definite date for its withdrawal from India. The Labour Government decided on this course in the hope that, besides establishing its bonafides, a time limit would serve as a challenge to bring home to the Indian parties the imperative need for coming to a mutual understanding.[১]

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর চিঠি পেলেন ওয়াভেল। ভারতের ভাইসরয়ের পদ থেকে তাঁকে ব্রিটিশ সরকার অব্যাহতি (মূলত বরখাস্ত) দিয়েছে ; প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর দেখানো কারণগুলি অনেকটা মামুলী ও আইনমাফিক ছিলো। প্রধানমন্ত্রীর চিঠির মধ্যে অবশ্য উল্লেখ ছিলো—ভারতীয়দের জন্যে এক নতুন পর্বের সূচনার কথা, বর্তমানে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের প্রয়াসের কথা বা ইঙ্গিত। ভারত হিতৈষী লর্ড ওয়াভেল সংকটের এক দুর্যোগ মুহূর্তে বরখাস্ত হলেন, কংগ্রেস বারবার তাঁকে লীগের প্রতি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট দেখেছে—লীগ মনে করেছে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসকে মদত দিয়েছে হিন্দু প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখতে। তাঁর বরখাস্তের অন্যতম কারণ হতে পারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে দ্বি-মত থাকাটা।

ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত অচল নোটের মতো মূল্য বহন করতে শুরু করলে ব্রিটেনের শ্রমিক দল সমূহ ক্ষতির গন্ধ পেয়ে তড়িঘড়ি ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে উদ্যত হলো, আর এটাকেই লর্ড ওয়াভেল যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি। তাঁর মতামত ছিলো, শতাধিক বছরের বেশী ব্রিটিশ ভারত শাসন করার পরে এক অরাজকতাপূর্ণ অস্থির রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সে কী যেমন করে হোক মাথার বোঝা পায়ে ফেলবে, তাহলে যে ব্রিটিশের সদিচ্ছা ও প্রশাসনের উৎকর্ষতার দৃষ্টান্ত ম্লান হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে যদি সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক কারণে ভারতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তার দায়িত্ব কি ব্রিটিশ সরকারের উপর বর্তাবে না? অতএব, সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশেই উচিত হবে ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছার নিদর্শন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া। অ্যাটলী চাইলেও লর্ড ওয়াভেল সম্মত ছিলেন না ভারত থেকে ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার দিন-ক্ষণ পূর্বেই ঘোষণা করার ; ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাওয়াটা যে কেবলমাত্র অগৌরবের তা নয়—নীতিবিরুদ্ধও বলে মনে করতেন লর্ড ওয়াভেল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর বদ্ধমূল ধারণা ছিল একবার দিন-ক্ষণ ঘোষণা হলে ভারতীয়রা সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব বহন করতে নমনীয় হবে এবং স্বাধীনতার গুরুত্ব ও ঐতিহ্য বহন করতে

সক্ষমও হবে। ওয়াভেল চেয়েছিলেন আরো কিছুটা কালক্ষেপ করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে বল্গা পরিয়ে তবে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া হোক, আর এজন্যে ভারতীয়দের স্বাধীনতা পেতে কিছুটা বিলম্ব ঘটলে তা অবিবেচনাপ্রসূত বলে কেউ মনে করবে না। বস্তুত, প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী লর্ড ওয়াভেলের ওপর যেমন বিশ্বাস ও ভরসা করতে পারেননি তেমনি ভারতীয় রাজনীতিতে ধর্মের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি, কার্যকারিতা এবং হিংস্র উন্মাদনার সংবাদ রাখলেও তা কতোখানি অমানবিক আর পৈশাচিক হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন কেবলমাত্র অনুমান নির্ভর ও পরোক্ষ তথ্যের দ্বারা পরিচালিত। যদিও অতীতকে স্মরণ করে আমাদের বলতেই হয় অ্যাটলী ও ক্রিপসের বাস্তব রাজনীতিজ্ঞান আর সমস্যাকে বিশ্লেষণের ক্ষমতা—সমস্যা থেকে উত্তরণের উদ্ভাবনী শক্তি ছিলো দৃষ্টান্তমূলক। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী নির্ভর করেননি ভাইসরয় ওয়াভেলের ওপর, বরং ভাইসরয়কে সরিয়ে দিতে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথা বললেন জানুয়ারির ৭ তারিখেই, ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে দিলেন নতুন ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলকে নিয়োগপত্রের আশ্বাস।

একটুখানি পিছনে ফিরে তাকালে দেখবো, কলকাতার বীভৎস গণ-হত্যার পরে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ ২০শে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের ২ তারিখের পূর্বের সময়কে সামনে রেখে কংগ্রেস-লীগ-ভাইসরয় প্রসঙ্গে Leonard Mosley বলেন:

> And perhaps greatest of all the impediments to a solution was mistrust. Jinnah and the Muslim League mistrusted Congress. Congress mistrusted the Viceroy The Viceroy mistrusted the Government at home, particularly Mr. Attlee Mr. Attlee did not necessarily mistrust the Viceroy, but he had certainly lost faith in him Just before the end of August 1946, he showed it. In a private telegram, he told Lord Wavell that he was overruling him. Wavell still wished to postpone the swearing-in of the interim Government until the Muslim League could be persuaded to join it. He was convinced that dogged effort and determination–plus a little Congress generosity and increasing pressure upon Jinnah–would get them in Attlee said that further delay would only exacerbate the tempers of the Congress Party leaders and perhaps lead to a definite break between them and the British authorities, as a result of which civil disobedience and anti-British agitation might once more sweep the country.[৮]

ভাইসরয়কে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মানতেই হলো, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হলো ঠিকই, কিন্তু সমস্যা যে তিমিরে ছিলো সেখানেই থেকে গেলো—কোনো স্থায়ী সমাধান হলো না। মিঃ অ্যাটলী কিন্তু ভাইসরয়ের অভিপ্রায়টা এখান থেকেই অনুমান করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চাননি লর্ড ওয়াভেলের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা প্রদান বিষয়ক আলাপ-আলোচনা আর ক্রিয়া-কর্ম সম্পন্ন হোক, কেননা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো ওয়াভেল কোনো একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের পক্ষপাতি এবং যে দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতা দ্বারা পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দুটি রাজনৈতিক সংগঠনকে সংকটপূর্ণ সময়ে এক

টেবিলে বসানো যায়—তা ওয়াভেল হারিয়ে ফেলেছেন। বস্তুত, কি ভারতে কি ব্রিটেনে লর্ড ওয়াভেল তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্মে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন, কমন্সসভায় প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলীর বক্তব্য, 'I came to the conclusion what Wavell had shot his bolt.' ১৯শে ফেব্রুয়ারি সকালে জর্জ এ্যাবেলের (George Abell) সঙ্গে প্রাতরাশের টেবিলে তিনি বরখাস্তের হুকুমনামা পান শ্রমিক সরকারের পক্ষ থেকে, তবে প্রথা অনুসারেই নতুন ভাইসরয় না আসা পর্যন্ত তাঁকেই কাজটা চালিয়ে যেতে হবে।

২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যাটলী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করলেন শান্তিপূর্ণভাবে ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং সমগ্র প্রক্রিয়াটির ইতি টানতে হবে ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যেই। ২০শে ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় এটা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পেলো যে ব্রিটেন আন্তরিকভাবেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চলেছে। নতুন ভাইসরয় হিসেবে এ্যাডমিরাল মাউণ্টব্যাটেনের নামও মিঃ অ্যাটলী পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন। তাঁর ঘোষণাকে কেন্দ্র করে উচ্চকক্ষ (House of Lords) এবং পার্লামেণ্টে পক্ষে বিপক্ষে Viscount Temple wood, Lord Holifax, Lord Simon, Winstan Charchill, R. A. Butler, Sir Jhon Anderson প্রমুখ বক্তব্য রাখেন ; তবে Lord Simon এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Winstan Charchill—এঁরা দুজনেই বর্তমানে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানে আপত্তি জানান এবং তাঁরা মনে করতেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হলে অবশ্যই মিঃ জিন্না এবং তাঁর পাকিস্তান দাবীর প্রতি সহানুভূতি দেখানোর যৌক্তিকতা আছে, পরোক্ষভাবে তারা দেশভাগে মিঃ জিন্নাকে উৎসাহিত-ই করতেন। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন :

> We Could not accept the forcing of unwilling provinces into a united Indian Government if they have not been represented in the making of the constitution.[১]

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো প্রধানমন্ত্রী অ্যাটালী তাঁর সরকারের পক্ষে, ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যে যে ভাষণ দেন তা ভারতবাসীর জন্যে যেমন ছিলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তাঁর বক্তব্যমালার মধ্যেও ছিলো অন্যতম স্মরণীয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে প্রদেশগুলো অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলো তাদের মধ্যে বাংলা ও পাঞ্জাব বিশেষ গৌরবের দাবীদার হতে পারে। তাদের এই দাবীর থেকেও অধিকতর সত্য হলো স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমসাময়িক পরিস্থিতির অকালবোধনে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো সর্বাধিক। এই দুটো প্রদেশের মধ্যে বাংলা জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে মুসলমানরা কিছুটা এগিয়ে থাকলেও শিক্ষা এবং সরকারী চাকরিতে অন্যান্য প্রদেশের মতো তারা ছিলো অনেকটা পিছিয়ে। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পূর্বদিন পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অধীনে মুসলমানরা বাংলা শাসন করছিলো বলেই স্বাভাবিকভাবে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিভেদের প্রাচীর

গড়ে ওঠে। একদিকে ক্ষমতা লাভের ওজস্বিতায় মুসলমানরা অধিকার আদায়ের দাবীতে সোচ্চার হয়ে তাকে সর্বভারতীয় রাজনীতির চৌকাঠে দাঁড় করায়, অন্যদিকে হিন্দুরা কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হককে হিন্দু শুভাকাঙ্ক্ষী না ভাবলেও সোহরাওয়ার্দীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলেই মনে করতো। কিন্তু ১৯৪০-এ লাহোরে লীগ সভায় ফজলুল হকের ভূমিকা বাংলার হিন্দুদের মুখ্য অংশকে বিচলিত করে, পরবর্তীতে অস্থির ফজলুল হকের আচরণে তারা দোদুল্যমান, কিন্তু পুরো হতাশ হয়নি। খাজা নাজিমুদ্দীন এবং সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে (মুখ্যমন্ত্রিত্ব) হিন্দু-মুসলমানের মধে অবিশ্বাস, বৈরী মনোভাব, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মকে বাংলায় পুনর্বাসন দেয়। কলকাতা নতুন করে ইতিহাসে চিহ্নিত হলো বর্বর আচরণের ছায়াবাজিতে ; হিন্দু না মুসলমান কে বেশী মারা পড়েছে—এ প্রশ্নের চেয়ে বড়ো সংবাদ ইতিহাস তুলে নিলো শতাব্দীর বৃহত্তর পাশবিক কাণ্ডের নিদর্শন হিসেবে—অগণিত মানুষের মৃত্যুকে চিহ্নিত করে। নোয়াখালি আর বিহার চিহ্নিত হয়ে রইলো সংখ্যালঘুর ওপরে সংখ্যাগুরু জনগণের একাংশেব তাণ্ডব-হত্যা-ধর্ষণের দূরপনেয় কলঙ্ক হিসেবে। ব্রিটিশের প্রতিনিধিরা থেকেও হীনবীর্য। প্রতিকারহীন অপরাধ ডেকে আনে ভবিষ্যত ভারতের জন্য বিভাজন রেখা, ভগৎ সিং-এর পাঞ্জাব—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষের বাংলা আর ভারত—বিচারের বাণী আর মিলনের মহামন্ত্র ভুলে ডুবে গেলো রক্তক্ষয়ী প্লাবনে।

বিভাজনের উৎসকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সাহসে ভর করে ইতোপূর্বে এগিয়ে এসেছিলেন রাজাগোপালাচারী, তিনি কার প্ররোচনায় এটাকে গান্ধীজী পর্যন্ত টেনে নিয়েছিলেন তা পরিষ্কার না হলেও এর পিছনে যে মিঃ জিন্নার শুভেচ্ছা আর বড়লাটের আগ্রহ ছিলো তা স্বীকার্য ; বস্তুত, ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ আমলারা দেখছিলেন এ রকম একটা প্রস্তাব বাজারে ছাড়া হলে তা কতোটা জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে—হিন্দু আর মুসলমান কোন্ সম্প্রদায় কতোটা গ্রহণ করবে। মিঃ জিন্না 'মারো জোরে হেঁইও' বলে আন্দোলনটা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, পাকিস্তান আন্দোলনের নির্ভরতা হিসেবে বাংলাকে উপযুক্ত ভিত্তিভূমি চিহ্নিত করে এবং নিশ্চিন্ত হয়েই তিনি লক্ষ্য দিলেন পাঞ্জাবের প্রতি—সেখানে যে খিজির হায়াত খানের মন্ত্রিসভা রয়েছে ; এই নালায়েককে এবার মদদ-ই-মা'শ-এর খেলায় কাছে টানতে পারলেই কেল্লা ফতে ; অন্যথায় তাঁকে যে প্রকারেই হোক ঠেলে ফেলতে হবে।

১৯৪২-এর ডিসেম্বরে স্যার সিকান্দার হায়াত খান ইন্তিকাল করলে তাঁর স্থলে অভিষিক্ত হলেন খিজির হায়াত খান। স্পষ্টভাবেই একথা বলা চলে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী (Chief Minister) হিসেবে স্যার সিকান্দার হায়াত খানের দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি ছিলেন না খিজির হায়াত খান। ১৯৪৪-এ মিঃ জিন্না সরাসরি খিজির হায়াত খানকে জানালেন যে লীগের কাছে তার দায়বদ্ধ থাকা উচিত, কেননা তাঁর ইউনিনিস্ট পার্টিতে লীগ সদস্যরাও মিশে রয়েছে। মিঃ জিন্না আরো একধাপ এগিয়ে বললেন—ইউনিনিস্ট পার্টির নাম বদলে ফেলা উচিত—আর তাদের নতুন নামটা হতে পারে 'মুসলিম লীগ কোয়ালিশন পার্টি'। সহজেই অনুমান করা যায় মিঃ জিন্না খিজির হায়াত খানের ওপর নিজের বা লীগের প্রভুত্ব চাপিয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন ; কেননা পূর্বেই সিকান্দার হায়াত খানের সঙ্গে উভয়ের চুক্তি হয়েছিলো।

এবারে খিজির হায়াত খান মিঃ জিন্নার প্রস্তাবকে উপেক্ষা করলেন, মিঃ জিন্নাও পূর্ববর্তী চুক্তিকে আর মানতে চাইলেন না, যদিও পূর্বের চুক্তিতে বর্ণিত ছিলো—যেহেতু লীগ একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল তাই সে পাঞ্জাবের বিষয়ে এই চুক্তি অনুসারে আর নাক গলাবে না।[১০] অবশ্য লীগের লক্ষ্যটা ছিলো পাঞ্জাবে নিজেদের প্রাধান্য সৃষ্টি করা, আর তার উপায় হিসেবে এটা মিঃ জিন্নার এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা। প্রথমত, ইউনিনিস্ট পার্টি তাদের নাম বদল করলে এবং লীগের দেয়া নাম গ্রহণ করলে অনায়াসেই ইউনিনিস্ট পার্টির মধ্যে লীগের প্রাধান্য সূচিত হবে এবং ক্রমশ খিজির হায়াত খান লীগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন ; অদূর ভবিষ্যৎ-এ তাদের লীগের মধ্যে লীন হতে হবে অথবা গুরুত্ব হারিয়ে বাংলার ফজলুল হকের মতো বিষহীন অবস্থায় থাকতে বাধ্য হতে হবে। স্বল্পতম পরিশ্রমে লীগ পাঞ্জাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে, ফলশ্রুতি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনটা নতুন মাত্রা লাভে সক্ষম হবে—যা মিঃ জিন্নার কাছে একান্তভাবে জরুরী। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো মিঃ জিন্নার দেয়া প্রস্তাব যদি খিজির হায়াত খান এবং তাঁর দল গ্রহণ না করেন তাহলে এখন থেকেই সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সামনে লীগ সরাসরি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা উত্থাপনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করতে উৎসাহী হবে, কেননা পাঞ্জাব এবং বাংলা ব্যতীত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনে লীগ মুসলিম আসনে সংখ্যাধিক্য আসন লাভ করেও—এ্যাসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের স্থলাভিষিক্ত হয়েও মন্ত্রিসভা গঠন করতে ব্যর্থ হলো ; খিজির হায়াত খানের ইউনিনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেস ও শিখেরা সমর্থন করায় তিনিই সরকার গঠন করে প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) হলেন। মিঃ জিন্না এটাকে একটা পরাজয় হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিপক্ষকে সর্বদা বিচলিত করার নীতি গ্রহণ করেন। পূর্বাহ্নে ২৯শে জুলাই (১৯৪৬) 'Direct Action Day' সভায় পাশ হয়েছিলো, কিন্তু ১৬ই আগস্টে একে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে এর কিছু কিছু অসঙ্গতি ও ব্যর্থতা ধরা পড়লেও কলকাতার গণহত্যায় উপস্থিত-মতো কাজ করা ব্যতীত লীগের নতুন দীর্ঘমেয়াদী কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। কিন্তু এর পর থেকেই কলকাতা দাঙ্গায় পর্যুদস্ত লীগ প্রচেষ্টা চালালো নিজের আধা-সামরিক বাহিনী 'ন্যাশনাল মুসলিম গার্ড'কে রীতিমতো সশস্ত্র করে গড়ে তোলার এবং এই পরিকল্পিত আগ্নেয়াস্ত্র বহনকারী বাহিনী ১৯৪৭-এর শুরু থেকেই পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে নামে। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের পাশাপাশি হিন্দুমহাসভার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক বাহিনীও অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে ; শিখদের তো মুক্তি কৃপাণ রয়েছে-ই। অস্ত্রের ঝনঝনা এবং মৃত্যুর বিভীষিকা পাঞ্জাবকে গ্রাস করলে খিজির হায়াত খান মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক উভয়কেই বে-আইনী ঘোষণা করেন, কিন্তু ২৫-২৬শে জানুয়ারি লীগ নেতৃত্বের প্ররোচনায় লাহোরে ব্যাপক বিশৃংখলা দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী খিজির হায়াত খান উভয় সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন ২৭শে জানুয়ারি। তবু লীগ তাদের কর্মসূচী অব্যাহত রাখে। খিজির হায়াত খান প্রাথমিকভাবে নৈপুণ্য দেখিয়ে সার্থকতা লাভে কিছুটা সক্ষম হলেও অচিরেই কলকাতা নোয়াখালি—বিহারের সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প এবং তার প্রভাবকে পাঞ্জাবে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হলেন।

পাঞ্জাবের প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ইফ্‌তিখার হুসেইন খান (মামদুত) নিজেই

এ বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন।

> As President of the Punjab Provincial Muslim League, he had organized the campaign against Khizr Hyat's Ministry, but he could not draw on this sort of experience to tackle matters of administration and parliamentary government Later, it was disclosed that he and other members of the Working Committee of the Punjab Provincial Muslim League had been busy in October 1946, in purchasing and collecting arms and ammunition for the forthcoming communal riots [১১]

অন্য একটি বিষয়কেও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যিক, খিজির হায়াত খানের প্রাদেশিক সরকার লীগ সাহায্য ব্যতীত যে অচল তা প্রমাণ করতে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে জানুয়ারি (১৯৪৭) থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বেসামাল খিজির হায়াত খান ৩রা মার্চে হঠাৎ করেই পদত্যাগ করেন। শিখদের নেতা তারা সিং বসে ছিলেন না, তিনি লাহোরের আইন সভা কক্ষের সামনে প্ররোচনামূলক শিখ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিয়ে 'রাজ করেগা খালসা' ধ্বনি তুলে তলোয়ার ঘোরান। এর পরেই লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, আট্টোক, রাওয়ালপিণ্ডিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বীভৎসতা নিয়ে উপস্থিত হয়।[১২] গভর্ণর ৯৩ ধারা প্রয়োগ করলেন, কিন্তু পরিস্থিতি নানা কারণেই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী কয়েক মাসে পাঞ্জাবে শিশু, নারী-পুরুষ মিলিয়ে পাঁচ হাজার মৃতের সংখ্যা সি. এইচ. ফিলিপস্[১৩] উল্লেখ করলেও প্রকৃত সংখ্যাটা তার থেকে অনেক বেশী—যার সঠিক সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই নিরূপণ করা পরবর্তীতে আর সম্ভব হয়নি। মিঃ জিন্না বিধ্বস্ত পাঞ্জাবের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কৃতিত্বের হাসি হাসেন, 'পাকিস্তান আসতে হয়তো আর খুব বিলম্ব ঘটবে না'। প্রসঙ্গক্রমে সিন্ধুর রাজনীতিতে লীগের চাতুর্যও লক্ষণীয়। ১৯৪৫-এর সাধারণ নির্বাচনে সিন্ধুকে নিয়ে ব্যাপারটা হলো কিছুটা গোলমালের, ৪৫ আসনের মধ্যে লীগ পেলো ২২টি এবং সঙ্গে সঙ্গেই তারা সরকার গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। লীগের তরফে স্পিকারও নির্বাচিত হলো, তাই স্পিকারকে ছেড়ে দলের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২১। কিন্তু বিরোধীরা একত্রিত হলোঃ

> The remaining twenty-three menmbers of the Sind Assembly had combined to from a coalition opposition, but the one representing the labour constituency had been neutral, so that the coalition strength had dropped to twenty-two The Speaker resigned his office and thus the League and coalition strength became even. Neither side was now prepared to sacrifice a vote by allowing one of its members to become Speaker [১৪]

যেহেতু পরস্পর বিরোধী দুই শিবিরের সদস্য সংখ্যা বাইশ করেই সমসংখক এবং তাদের প্রচেষ্টায় সরকার গঠনের কথা কল্পনাবিলাসীদের পক্ষেও অচিন্তনীয়। তাই গভর্ণর নতুন করে নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। এবারে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে লীগ সিন্ধু প্রদেশে সরকার গঠন করে। নির্বাচনে লীগের প্রধান শ্লোগান ছিলো মুসলমানদের জন্য নিজস্ব রাষ্ট্র—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। একথা স্বীকার্য, পরিকল্পনা ভালো হোক বা মন্দ-ই হোক—লীগ কিন্তু

একে একে তার উদ্দেশ্য পূরণের পথে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গঠনে কৃতকার্য হতে থাকে; তাই এ সময়ে লীগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য কবা চলে,—পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। প্রসঙ্গক্রমে ডিসেম্বরে (১৯৪৬) মিঃ জিন্নার সঙ্গে কাঞ্জি দ্বারকাদাসের লণ্ডনের আলাপচারিতার একটা অংশ আমরা দেখতে পারি:

> Jinnah asked me all about my trip to U. S A. I told him that I was away from India for about seven months and I was, therefore, not able to understand what was happening to the country "Country, what country?" Jinnah asked "There is no country There are only Hindus and Mussalmans" I found that Jinnah wanted no settlement except on basis of Pakistan He wanted to keep the fight on because he was badly handled and treated and abused by the Congress leaders. .. I put it to Jinnah that the Muslim League and the Congress could carry on their quarrels outside the Government in regard to the Constituent Assembly and the future constitution of the country, but was it not essential that they should work together inside the Government and do as much as they possibly could for the country? Jinnah replied "What do you mean? How can it be possible? Do you mean to say that you and I can kiss each other in this room and go out of the room and stab each other?" This clearly implied that Jinnah did not want to co-operate and do any work inside the Interim Government and that he had sent his five men of the Muslim League to Join Wavell's Executive Council not to do any work, but to stop the Congress members also from any work and to sabotage the whole Government machinery from inside [১৫]

শুধু কাঞ্জি দ্বারকাদাসের বক্তব্যই নয়, এসময়ে মিঃ জিন্না পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাঁর সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা ও শক্তি অব্যাহত রাখেন। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় লীগ সদস্যদের স্থান লাভের মূল কারণকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা চলে, কিন্তু পাঞ্জাব-বাংলা-সিন্ধু-উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ—মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশগুলিতে মিঃ জিন্না যে কোনো মূল্যে লীগের নামে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র—বিশেষ করে ইসলামী চেতনা, আদর্শ ও নীতি মেনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা কাম্য হলেও ঘোরতর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বাইরেই তাঁদের অবস্থান ছিলো। কিন্তু খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে লীগপন্থী নেতৃত্বের ক্রমাগত প্রচারে সাম্প্রদায়িকতার বীজ জল-বায়ু পেয়ে আলোতে বেরিয়ে আসে। লীগ নেতৃত্ব বিভিন্ন প্রদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থার মাধ্যমে মূল লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জনে অগ্রসর হয় এবং মিঃ জিন্নাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন লিয়াকত আলী খান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ইস্পাহানি প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। হিন্দু রাজনীতিবিদদের একাংশের মধ্যে যে সহনশীলতার অভাব ছিলো না তা নয়, হিন্দুমহাসভার উগ্র প্রচারের প্রতিউত্তরে

লীগেরও অসহিষ্ণুতা সামগ্রিকভাবেই পরিস্থিতিকে ঘোলা করে তোলে;মিঃ জিন্না ধাপে ধাপে এর সুযোগ কাজে লাগান। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা যেভাবেই হোক, মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পাকিস্তানে রাষ্ট্রগতভাবে ইসলামী চিন্তা-চেতনা কাজ করবে এ কথা মুখে মিঃ জিন্না প্রকাশ করলেও নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার কথা তিনি ভাবেননি, পাকিস্তান সৃষ্টির পরে পুনরায় বিষয়টি উত্থাপিত হয়, কিন্তু ১৯৪৭-এর ১১ই আগস্টে তাঁর দেয়া ভাষণেও এমন কোনো ইঙ্গিত ছিলো না। প্রয়োজনে আমরা মুহাম্মদ আসাদ-এর বক্তব্য দেখতে পারি·

> বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানেব ভবিষ্যত শাসন-সংবিধান সম্পর্কিত প্রশ্নটিই আমাকে সবচেয়ে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই সংবিধানেব রূপ কি হওয়া উচিত তা এখন যেমন, তখনো তেমনি সকলেব নিকট মোটেই স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার একটি ইসলামী রাষ্ট্রের কল্পনায—এমন একটি বাষ্ট্র, যার ভিত্তি (প্রচলিত সকল রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগ থেকে স্বতন্ত্ররূপে) জাতীয়তাবাদ বা বংশগোত্রের উপর নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে আল-কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত—তারই স্বপ্নে আমাদেব দেশের অধিকাংশ লোক যদিও অনুপ্রাণিত তবুও তখনো পর্যন্ত সরকার পরিচালনার যেসব পদ্ধতি ও যেসব প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রকে একটা সুস্পষ্ট ইসলামী চবিত্র দান করবে এবং একই সঙ্গে বর্তমান যুগেব চাহিদাও পূবণ কববে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না। জনসংখ্যার একটি অংশ সরল বিশ্বাসে ধবে নিয়েছিল যে, প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গণ্য হতে হলে পাকিস্তান সরকারেবও অবশ্যি প্রাথমিক যুগেব খিলাফতেব আদর্শের প্রায় হুবহু প্রতিরূপ হওযা উচিত, যাতে বাষ্ট্রপ্রধান হবেন স্বেচ্ছাচাবীর ক্ষমতায ক্ষমতাবান, সমস্ত সামাজিক ব্যাপারে চূড়ান্ত রক্ষণশীলতাব নীতি (নাবী সমাজেব কম-বেশী অবরোধসহ) অনুসৃত হবে এবং থাকবে একটি পিতৃকেন্দ্রিক অর্থনীতি যা বিশ শতকের জটিল আর্থিক ব্যবস্থাকে বর্জন করে যাকাত নামে পরিচিত একমাত্র কবের মাধ্যমে আধুনিক জনকল্যাণমূলক বাষ্ট্রেব সকল সমস্যার সমাধান করবে।
>
> অপরাপর দল—যারা অধিকতর বাস্তববাদী এবং সম্ভবত সমাজজীবনেব একটা গঠনমূলক উপাদান হিসেবে ইসলামেব প্রতি কম অনুবাগী—তাবা পাশ্চাত্য পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রগুলোতে সাধারণত বৈধ এবং যুক্তিগ্রাহ্য বলে যা গৃহীত তার থেকে অভিন্ন পথে পাকিস্তানের বিকাশ আশা করেছিলেন। অবশ্যি পাকিস্তানে শাসন-সংবিধানে শুধু এ আনুষ্ঠানিক উল্লেখটুকু তাঁরা মানতে বাজী ছিলেন যে, ইসলাম হচ্ছে বাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং সম্ভবত জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেব ভাবাতিশয্যেব স্বীকৃতিস্বরূপ ধর্মীয়-ব্যাপারের জন্য একটি মন্ত্রীপদ প্রতিষ্ঠায়ও তাঁদের আপত্তি ছিল না।[১৮]

১৯২৬-এর ২রা এপ্রিল। গান্ধীজী-আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফত আন্দোলনের মূল আদর্শে কুঠারাঘাত করা হলো কলকাতায়। ব্যাণ্ডসহ আর্য সমাজের একটা মিছিল হ্যারিসন রোডের পাশে দীনু মিঞার মসজিদের কাছে এলেই বিপত্তির সূত্রপাত। প্রায় চৌদ্দ দিনব্যাপী হিংসাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক অবস্থানে নিদেনপক্ষে পঞ্চাশজনের জীবনাহুতি এবং প্রায় সাত শতাধিকের আহত হওয়া কলকাতার ধমনীজালকে বিধ্বস্ত করে দেয়। কিন্তু দু'একদিন পরেই বোঝা গেল এটা সূচনাপর্ব ছিলো, পরবর্তীতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হলো। কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমানের এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ব্যথিত, তিনি লিখলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতার বাণী পৌঁছে দিতে এগিয়ে এলেন—রাজনীতি যে ধর্মের গোঁড়ামীকে

আশ্রয় করে মানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধকে পদদলিত-পিষ্ট করছে! আবদার রহিম এবং তাঁর জামাতা সোহরাওয়ার্দী ক্রমশ সাম্প্রদায়িক শক্তি অর্জনের পথে, হিন্দু মহাসভাও ধর্মীয় অনুভূতিকে উপস্থিত করে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কলেবরে দাঁড় করাতে সশস্ত্র সংগঠনের পথ ধরে।

১৯৩৭-এ বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে এগিয়ে নেয়ার একটা সুযোগ এলেও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সম্মত করাতে না পারায় কৃষক-প্রজা পার্টির সঙ্গে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের যৌথ মন্ত্রিসভা গঠন-প্রয়াস ব্যর্থ হয়। স্বীকার করতেই হবে, কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বাংলাকে কখনো নিজেদের মতো সংগঠন এবং সংগ্রাম করার অধিকার দেয়নি, যৌক্তিক বিষয়কেও উপেক্ষা করে তাদের মতামতটা বা সিদ্ধান্ত একতরফা বাংলার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। সময়ের দাবী মেনে তৎকালীন বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এগিয়ে যেতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ইচ্ছে থাকলেও কংগ্রেস সভাপতি চূড়ান্ত কথা বলার অধিকারী বলেই ফজলুল হকের প্রস্তাব মোতাবেক মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হলো না, পরবর্তীতে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর একই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় রূপ নেয়। বস্তুত, বাংলার সমাজকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে এক এক করে ঠেলে দেয়া হলো।

১৯৪০-এর লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গৃহীত হলেও লীগ নেতৃত্ব কী নিশ্চিত ছিলেন যে মুসলমানদের জন্য ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হবে, অথবা মিঃ জিন্না—যিনি পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি তিনিও কি নিশ্চিত ছিলেন এই দাবীর মাধ্যমে মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠন সম্ভব? নাকি এর পেছনে সমসাময়িক রাজনীতিতে কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে কিছুটা নমনীয় করতে একটা পরিকল্পিত প্রচেষ্টা মাত্র ছিলো? অথবা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানরা মিঃ জিন্নার প্রতি কতোটা আস্থাশীল তা কংগ্রেস ও ভারতের ভাইসরয়কে দেখানোর লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ছিলো? প্রশ্ন ওঠে, লীগের সাধারণ সদস্যরা বা নেতৃত্ব তাদের স্বাধিকার রক্ষায় বা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় যে এগিয়ে আসবে সেটাই সহজ স্বাভাবিক, কিন্তু এর গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সর্বাধিক অবদান কার? ফিলিপস্-এর বক্তব্য আমাদের প্রাথমিকভাবে বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে :

> 'Thus a fifty-years' struggle reached its tragic climax Responsibilities for the course of events were widely distributed, English education, based on the English language, inevitably led Indians to demand parliamentary government, but Britain had not given a clear direction to constitutional development in India until 1919, when it was almost too late, and thereafter acted slowly; the Congress had rejected the Muslim League's offer of co-operation in 1937 and thereafter set out to dominate all parties and all India , and between 1937 and 1940 the Muslim League had grown up in fear and thereafter, through fear, closed its mind to the wider interests of Indians and set itself to break the hard-won unity of India.'[১১]

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস আর গান্ধীজী ভারতের সমসাময়িক রাজনীতি ও ইতিহাসে প্রায় সমার্থবোধক, মুণ্ডুহীন জীবন্ত মানুষ যেমন কল্পনা কবা সাধ্যাতীত—কংগ্রেস ব্যতীত গান্ধীজী এবং তিনি ব্যতীত কংগ্রেস অভাবনীয়। নিজেব 'হরিজন' পত্রিকাতে লীগের দাবীর প্রতি পরোক্ষভাবে সহানুভূতি জানাতে গিয়ে গান্ধীজী লিখলেন, দেশের মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ যদি ভারত বিভাজন চায় তবে তা গ্রহণ করতে নৈতিক সমর্থন থাকা উচিত;১৯৪৪-এ কারামুক্তির অব্যবহিত পরে তিনি মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতে এ প্রশ্নটি কি তোলেননি? ভারত বিভাগ করে সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টিতে হয়তো মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় গান্ধীজীর ভিত্তি ছিলো।[১১] রাজাগোপালাচারী যে এর জন্য একজন অনলস কর্মী—তাই গান্ধী-জিন্না বৈঠকের পূর্ব থেকেই তিনি ক্ষেত্র তৈরীতে প্রস্তুত ছিলেন, স্বীকার করতেই হয়, জনসাধারণ থেকে নেতৃত্ব—অনেকেরই ধারণা ছিলো এই দুই নেতা আলোচনায় বসলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সেপ্টেম্বরের (১৯৪৪) বৈঠকে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানের কথার উপর গুরুত্ব আরোপ না করেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনে বাজাগোপালাচারীর মতকে তুলে ধরেও পর্যুদস্ত হয়ে ফিরলেন। গান্ধীজীব উদ্যোগে যে সভাটা ছিলো—মিঃ জিন্না এটাকে প্রচারে এনে বসার উদ্দেশ্যটা ঢোলশহরৎ করলেন। তিনি মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিকে চান গণভোটের আওতায়, গান্ধীজী তো সীমান্তবর্তী জেলাগুলি নিয়েই কথা বলছিলেন। বাজাগোপালাচারীর বক্তব্য অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রমীও ছিলো, দ্বি-খণ্ডিত ভারতের উভয়কেই প্রতিরক্ষা, বাণিজ্যের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়েই চুক্তিবদ্ধ থাকতে হবে।[১২] মিঃ জিন্না এটাকে পুরো মানতে পারেননি, কিন্তু সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিলেন এর মধ্যে অসীম। কেননা গান্ধীজী তো পরোক্ষভাবে তাঁরই গুরুত্ব বাড়িয়ে পাকিস্তান দাবীকে সরেস করে তুলেছেন। বস্তুত, ব্যারিস্টার গান্ধী এক্ষেত্রেও পরাজিত হন ব্যারিস্টার জিন্নার কাছে ; আমরা ভুলতে পারি না বা উপেক্ষাও করতে পারি না—পরবর্তী দিনের জন্য মিঃ জিন্না যে স্বপক্ষে রায় পেতে একধাপ এগিয়ে যান।

১৯৪৬-এর জানুযারিতে জওহরলাল নেহরুকে দেখা গেল আব একপ্রস্থ মিঃ জিন্নার পরিকল্পিত ফাঁদে পা দিয়ে পরোক্ষে পাকিস্তানের উমেদাবীতে—ভারত বিভাগের বিষয়টাকে সম্ভাব্য বলে ধরে নিতে। ৫ই জানুয়ারি রবার্ট রিচার্ডস-রা ভারতে এলেন এবং অব্যবহিত পরেই তাঁরা মিঃ জিন্নার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বসেন। মিঃ জিন্নাব তো এবাবে পোয়া-বারো, তিনি দাবী জানালেন—হিন্দু আর মুসলমান উভযেব জন্যই স্বতন্ত্রভাবে সংবিধান রচনাকাবী দুটো সংস্থার প্রয়োজন স্বীকার করতে হবে;তবে পাঞ্জাবের হিন্দু প্রধান এলাকাগুলিকে তিনি নিতে আগ্রহী নন। জওহরলাল নেহরুও তাঁদের জানালেন, ব্রিটিশ সরকার ভারত ভাগ করলে অবশ্যই যেন সীমান্ত অঞ্চলবর্তী জেলাগুলির জন্য গণভোটেব ব্যবস্থা থাকে এবং সেই রায কার্যকব হয়।[১৩]

২৯শে জুলাইতে (১৯৪৬) লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ছিলো নব নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরুর সাংবাদিকদের দেয়া মুম্বাইতে (বোম্বাই) আজব আর বেয়াক্কেলে বিবৃতির বিরুদ্ধে, অবশ্য ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্তেরও বিরুদ্ধে। 'Direct Action Day'-এর কর্মসূচী পালিত হবে স্বভাবতই মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশে—যার মধ্যে বাংলা-পাঞ্জাব-সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে লীগের

দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। ১৬ই আগস্টে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালন করার পূর্বেই ভারতব্যাপী লীগ নেতারা পরিকল্পনা রূপায়ণে তৎপর হলেন, কিন্তু বাংলাতে লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী ১২ই আগস্টে জনৈক আমেরিকান সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারে আচমকা-ই বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে লীগকে উপেক্ষা করে কংগ্রেস একক মন্ত্রিসভা গঠন করলে বাংলায় লীগ এটাকে সহ্য করবে না, প্রয়োজনে লীগ বাংলার স্বাধীনতাও ঘোষণা করতে পারে,[১] কেন্দ্রকে রাজস্ব না পাঠিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করা হতে পারে এর সূচনাপর্ব। তিনি গুরুত্ব দিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কংগ্রেস যাতে কোনো জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্যকে মনোনীত না করে তার প্রতি, কংগ্রেস এ বিষয়ে অপ্রতিরোধ্য হলে তিনি সচেষ্ট হবেন লীগ যাতে মন্ত্রিসভাতে যোগ না দেয় ; মন্ত্রিসভায় লীগ জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনে গৃহযুদ্ধে নিজেদের জড়াতে দ্বিধা করবে না।

লীগ তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এককাট্টা হলো। মিঃ জিন্না ঘাপটি মেরে বসে থেকে হঠাৎ করেই সময়ের পুনর্বিবেচনায় অদ্ভুত কৌশলীরূপে মত পরিবর্তন করতে দ্বিধা করেন না ; অবশ্য তাঁর সামগ্রিক প্রচেষ্টা 'পাকিস্তান অর্জন' অব্যাহত থাকে। তাঁর গুণপনার একটা বিষয় স্বীকার করতেই হবে, উদ্দেশ্য পূরণে তিনি অবিচল, কিন্তু প্রক্রিয়া হিসেবে সহজলভ্যতাকেই তিনি গুরুত্ব দেন সর্বাপেক্ষা বেশী,—এর ফলে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায় তবে তা হবে উদ্দেশ্য পূরণের সর্বাপেক্ষা সহজলভ্য উপায়। খিলাফত আন্দোলনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধীজী-আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের আবেদন ছিলো মিঃ জিন্নার ভাষায় 'গেঁয়ো মানুষ ক্ষেপানোর কাজ,' কিন্তু বর্তমানে তিনি সাধারণ মানুষ ক্ষেপিয়েই (মিঃ জিন্না সরাসরি দাঙ্গায় ইন্ধন না দিলেও কার্যক্ষেত্রে লীগ সদস্যরা দাঙ্গায় উৎসাহী হয়ে ওঠে।) পাকিস্তানে পৌঁছানোর পুলসেরাত পার হতে চান, তাই ১৬ই আগস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (কলকাতাতে) বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত, তার ছায়া পড়ে নোয়াখালি-ত্রিপুরা জেলাতে ; ঢাকাও বাদ পড়েনি। বাংলা বিধ্বস্ত হলো সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কিত আবেগে। পাঞ্জাবে ইউনিনিস্ট-শিখ-হিন্দুর মিলিত সরকারকে ফেলার জন্য লীগ নেতৃত্বের ফলদায়ী ক্রিয়া-কর্মে অসহায় খিজির হায়াত খান আকস্মিকভাবে পদত্যাগে বাধ্য হন। বাংলায় সংঘর্ষ চলছে চোরা-গোপ্তা, প্রকাশ্যে পাঞ্জাবে, সিন্ধু ঝড়ের সন্ধিক্ষণে স্তব্ধ হয়ে প্রহর গুণছে ; ভ্রাতৃঘাতী জিঘাংসা ক্রমান্বয়ে শিশু হত্যাকারী ও নারীর আব্রু স্খলনে প্রকট হয়ে ওঠে। লীগ যেন সাফল্যের শীর্ষ-চূড়া দেখতে পেয়েছে, শিখেরা সংখ্যালঘু বলে কখনো নৃশংসতার শিকার হচ্ছে স্ব-পরিবারে, কিন্তু যেখানে শিখ-হিন্দুর প্রাধান্য সেখানে তারাও নামাবলী জড়িয়ে মৃত্যু আর ধর্ষণের বর্বরতায় লীগের প্রতিযোগী হয়েছে। বস্তুত, ধর্ম নয়—সম্প্রদায় নয়, বেঁচে থাকার তাগিদে মুসলিম-হিন্দু-শিখের কাছে মানবিক মূল্যবোধের বাণী উচ্চারিত হচ্ছে না—হিংস্র শ্বাপদের মতোই প্রতিপক্ষের প্রতি জিঘাংসার শ্রেষ্ঠত্বেই নিজেদের বিচার্য করে তুলেছে।

ক্ষেত জ্বলছে, পাঞ্জাবে পুড়ছে শস্য আর শব। ধেয়ে আসছে পঙ্গপালের মতো জান্তব দ্বিপদ, চোখ শুকিয়ে কাঠ, বেআব্রু কিশোরী কন্যা—কামাক্ত পিশাচ ঘোরে মসজিদ আর গুরুদ্বোয়ারের ভেতর-বাইরে ; অসহায় গান্ধীজীর প্রার্থনা অগ্নিকাণ্ডের কালো কুণ্ডলীতে হারিয়ে

যেতে বসে, '. .ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম .'! ইতিহাসের জনৈক খ্যাতিমান অধ্যাপক বলেন, 'নব্য ভারতীয়রা এই নরকাগ্নির মধ্য দিয়ে আসেননি, তাই তাঁদের মুখে কংগ্রেসী (তথা হিন্দু) নেতাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু কটু (এবং 'প্রগতিশীল') মন্তব্য শোনা যায়'। 'শোনা' যে যায় এখানেই তো মহাত্মার আদর্শের জয়—মানবতা যে ধ্বংস হয় না (সাময়িকভাবে বিপন্ন হয় বটে!) এটাই তার জীবন্ত প্রমাণ।

মার্চ মাসের ৮ তারিখে (১৯৪৭) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দিগ্‌গজ মাতব্বরেরা প্রস্তাব নিলো এই বলে যে, পাঞ্জাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি যেহেতু খুবই ধ্বংসাত্মক আর হত্যাকাণ্ডে বীভৎস, তাই একে দুটো প্রদেশে ভাগ করে শান্তি আর স্থিরতা ফিরিয়ে আনা হোক। হিন্দু ও শিখদের প্রাধান্য পূর্ণ অঞ্চলগুলি নিয়ে হবে একটা প্রদেশ, বাকিটা মুসলমানদের জন্য। বস্তুত, দেশ বিভাগের বিষয়টা এখানেই মেনে নেয়া হলো, মিঃ জিন্নার তাহলে তো দেখছি 'মন চাঙ্গা তো কেঠোয় গঙ্গা'-র ব্যাপার খুশির কথাই তাঁর ; কংগ্রেস আরো খানিকটা হাত বাড়িয়ে দিলো—লীগকে আহ্বান জানানো হলো এ ব্যাপারে লীগ যেন কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা গ্রহণ পর্বে। কিন্তু লীগ এগোবে কী করে, হিন্দুদের দল কংগ্রেসকে তারা বিশ্বাস করতে পারছে না। পাঞ্জাবের প্রসঙ্গ তুলেই বাংলা এলো, পাঞ্জাব যদি ভাগ হতে পারে তবে বাংলা বাদ যায় কেন? বল্লভভাই প্যাটেল মনে করিয়ে দেন, ১৯৪৫ এ তো কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো দেশেব কোনো অংশের জনগণকে তাঁদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভারত ইউনিয়নে জোর-জবরদস্তি ধরে রাখার চেষ্টা হবে না ; বর্তমানে তাঁব উল্লেখের কারণ একটা-ই—লীগেব সদস্যদের সঙ্গে মন্ত্রিসভাতে কাজ করতে গিয়ে হেনস্তা হতে হচ্ছে, এমনটি আর চলছে না যে, ঠোকাঠুকি বেশী পরিমাণে হচ্ছে, অতএব বাচ্চাদের 'রান্নাবাটি' খেলার মতো উপকবণগুলো ভাগ কবে দাও। জওহরলাল নেহরু প্রথমে নিমরাজি থাকলেও শেষটাতে 'হ্যাঁ'-এর পাশে পুরো ঝুলে পড়েন—বাংলাটাও ভাগ হয়ে যাক, প্রয়োজনে অসমের 'শ্রীহট্ট' নিক না লীগ, হোক না তাদের পাকিস্তান ; এখন আশু এবং একমাত্র কর্তব্য ও প্রয়োজন ব্রিটিশের হাত থেকে পুবো ক্ষমতাটাকে বগলদাবা করা। প্রশ্নটা একটু ভিন্ন ধবনেরও হতে পারে, ১৯৪৭-এর শুরু থেকে আগস্ট পর্যন্ত—বিশেষত মার্চ পর্যন্ত অবশ্যই ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারতীয় কংগ্রেস বা লীগ কোনো সংগঠনই আন্দোলনে নামেনি, কেননা আন্দোলনের প্রযোজনবোধ হয়নি। মুসলের ভাষায় তাদের কর্মতৎপরতা .

> As must have become clear by this time, the fight for Indian freedom, had become by 1947 not so much a battle between Indians and British, but between Indian (Congress) and Indians (the Muslim League),with the British acting as a sort of combatant referee–sometimes intervening in an effort to ensure fair play, sometimes surreptitiously planting a rabbit punch of their own In addition (to continue the boxing metaphor) the corners of the ring were manned by seconds who were also belligerently inclined, and who, at frequent intervals, dived in to mix it with the two main contenders and turn the title-fight into a free-for-all ''

যাহোক, ৯ই মার্চে পাঞ্জাব সম্পর্কিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের কপি সহ নেহরু ভাইসরয় ওয়াভেলকে লিখিতভাবে জানালেন যে বর্তমানে কংগ্রেসের অবস্থান কোথায় এবং কীভাবে তাবা লীগকে নিয়ে এক শান্তিপূর্ণ উপায়ে পাঞ্জাব বিভাজনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সমস্যার নিরসনেব চেষ্টা করছেন। অবশ্য লীগের দাবী অনুসারে পাঞ্জাব সমস্যা নিরসন হেতু দুটি প্রদেশ গঠন পদ্ধতি অনুমোদিত হলে তা বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে : অর্থাৎ বাংলাও দুটো ভাগে ভাগ হবে—হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে পশ্চিম বাংলা একটি প্রদেশ এবং মুসলমান জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পূর্ব বাংলা, প্রয়োজনে অসমের 'শ্রীহট্ট'কে পূর্ব বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেয়া যেতে পারে। ভাইসরয় নেহরুকে জানালেন, তিনি কংগ্রেসের প্রস্তাব ভারত সচিবকে জানিয়ে দেবেন।

ভারতে ব্রিটিশের ৩৪তম এবং শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ২২শে মার্চ (১৯৪৭) দিল্লি পৌঁছান, অবশ্যই সঙ্গে থাকেন তাঁর বিদুষী পত্নী। বরখাস্ত হওয়া ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ২৩ তারিখেই দিল্লি ত্যাগ করেন স্বদেশের উদ্দেশ্যে, ২২ তারিখে অবশ্য তিনি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার বৈঠকে শেষবারের মতো সভাপতিত্ব করেন। মৌলানা আজাদ উল্লেখ করেছেন :

> সভার কাজ চুকে গেলে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন ; তাঁব কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল। লর্ড ওয়াভেল বলেছিলেন, 'খুবই কঠিন আর সঙ্কটজনক সময়ে আমি বড়লাট হয়ে থেকেছি। আমি আমার সাধ্যমত কর্তব্য পালন করেছি। এ সত্ত্বেও এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয় যাতে ইস্তফা না দিয়ে আমার উপায় থাকে না। এই প্রশ্নে পদত্যাগ করে ঠিক করেছি কিনা তা ইতিহাস বিচার করবে। আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনারা তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনাদের কাছ থেকে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য আপনাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।'[২২]

লর্ড ওয়াভেলের দেয়া সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মৌলানা আজাদের মনে গভীর ছাপ পড়েছিলো, কিন্তু কেন ? কি সেই গভীর ছাপ? বিদায়ী বড়লাটের বক্তব্যের মধ্যে তবে কী প্রচ্ছন্নভাবে ভবিষ্যতের কোনো ইঙ্গিত রয়েছে?

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি খোলা-মেলা-ভাবেই নিজেকে ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল বলে উল্লেখের পাশাপাশি তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের প্রধানতম উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেন।[২৩] জুন-১৯৪৮-এর পূর্বে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও তিনি সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনেই অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ইঙ্গিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান বলেই ভারতীয় রাজনীতিবিদদের সাহায্য প্রত্যাশা করেন, অবশ্য পাশাপাশি উল্লেখ করেন যে তিনিও সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন যতোটা সম্ভবপর।

> At Mountbatten's suggestion it was also photographed for the first and last time, and, for the benefit of the assembled Congressmen, Muslim Leaguers and bejewelled and sparkling

Princes–as well as an international radio hookup–he made one break with tradition. He delivered a short speech in which he emphasized his role as a passeron of, rather than a clinger-on to, power His manner was crisp and confident and there was no sign of any emotion as he spoke of the approaching twilight of the British Raj His voice and bearing caused a quickening of interest among the leaders of both parties, and gave several of the Princes shudders of apprehension, for he had the air of a man who had come to make a deal–and no nonsense about sentiment[২৬]

ব্রিটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন শপথ নিলেন, বক্তব্য রাখলেন এবং তিনি এও জানালেন যে ভারতের সব রাজনৈতিক দল—রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হবে সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং সমমনোভাবাপন্ন। কিন্তু হলে কী হবে, ভারতের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের কাছে প্রশ্ন হয়ে ওঠে নতুন ভাইসরয় কোন্ দলের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন? বল্লভভাই প্যাটেলও নাকি খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন, লীগের পক্ষে ব্যাপারটা অধিকতর দুশ্চিন্তার—এ যে শিরে সংক্রান্তি, এ মুসাফির যে নয়া জমানার খবর বলতে চাইছেন ; সূত্র একটা আবিষ্কার করে নিলো লীগ—ভাইসরয় নেহরুর অতি আপনজন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে নেহরুর পূর্বপরিচিত এবং বন্ধুস্থানীয়, আর ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাব কিছু সদস্যদের সঙ্গে তাঁর গোপন বৈঠকের ফল—পরিকল্পনা রূপায়ণে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগপত্র লাভ তা প্রচারিত হলো।[২৭] ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে নেহরুর পূর্ব পরিচয় ছিলো, কিন্তু সেই পরিচয়কে কেন্দ্র করে এমনধারা চিন্তা-ভাবনা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় ; তবে পরবর্তীতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এবং লেডী মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর আন্তরিকতা (লেডী মাউন্টব্যাটেনকে ঘিরে দুর্জনেরা নেহরু সম্পর্কে অন্য কথা বলেন) অনেকের সন্দেহের কারণ হয়েছিলো। বস্তুত, সেদিনেও দুই সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরা পরস্পরকে দেখেছে সন্দেহের চোখে (তখন অবশ্য যথেষ্ট কারণও ছিলো) ; কিন্তু পৃথিবী একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের দ্বারে উপনীত হলেও কেউ কেউ স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশের নামে পুরানো সাম্প্রদায়িক চেতনায় নতুন সুর তুলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করার প্রয়াস চালান—ইতিহাসের নামে তাদের এই কাপট্য আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

কলকাতার গণহত্যার পরেই (আগস্ট, ১৯৪৬) হিন্দু-মুসলমান-শিখ প্রত্যেক ধর্মের উগ্র সমর্থকরা-ই স্ব স্ব প্রভাব প্রতিপত্তি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে নিজেদের জীবন আর সম্পত্তি রক্ষার্থে অস্ত্র সংগ্রহেব বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। এতে আক্রমণ প্রতিহত করাও যাবে এবং আক্রমণ করাও যাবে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড, শিরোমণি আকালি দল—প্রত্যেকেই নতুন উন্মাদনায় শক্তি বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়, প্রত্যেকটি সংগঠনের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি তুলে ব্রিটিশরাজের ভারত ত্যাগের দিন-মাস ঘোষণা করলে হিন্দু মুসলমান-শিখদের মধ্যে অধিকার অর্জনের প্রশ্নটি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। ৮ই মার্চে (১৯৪৭) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব বিভাজন ঘটিয়ে দুটি প্রদেশের গঠন প্রস্তাব করলে সমান্তরালে

বাংলাও চলে আসে। কিন্তু লীগের তো দাবী ছিলো—বাংলা মুসলমান প্রধান প্রদেশ তাকে কিছুতেই ভাগ করা চলবে না, যদিও মিঃ জিন্না পূর্বেই পাঞ্জাবের হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে তাঁর দাবীর আওতার বাইরে রেখেছিলেন। বাংলার এককালীন প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) ফজলুল হক বা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রথম দিকটায় ভেবেছিলেন পাকিস্তান নামের দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষ করে সোহরাওয়ার্দী বুঝতে পারলেন বাংলা এবং অসমের কিছুটা অংশ (শ্রীহট্ট জেলা) নিয়েই পাকিস্তানের অন্তর্গত পূর্বাংশ—যা আদৌ স্ব-শাসিত এবং সার্বভৌম হবে না। অতঃপর পাঞ্জাবের মতো বাংলা বিভাজনের প্রশ্ন যদি বাস্তবতা পায় তবে লীগের পক্ষে তা মেনে নেয়া কেমন করে সম্ভব হবে—নেতৃত্বের (বাংলা প্রদেশের) মধ্যে এটা এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি যতোই এগিয়ে আসছে ক্রমশ ঘটনাপঞ্জিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সংকীর্ণ এক উগ্র ধর্মীয় চেতনা—যা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং মূল্যবোধকে জাগ্রত না করে আচ্ছন্ন করছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। কিশোর শহীদ ক্ষুদিরাম, নওজোয়ান ভগৎ সিং বা বিনয়-বাদল-দিনেশ, আর মাস্টারদা সূর্য সেন, নেতাজী সুভাষের চেতনা—স্বদেশের স্বাধীনতায় যদি প্রয়োজন হয় দেবো আরো রক্ত ; ১৯৪৬-৪৭-এ এসেই যেন চিত্রটা হঠাৎ করেই বদলে গেল। প্রতিহিংসা বাড়লো ভারতীযদের মধ্যে, উন্মোচিত হলো সাম্প্রদাযিকতার ঝাঁপি, প্রতিহিংসায় রক্ত ঝরলো প্রতিবেশীর তলোয়ারে। লাঞ্ছিতা হলেন প্রতিবেশী বোন ও মায়েবা—নারী হলো ধর্ষিতা, ন্যাশনালিটির বোরখা ঝেড়ে ফেলে এক পৈশাচিক উন্মাদনায় সাম্প্রদায়িক বিভেদের শ্লোগানে এক শ্রেণীর মানুষ হয়ে ওঠে আরণ্যক ; কলকাতা—নোয়াখালি—ঢাকা—বিহার আব পাঞ্জাবে কতো মানুষ মারা গেল সে প্রশ্ন গৌণ—জিতলো কে? হিন্দু না মুসলমান ? মুসলমান, নাকি শিখ?

রক্তাক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ বাড়ে, নেতাজী সুভাষেব আজাদ হিন্দ বাহিনীর মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জিও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হলেন; বঙ্গ ভঙ্গের উদ্দেশ্যে জানুযারিতেই (১৯৪৭) তিনি একখানা সমিতি গড়ে তোলেন অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান যে আর এক বাংলায় থাকা যায় না—এটা কিছু সঙ্গী নিয়ে তিনি আবিষ্কার করে বসেন। হিন্দু মহাসভা তো নাচুনে বুড়ি, ২২শে ফেব্রুযারি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ গভর্ণবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি বঙ্গভঙ্গের দাবীতে এক বিবৃতি দেন। বাংলা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে (২৮শে ফেব্রুয়ারি) মহম্মদ আলী জানালেন :

> While presenting the budget in the Bengal Assembly, on 28 February 1947 Mohammed Ali, the Finance Secretary, informed the House that an independent Bengal free from the centre's interference could make good economic progress [৮] (Azad March, 1947)

৪ঠা এপ্রিল তারকেশ্বরে 'ভোলে বাবা পার করেগা' বলেই হয়তো হিন্দু মহাসভা প্রাদেশিক সম্মেলন করে, সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নির্মল চট্টোপাধ্যায়। ৫ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার হিন্দুদের সমস্যা নিরসনে 'দেশভাগের' প্রসাদ বিতরণ করতে লেগে যান, অবশ্য ৬ তারিখে হলো মহতী 'মহোৎসব,' সম্মেলনের ক'টা দিনের প্রাপ্ত 'চাল-কলা' মেখে

সনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রস্তাব তুললেন এবং সূর্যকুমার বসু সেটা গ্রহণ করে বিতরণের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন। হিন্দু মহাসভা বাংলায় এমন একটা কাজ করছে—কংগ্রেস পিছিয়ে থাকে কী করে!

> ৪ এপ্রিল কলকাতাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি একটি প্রস্তাবে দাবি করে, যদি ব্রিটিশ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা অনুযায়ী বাংলার বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করে, তাহলে বাংলার যে অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় সেই অংশে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে এবং বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র রচনায় যদি সার্বজনীন ভোটের অধিকার, যুক্ত নির্বাচন প্রথা ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা না গৃহীত হয় তাহলে বাংলাদেশ বিভক্ত করে দুটো প্রদেশ গঠন করতে হবে, আর যে অংশ উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করতে চাইবে সেই অংশকে সেই অধিকার দিতে হবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এও দাবি করে যে, ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন দুটো আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। লক্ষণীয় এই যে, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের এই কার্যকরী সভায় উপস্থিত ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কে সি. নিয়োগী, এম. এল এ, ডাঃ বি সি. রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডঃ পি. এন. ব্যানার্জি, কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, এম. এল. এ (সেন্ট্রাল), মাখনলাল সেন ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত। (Resolution by Bengal Provincial Congress Committee April 4, at Calcutta, in Amrita Bazar Patrika, Saturday, 5 April, 1947, P-1) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করায় বাংলার কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে এই দাবির সমর্থনে জনমত গঠন করে।[৩৮]

হিন্দু মহাসভা কংগ্রেস থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে না, তারা দাবী তোলে ভারত যদি ভাগ নাও হয় তবুও বাংলাকে ভাঙ্গতে হবে, হিন্দু প্রধান এলাকা নিয়ে একটা নয়া প্রদেশ হিন্দুদের চাই-ই;ব্যাপারটা এমন যেন হিন্দুদের সার্বিক বিষয়ের তত্ত্ব-তালাশির তারা বর্গা নিয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী দেখলেন হিন্দু মহাসভা আর কংগ্রেস উভয়েই 'বাংলা ভাগ করো' বলে কোরাস গাইছে, খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে লীগের মাহফিল ডাকতে চলেছেন—তাঁর সঙ্গীরা ছোটো-বড় ওয়াজের মাহফিলে রীতিমতো মিঃ জিন্নার ধ্বনি দিয়ে বাংলাকে অবিভাজ্য রাখতে তৎপর হয়েছে;এবারে কালহরণে না গিয়ে সোহরাওয়ার্দীও মালকোঁচা দিয়ে ময়দানে নামেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে রয়েছেন বাংলার লীগ সভাপতি বর্ষীয়ান মওলানা আকরাম খান, সোহরাওয়ার্দী বাংলার লীগ সম্পাদক আবুল হাশিমকে হাত করেন—কেননা লীগের তরুণ প্রজন্ম হাশিমের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাবান: খাজা নাজিমুদ্দীন এবং মওলানা আকরাম খান ১৬ই আগস্টের (১৯৪৬) 'দি ডেইলি ডন' পত্রিকায় (করাচী) প্রকাশিত ভবিষ্যত পাকিস্তানের মানচিত্রে দেখানো বাংলা-অসমকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি জানিয়ে বর্তমান আন্দোলনটা চাঙ্গা করতে উদ্যোগী হন। তাঁরা জিগির তোলেন, অসমকে নিয়ে বাংলা একটা অবিভাজ্য প্রদেশ হতে হবে এবং সেটা অবশ্যই পাকিস্তানের পতাকা বহন করবে।[৩৯] ৯ই এপ্রিলে সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে সাংবাদিকদের কাছে শুভবুদ্ধির পরিচয় উপস্থিত করেন:

আমি বরাবরই যুক্ত বাংলা ও বৃহত্তর বাংলার পক্ষে। আমি যথাসময়ে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে একটি বিবৃতি দেব এবং তাতে প্রমাণ করব যে বঙ্গ বিভাগে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-তফসিলি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য আত্মহত্যারই শামিল হবে। আমি জানি যে, যারা এ জিগির তুলেছেন তারা মতলবি প্রচারণায় সিদ্ধহস্ত। তারা আন্দোলন গড়ে তুলতে, সে আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করতে, এমনকি শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন হিন্দুদের বিভ্রান্ত করে সে আন্দোলনে তাদের সমর্থন আদায় করতেও কোনো কসুর করবেন না। তবে আমি এখনো আশা করি একদিন-না-একদিন শুভবুদ্ধির জয় হবেই, তাই আমি আশা করব, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করার আগে তাঁরা অবশ্যই একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হবার চেষ্টা করবেন এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাকে একটি মহান দেশ এবং বাঙালিদের একটি মহান জাতিতে পরিণত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন।[৩১]

তাঁর ২রা এপ্রিলের বেতার ভাষণ বা ৯ই এপ্রিলের সংবাদিকদের দেয়া সাক্ষাৎকার প্রমাণ করে এবারে তিনি সচেতন, হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উন্নয়নে তিনি আন্তরিক—যত্নবান। নৈরাজ্য আর নৃশংসতাকে পরাজিত করতে কলকাতা তথা বাংলার জনগণের কাছে তিনি আবেগমথিত কণ্ঠে আহ্বান জানান :

যে বিভীষিকার করাল ছায়া আজ আমাদের দেশকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে তাকে অপসারণ করুন। মাটির ধূলায় মিশিয়ে ফেলুন এই অশুভ শক্তিকে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল নাগরিকের কাছে আমার আবেদন : আপনারা সম্প্রদায়গতভাবে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতব সম্পর্ক স্থাপন করুন, ভাই ভাই সম্পর্কের ভিত্তিতে আরো বেশি মেলামেশা করুন, যুক্তভাবে শান্তি মিছিল শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করুন, ঘরে ঘরে এই বাণী পৌঁছে দিন যে, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা কারুরই অভিপ্রেত নয় এবং যারা এই সব দুষ্কৃতি ও নৃশংসতায় লিপ্ত হয় বা অপরকে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দেয়, তারা আমাদের জাতির বীর সন্তান নয় বরং তারা স্রষ্টা, সৃষ্টি, সমাজ ও স্ব-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী।[৩২]

আবেগমিশ্রিত তাঁর এই বক্তব্যে আবেদন-নিবেদন থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক দক্ষতায় বর্বরতা দমনে দৃঢ় কোনো ঘোষণা থাকেনি। তিনি এ সময়ে এক জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিয়োজিত থেকেও হিন্দু-মুসলমান মিলনের—সহাবস্থানের বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থানে (হিন্দুই হোক আর ইসলামীই হোক) আবেগ আর প্রশাসন শেষ কথা বলে না, জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব, শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীস্বার্থ বোধকে জাগাতে পারলে যে সুফল পাওয়া সম্ভব হতো তার প্রচেষ্টা এখানে অনুপস্থিত ; কেননা বক্তার শ্রেণীগত অবস্থান তো বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বাইরে। প্রসঙ্গত বলা চলে, কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাও এক্ষেত্রে কিঞ্চিৎকর। যাহোক, তবু সোহরাওয়ার্দী মন্দের ভালো একটা দিকে হাঁটলেন, তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে এবং নতুন করে কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় তার জন্যে হিন্দুদের কাছে আবেদনের পাশাপাশি লীগের স্বেচ্ছাসেবক ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড-এর কর্মীদের হুঁশিয়ার করে তাদেরও সম্প্রীতি স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্য, লীগ নেতৃত্বের একাংশের শুধু অসহযোগিতা-ই নয়, বরং তাদের

রীতিমতো সাম্প্রদায়িক বিভেদমূলক প্ররোচনা তাঁর কর্মপ্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করে তোলে। মওলানা আকরম খায়ের ভূমিকা সোহরাওয়ার্দীকে বিচলিত করে, যে দৈত্যটা ১৯৪৬-এ কলকাতা-নোয়াখালিতে ভ্রাতৃত্ব আর মানবতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলো তাকে কিন্তু এখনো বোতলবন্দী করা সম্ভব হলো না। যতোটা সহজে সোহরাওয়ার্দী আর মুসলিম লীগ তাকে বোতল থেকে বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছিলো এখন তাকে বোতলবন্দী করতে গিয়ে গোচরে এলো বাংলায়-এ যে বংশবিস্তার করে আছে, হিন্দুদের মধ্যেও। তাই কলকাতা ও তার শহরতলীকে সোহরাওয়ার্দী যতোটা ইচ্ছের প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম, সমগ্র বাংলায় তার আধিপত্য তুলনামূলকভাবে পর্যাপ্ত নয়—গুরুত্বপূর্ণও নয়।

> Many more leaders of League of various statures responded to the call of "Direct Action" in equally militant and anti-Hindu language of *Jehad*, At the popular level the only active organisations of the League were its firebrand National Guards and volunteers, whose members had but little political education. They were generally guided by the mosque-based fundamentalist *Mullahs and Peers* There were very few middle class people in the Muslim society and in its economic institutions. Similarly the strength of middle class intelligentsia in the political organisation backed by bulk of the Muslims, i e , the League was also negligible [৩৩]

মিঃ সোহরাওয়ার্দীকে একই সময়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামাল দেয়ার চেষ্টা চালাতে হলো। প্রথমত, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারত বিভাজিত হলেও বাংলাকে অবিভাজ্য রাখা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থে একান্ত জরুরী। Direct Action এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ের লীগ আন্দোলন বাংলা ও পাঞ্জাবকে দেশ বিভাগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলে বিহার, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এর সবটাতে যে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিলো তার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে বাংলাকেই বহন করতে হবে, এবার বাংলা বিভক্ত হলে রক্তসাগরে ঢেকে যাবে বাংলার সবুজ প্রান্তর-শস্যক্ষেত্র। তবে বাধা দেয়া আশু এবং প্রধানতম কর্তব্য হলো এই কারণে যে, দীর্ঘস্থায়ী এই ধরনের কোনো সমস্যা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনকে কালো আস্তরণে ঢেকে দেবে, বাংলার জনসাধারণ ভবিষ্যতে কখনো-ই তাঁকে ক্ষমার যোগ্য মনে করবে না। যেহেতু বাংলার এই সঙ্কটপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে তিনি প্রধানমন্ত্রীর (মুখ্যমন্ত্রী) ক্ষমতায় রয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪৬-এ কলকাতা-নোয়াখালি-কুমিল্লার চাঁদপুর সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জনজীবনকে বিধ্বস্ত করে, গান্ধীজীর নোয়াখালি অবস্থান এবং প্রশাসন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচেষ্টায় সাময়িকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু ২৭শে মার্চের (১৯৪৭) অপরাহ্নে পুনরায় কলকাতায় দাঙ্গা বাধে, ২৮শে মার্চে দাঙ্গা দমনে সামরিক বাহিনীকে কাজে লাগানো হলো।[৩৮] দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, লীগের ঘরোয়া রাজনীতিতে খাজা নাজিমুদ্দীন ও মওলানা আকরম খাঁ পরিপূর্ণ ক্ষমতা দখল করলে তিনি শুধুমাত্র যে ক্ষমতাচ্যুত হবেন তা-ই নয়—লীগে প্রাধান্য না থাকলে যুক্ত বঙ্গ বা বৃহত্তর বঙ্গ

অথবা স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে ; অতএব, তাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হলো লীগ সংগঠনে (বাংলা প্রদেশে) নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে। তৃতীয়ত, পাকিস্তান কায়েমের সংগ্রামে গত বছরের তার কর্মপ্রচেষ্টা ভারতের মুসলমান জনসাধারণের কাছে গৌরব ও গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচিত হয়েছিলো। তিনি এখনো পাকিস্তান সৃষ্টির বা গঠনের আদর্শে বিশ্বাসী বলে মিঃ জিন্না ও নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করাকে নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। ইত্যবসরে নুরুল আমীন, হাবিবুল্লাহ্ বাহার চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী প্রমুখ বাংলার লীগ নেতৃবর্গ বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠনের দাবীতে মিঃ জিন্না ও লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি দেন ; লীগ পার্লামেণ্টারী বোর্ড মিঃ সোহরাওয়ার্দীকে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দেয়।[৩৫]

পক্ষান্তরে অন্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন, লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী-হাশিম বৃহত্তর বঙ্গদেশ গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে বাংলার মুসলিমদের (লীগ সমর্থক) একাংশের সমর্থন পান, বাংলার সব মুসলমানদের এই আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করার সমান্তরালে বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গেও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে একটি পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করে জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা আশু কর্তব্য বলে বিবেচনা করেন; কংগ্রেস এ বিষয়ে অসহযোগিতা করলে তাঁর লীগ-ই দায়িত্বের বোঝা বহন করতে উদ্যোগ নেবে। শেষের কর্মটি এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ করা খুব-ই কঠিন আর পরিশ্রমলব্ধ, কেননা বাংলায় কংগ্রেস ইতিমধ্যেই যে বিভক্ত বঙ্গের বা বঙ্গকে ভাগ করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বতন্ত্র প্রদেশের কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসকে উৎসাহিত করে চলেছেন বঙ্গ বিভাজনের আদর্শ গ্রহণে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এই সব সমস্যা মোকাবিলায় অতীতের সোহরাওয়ার্দীকে এপ্রিলেই (১৯৪৭) দেখি নতুন সোহরাওয়ার্দীতে কর্মমুখর হতে। প্রসঙ্গত বলা চলে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশে সোহরাওয়ার্দীর অনুগামী শেখ মুজিবর রহমানের রাজনীতিতে অভিষেক সূচিত হলেও গুরু-শিষ্যের আত্মিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

প্রাসঙ্গিক বলেই একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যিক, বাংলার শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসের মনোনয়নের মাধ্যমে ১৯৪৬-এ সেন্ট্রাল এসেমব্লিতে নির্বাচিত হন। জওহরলাল নেহরু ঘোষিত ২রা সেপ্টেম্বরেব অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে তিনি স্থান লাভ করেও নভেম্বরে স্যার সাফাত আহমেদ খান, সৈয়দ আলী জহির-এর সঙ্গে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয় ; তাঁদের শূন্যস্থান পূরণ করা হলো লীগ মনোনীত সদস্যদের দ্বারা। শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেসের এই আচরণকে—মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার করাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি, কংগ্রেস থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। অতঃপর শরৎচন্দ্র বসু সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি গঠন করেন, অবশ্য এমন একটি পার্টি গঠনের কথা ১৯৪৪ সালে জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি ভেবেছিলেন, যার ভিত্তি হবে বামপন্থী চিন্তাধারায় স্থাপিত। ১৯৪৭-এর জানুয়ারি থেকে পাঞ্জাবে খিজির হায়াত খানের বিরুদ্ধে লীগের আগ্রাসী আক্রমণ শুরু হলে সাম্প্রদায়িক অবস্থার দ্রুত অবনতিতে এবং কংগ্রেসের পরবর্তী সিদ্ধান্তে শরৎচন্দ্র বসু নিশ্চিত হলেন এবারে পাঞ্জাব ভেঙ্গে দু'টুকরো হবে, বাংলার ভবিষ্যৎও সর্দার প্যাটেলরা নির্ধারণ করে ফেলেছেন দেখে তিনি এক নতুন

ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। বাংলা বা পাঞ্জাব ভাঙ্গলেই যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সুরাহা হয়ে যাবে তা তিনি আদৌ মনে করেননি বলেই তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হলো—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাই পারে এই জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে।[৩৬] আবার স্বাধীন ভারতের চিত্রটাও তিনি এঁকেছিলেন 'প্রদেশসমূহকে স্বায়ত্তশাসিত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকে' প্রতিষ্ঠিত করলেও কেন্দ্রে থাকবে ভারতীয় ইউনিয়ন,—যা গঠিত হবে প্রত্যেকটি রিপাবলিকের মনোনীত সদস্যদের দ্বারা, পরিচালিত হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখেই। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন দেশভাগ হলো সেই পদ্ধতি যা রোগের চিকিৎসা নয় অসুস্থকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েই আরোগ্য লাভের প্রচেষ্টা পদ্ধতি। সুতরাং তিনি দেশ ভাগ মানতে পারেন না, বাংলা ভাগও নয়। শরৎচন্দ্র বসুর সামনে একটি মাত্র পথ-ই খোলা থাকে, কংগ্রেস-লীগ-মহাসভা-আকালিরা যদি দেশভাগ করেও (যা ঠেকানো তাঁর নাগালের বাইরে) বাংলা ভাগকে যে প্রক্রিয়ায় ঠেকানো যায়—উপেক্ষা করা যায় তার বিষয়ে চিন্তাভাবনা নিয়েই সাংগঠনিক দিক দিয়ে জোর তৎপরতা আরম্ভ করা।

দেশ ভাগ ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র বসু শুধু যে সোচ্চার হলেন তা-ই নয়, বিকল্প পথে সমস্যা সমাধানের সন্ধান দিতে অবশেষে তিনি গঠন করলেন All Bengal Anti-Pakistan and Anti-Partition Committee, কিন্তু এপ্রিলে এসেই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় মওলানা আকরম খা, খাজা নাজিমুদ্দীন এবং ইস্পাহানি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তর বাংলার জন্য লীগের মধ্যে তাঁদের সমর্থকদের পরিচালনা করার কথা ঘোষণা করলে, তবে আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী কী স্বাধীন বঙ্গভূমি চাইলেও পাকিস্তান বিষয়টি বর্তমানে এড়িয়ে গিয়ে ভবিষ্যতে বৃহত্তর বাংলার বা স্বাধীন বাংলার জনসংখ্যার শতকরা হিসেবকে সামনে এনে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি চাইবেন কিনা? ২৭শে এপ্রিলে (১৯৪৭) নয়াদিল্লিতে সোহরাওয়ার্দীর সাংবাদিকদের মুখোমুখি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা পূর্বেকার সংশয়কে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, স্বাধীন বঙ্গভূমি স্বাধীনভাবেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা লাভে সমর্থ হবে।[৩৭] সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার উপর গুরুত্ব না দিয়ে তিনি স্বাধীন বঙ্গভূমি বা বাংলাদেশ হলে তার সার্বিক একটা চিত্র ফুটিয়ে তুলতে উদ্যোগী হন। পাশাপাশি বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পারস্পারিক সম্পর্কেরও তিনি বিশ্লেষণ করেন, নোয়াখালিতে ঘটে যাওয়া পরিস্থিতি যে সামগ্রিকভাবে বাংলার পরিস্থিতি নয় এবং দু'একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ায় ভুল থাকায় সম্ভাবনা অধিক থাকে বা যৌক্তিকও নয় তা তিনি উল্লেখ করেন।

সোহরাওয়ার্দী দৃঢভাবে বিশ্বাস করেন বাংলাকে ভাগ করা সকল হিন্দুর কাম্য নয়, সংখ্যাগুরু মুসলমানের ভয়ে এবং বিগত দশ বছর (১৯৩৭-১৯৪৭) ধরে মূলত লীগের শাসন থেকে তারা অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই ভবিষ্যৎ স্বাধীন উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর হিন্দুর যুক্তিজাল উপস্থিত হতে দেখা যায়। সাম্প্রদায়িকতাকে তাই সামনে রেখে তারা যা বলেন তার তাৎপর্য হলো ভবিষ্যতের জন্য বাংলা এবং বাঙ্গালীদের শোষিত এবং শোচনীয় এক পরিবেশে বাস করার আগাম ইঙ্গিত দান; সোহরাওয়ার্দী তাদের উদ্দেশ্যে যুক্তি, তথ্য এবং আবেগ দিয়ে বক্তব্য উপস্থিত করেন:

"No, if Bengal is to be great, it can only be so if it stands on its own legs and all combine to make it great. It must be master of its own resources and riches and its own destiny. It must cease to be exploited by others and shall not continue to suffer any longer for the benefit of the rest of India. So in the end the tussle will rage round Calcutta and its environments, built up largely by the resources of foreigners, inhabited largely by people from other provinces who have no roots in the soil and who have come here to earn their livelihood, designated in another context as exploitation. Alas, if this is the main objective, as my figures would demonstrate, then no claim for the partition of Bengal can remain static, and a cause for enmity and future strife would have been brought into being of which we can see no end. To those, therefore, of the Hindus who talk so lightly of the Partition of Bengal I make an appeal to drop the movement so fraught with unending mischief Surely some method of Government can be evolved by all of us sitting together which will satisfy all sections of the people and revive the splendour and glory that was Bengal"[৩৮]

সোহরাওয়ার্দীর ২৭শে এপ্রিলে দেয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি ২৮শে এপ্রিলে প্রকাশিত হলো। প্রাদেশিক লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম ২৮ তারিখে যে বিজ্ঞপ্তি দিলেন তা প্রকাশ পেলো ২৯শে এপ্রিলের দৈনিক পত্রিকায়;সহজেই অনুমেয় সোহরাওয়ার্দীর প্রেস বিজ্ঞপ্তির আদর্শ মূলত তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু যুক্তি ও আবেগ দিয়ে তিনি বাংলার হিন্দুদের চেতনাকে স্বপক্ষে আনতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মহামতি গোখলে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা এবং বক্তব্যকে তুলে ধরে বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা গঠনের পাশে হিন্দুদের পেতে চান। সাম্প্রদায়িক হানাহানিকে পরিহার করে নতুন প্রজন্মের জন্য—ভবিষ্যতের জন্য সমৃদ্ধ বাংলা গঠনে সবাইকে আন্তরিক হতে আবেদন জানান। তিনি অতীত বাংলার ঐতিহ্যকে তুলে ধরে বর্তমান বাংলার অবস্থানকে এক যাত্রাপথের চৌমাথায় দাঁড়ানোর সঙ্গে তুলনা করে বলেন, একদিকে যশ ও মুক্তি অন্যদিকে দাসত্ব আর অপরিসীম লাঞ্ছনা,—এ সময়ে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন বাংলার মানুষ কোন পথ গ্রহণ করবে—যেখানে সৌভাগ্যের সূচনা নাকি বিদেশী ইঙ্গ-মার্কিন কায়েমী স্বার্থের কাছে শোষণের কাছে বাংলাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তিনি দেখাতে চান বাংলায় যে অমানবিক এবং পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড একাধিকবার ঘটেছে সেখানেও এই বিদেশীদের হাত বা ইন্ধন রয়েছে, বিশেষত দাঙ্গাবাজদের হাতে বিদেশী অস্ত্র পৌঁছানোর কৌশলকে পর্যালোচনা করে। পরিকল্পিত পাকিস্তান ও বাংলাকে সামনে রেখে তিনি দেখাতে উৎসুক:

পাকিস্তান স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেয়নি যে বাংলা অথবা পাঞ্জাবে মুসলমানরা শাসক জাতি হবে এবং অন্যেরা পরাধীন জাতির পর্যায়ে পরিণত হবে। বম্বেতে জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর জিন্নাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রগুলি সার্বজনীন

> বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সমগ্র জনগণের অভিপ্রায় এবং সম্মতির দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হবে। আমি বলতে চাই এটা হতে পারে যদি যুক্ত নির্বাচন প্রথায়, সংখ্যালঘুরা তাঁদের নিরাপত্তার জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবী না জানান তাহলে।[৩৯]

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সুবিধার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিলো, শরিয়ত অনুসারে মুসলমানদের পাশাপাশি শাস্ত্রমতে হিন্দুরা নিজস্ব সুযোগ সুবিধা লাভ করবে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ-ই বিশেষ সুবিধে লাভের দাবীদার হবে না। অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়টি ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলিতে সবার সমান অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার অবশ্যই রক্ষিত হবে। বাংলা বিভক্ত হলে তার পরিণতি কী দুঃসহ হতে পারে সে বিষয়ও তিনি মতামত ব্যক্ত করেন,[৪০] বিশেষত 'পশ্চিম বাংলা'-র অবস্থান সম্পর্কে সেদিনের তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বক্তব্য যে অসার ছিলো না স্বাধীনতার পরবর্তীতে সে বক্তব্যের সত্যতা বাস্তবে রূপ পেতে দেখা গেছে। ভারতের একটি প্রদেশ পশ্চিম বাংলা বর্তমানে সম্পদ সংগ্রহে ও অন্যান্য বিষয়ে অগ্রণী প্রদেশগুলির সমপর্যায়ে থেকেও তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে বঞ্চিত। বিশেষত, বাংলা ভাগহেতু শরণার্থী সমস্যার কোনো সুষ্ঠু সমাধান-ই কেন্দ্রীয় সরকার করেনি, পুনর্বাসনের নামে অমানবিক পরিবেশে শরণার্থীদের একাংশকে থাকতে বাধ্য করছে—কেন্দ্রীয় সরকারের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে রয়েছে আর্থিক সঙ্কট নয়, মানসিকতার বৈধব্য।

২৯শে এপ্রিলে (১৯৪৭) অমৃতবাজার পত্রিকায় আবুল হাশিমের বক্তব্য প্রকাশ পেলো, এখানে তাঁর চিন্তার সম্প্রসারণ এবং আন্তরিকতার স্পর্শ অতুলনীয়ভাবে উপস্থিত। বক্তব্যে একটি অংশে আমরা দেখতে পাই :

> সি. আর. দাশ আজ জীবিত নেই। গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনেব জন্য তাঁর আত্মা আমাদের সহায়তা করুক। বাংলার হিন্দু মুসলমানরা তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের আধা-আধি সূত্র মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হোন। আমি পুনরায় বাংলার যুবকদের তাঁদের অতীতের ঐতিহ্যের এবং গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে মিলিতভাবে দৃঢ়সংকল্পে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনাকে দূর কবে আসন্ন দুর্যোগ থেকে বাংলাকে উদ্ধার করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।[৪১]

লর্ড মাউন্টব্যাটেন সৌভাগ্যবান, কেননা ইতোপূর্বে কোনো ভাইসরয়-ই ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশসমূহ এভাবে লাভ করেননি। প্রথমত, ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে ভাইসরয়কে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, যদি সম্ভব হয় তবে এই ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবগুচ্ছকে সামনে রেখেই, যাতে ভারতকে কমনওলেথ অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ হিসেবে ভবিষ্যতে চিহ্নিত করা যাবে এবং স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতে ব্রিটিশের স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখবে।[৪২] লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল হিসেবে শপথ গ্রহণ করাটাকে হয়তো দ্রুতগামী কোনো আরবীয় অস্থির অশ্বের পিঠে ওঠার মতোই ক্ষিপ্রতা আর কর্মপদ্ধতির প্রতিশ্রুতি মনে করলেন; নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে তাঁর তৎপরতা ভারতীয় রাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতে দায়িত্ব পালনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যাঁদের শাগরেদ (সহকারী) হিসেবে পেলেন তাঁরাও কোনো অংশে কম্‌তিতে নেই। ইজমে, মিভিল, অ্যাবেল, স্কট, ক্রিস্টি, ক্রাম এঁরা প্রত্যেকেই অতীতে কোনো-না-কোনো সময়ে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন,ভারতে উইলিংডন, লিনলিথগো,ওয়াভেল প্রমুখ ভাইসরয়দের কাজ এঁরা করেছেন হৃদ্যতার সঙ্গে,[৪৩] কংগ্রেসের নীতির সমালোচনায় তাঁরা অংশ নিয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন ভারতের পরিস্থিতিকে বুঝতে তাঁদের সাহায্য নিলেন, সঙ্গী পেলেন ক্যাম্বেল জনসনকে ; সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিগর্ভে নিমজ্জিত ভারতকে তিনি খানিকটা নতুন করে আবিষ্কার করেন। লীগ, হিন্দু মহাসভা বা শিরোমণি আকালী প্রত্যেকটি দলের বা সংস্থার নিজস্ব কর্মীদের দ্বারা গঠিত প্রতিরোধ বাহিনীর কর্মকাণ্ড ভারতকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে মাউন্টব্যাটেন ওয়াকিবহাল হলেন, তবে কমিউনিস্টদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে তাদের ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য লাভ তাঁর গোচরে আসে। ভাইসরয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর থেকেই ৬ই মে-র (১৯৪৭) মধ্যে গান্ধী, নেহরু, জিন্না, প্যাটেল, লিয়াকত আলী সহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গরে সঙ্গে ১৩৩টি সাক্ষাৎকারে মিলিত হন।[৪৪] লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পাঞ্জাবের অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ এবং ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গার বিষয়টি তুলে ধরে ৮ই মার্চে (১৯৪৭) কংগ্রেসের নেয়া প্রস্তাবের কথা জানান। প্যাটেল তো পা বাড়িয়ে ছিলেন লীগের দাবী কিছুটা ছাড় দিয়ে মেনে নিতে, নেহরুর সম্মতি পেয়ে প্যাটেল এবারে হলেন আরো উদ্ধত। তিনি বাংলা, অসম, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশে লীগের দাঙ্গা বাধানোর বা ঘটানোর প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় লীগ মন্ত্রীদের থাকার কোনো-ই যৌক্তিকতা নেই ; তাঁদের ববখাস্ত করতে হবে। এ সময়ে নেহরু ও প্যাটেল পাশাপাশি কাজ করলেও ক্ষমতা ও নেতৃত্বের উদ্ধত আচরণে প্যাটেল শেষ কথা বলার দাবীদার (কংগ্রেসের মধ্যে) হতে চেয়েছিলেন, অবশ্য কাঞ্জি দ্বারকাদাস পূর্বেই ১৭ই ডিসেম্বরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলিকে জানিয়েছিলেন ভারতের নেতৃত্বে নেহরু অপেক্ষা প্যাটেলের গুরুত্ব সর্বাধিক।[৪৫] ভাগাভাগির কথাটা গান্ধীজী মেনে নিতে পারেননি, তিনি ভাইসরয়কে বললেন প্রয়োজনে লীগ আর তার নেতা মিঃ জিন্না সরকার গঠন করুন ; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অস্ত্রের কাছে পরাজিত হয়ে দেশ ভাগকে তিনি মেনে নিতে পারেন না। গান্ধীজী ৫ই এপ্রিলে ইজমেকে চিঠি লেখেন—লীগ আর মিঃ জিন্না মন্ত্রিসভা গঠন করলে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না এবং মন্ত্রিসভা যদি ভারতীয় জনগণের জন্যে কাজ করে আর তা হয় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকে পরিত্যাগের মাধ্যমে তবে কংগ্রেস এই মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করবে না, কিন্তু লীগকে 'ন্যাশানাল গার্ড' তুলে নিতে হবে। জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধ কিছু করলে অবশ্যই ভাইসরয় এর সমাধান করবেন, প্রধান শর্তটা কিন্তু হলো ভারতে শান্তি রক্ষার জন্য মন্ত্রিসভাকে কাজ করতে হবে, আর এটা যদি লীগ পূর্ণ করতে সক্ষম হয় তবে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে 'পাকিস্তান' নিয়ে কথা বলতে পারেন, অন্যথায় কংগ্রেসকেই মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে। মিঃ জিন্না গান্ধীজীর এই প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত দেখাতে পারেননি, নেহরু-প্যাটেলরাও এটাকে মেনে নিতে পারেননি। কংগ্রেস নেতৃত্বের মতামতে গান্ধীজী ব্যথিত

হলেন—তাহলে কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব কি তাঁকে আর সক্রিয় রাজনীতিতে দেখতে ইচ্ছুক নয়! গান্ধীজী সেই পথ নিলেন,—এ যেন রবীন্দ্রনাথের দর্শন 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে.....'। তিনি চললেন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বিহারের পথে মানবিকতা আর সৌভ্রাতৃত্বের বাণী নতুন করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে ; ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলার বিষবৃক্ষের ফল তাঁর চারদিকে টুপ্‌টাপ্ ঝরে পড়ছে। কাঞ্জি দ্বারকাদাস সময় এবং গান্ধীজীকে এভাবে দেখলেন :

> Mountbatten. Nehru and patel henceforth worked closely together. Gandhiji had already become a back number His day had gone but he did not realise it He resented it and complained about it Gandhiji was not informed beforehand of the 8th March Working Committee Resolution Sardar Patel was ready for the surgical operation to get rid of the Muslim League [৯৬]

৮ই ও ৯ই এপ্রিলে বড়লাট পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে পূর্ববর্তী আলোচনা (৩১শে মার্চ) অনুসারে মিঃ জিন্নাকে জানালেন, মন্ত্রিসভায় বাজেট পেশ ও পাশ বিষয়টির গুরুত্বের পাশাপাশি ভারতকে সাম্প্রদায়িক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে যদি ভাগ করতেই হয়, তবে বাংলা ও পাঞ্জাবের পূর্ণ দখল তিনি পাবেন না। এ দুটো প্রদেশকে অবশ্যই ভাগ কবতে হবে। মিঃ জিন্না এতে সম্মত হতে পারেননি, পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ তাঁর কাছে যে 'পোকায় কাটা'। বড়লাট ১০ই এপ্রিলে পুনরায় মিঃ জিন্নাকে একই প্রস্তাব সম্পর্কে জানান, মিঃ জিন্নাও তাঁর দাবীর প্রতি নিষ্ঠাবান—পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত অবস্থায় নয়, অবিভক্ত-ই পেতে চান ; আর ভাগ যদি করতেই হয় তবে অসম কেন বাইরে থাকবে? অর্থাৎ মিঃ জিন্না তবেই সম্মত হবেন যদি পাঞ্জাব ও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে অসমকেও ভাগ করা হয়। ১১ তারিখে নেহরু অসম ভাগে সম্মত হলেন ; তিনি জানতেন অসমের 'শ্রীহট্ট' ব্যতীত অন্য কোনো জেলা পাকিস্তানের সঙ্গী হবে না। ১৭ই এপ্রিলে মিঃ জিন্না ভাইসরয়কে বললেন :

> I do not care how little you give me as long as you give it to me completely [৯৭]

এ সময়ে ভাইসরয় নাকি মন্তব্য করেছিলেন, মিঃ জিন্নাকে তিনি পাগল করার মতো একটা অবস্থায় এনে ফেলেছিলেন।[৯৮] কিন্তু ইতিহাস তো বড়োই নিষ্ঠুর আর সত্য প্রকাশে অপেক্ষমান, দেশভাগজনিত হত্যা ও বীভৎসতার জন্যে ভারতীয়রা যতোটা দায়ী—স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমসাময়িক এবং অব্যবহিত পরের ঘটনাগুলির পৈশাচিকতার দায় কী লর্ড মাউন্টব্যাটেন আর তাঁর ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ আমলারা এড়িয়ে যেতে পারেন! প্রসঙ্গ অন্যভাবেও ওঠে, এই মন্তব্যের মাধ্যমে মিঃ জিন্নার প্রতি যদি কোনো বিশেষ দুর্বলতা বা ব্রিটেনের নেতৃস্থানীয় কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রভাবকে আড়াল করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা কি অন্য ধরনের পাগলামোর (যা অমানবিকও বটে) পরিচয় বহন করে না!

যাহোক, লর্ড ওয়াভেল যা পারেননি, সাম্প্রদায়িকতার উর্বর জমিতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রায় অনায়াসেই তা পেতে চলেছেন; ৮ই এপ্রিলে নাকি নেহরু তাঁকে জানিয়েছিলেন পাঞ্জাব আর বাংলা ভাগে আপত্তি নেই, ১১ তারিখে জানালেন অসমের কথা—অর্থাৎ এই মুহূর্তে একটা নিষ্পত্তি একান্তভাবেই কাম্য। তিনি ২০শে এপ্রিল চমৎকার (!) বক্তব্য রাখলেন :

> They (promoters of Pakistan) can have Pakistan if they wish

to have it, but on condition that they do not break away other parts of India which do not wish to join Pakistan.[৪৯]

নেহরু নিশ্চিভাবেই জানতেন মিঃ মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাজনের উদ্যোগ নিয়েছেন, তবে তাঁর এই বক্তব্য কি শুধুমাত্র মাউন্টব্যাটেন এবং মিঃ জিন্নার প্রতি চাপ সৃষ্টি করার জন্য, কেননা—

At the staff meeting on April 11, Mountbatten conceded that there was no possibility of shifting Jinnah from his position, and that without his agreement unity could only be imposed on India by force of arms .. Isme was deputed to prepare a plan for the partition of India.[৫০]

বস্তুত, যে পর্ব শুরু হতে চলছে তার সবটাই তো ৮ই ও ৯ই এপ্রিলে কংগ্রেসের তরফ থেকে পাওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি ; নেহরু বললেন আর বড়লাট ব্যবস্থা গ্রহণে আগুয়ান, বিষয়টি এতোটা সহজ না হলেও বড়লাট একে একে সমস্ত জট খোলার চেষ্টা করেন।

১০ এপ্রিল বড়লাট স্টাফ মিটিং-এ প্রস্তাব দিলেন, বাংলা ও পাঞ্জাব বিধানসভার মুসলিম ও অমুসলিম জেলার সদস্যরা আলাদা মিলিত হয়ে যদি প্রত্যেক সভার উভয় সেকশান দেশভাগের পক্ষে রায় দেয় তবে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হবে। সিলেট মুসলিমবঙ্গে যোগ দিতে পারে। সীমান্তে মনোভাব জানবার জন্য নতুন করে নির্বাচন হবে। এই পরিকল্পনা অ্যাটলির স্বনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে তৈরী হচ্ছে।[৫১]

বড়লাট কংগ্রেস-লীগ উভয়ের নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়াস চালান। উভয় সংগঠনকে নির্দিষ্ট করে বলা হলেও দেশে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং বিক্ষিপ্তভাবে দাঙ্গা ঘটেই যাচ্ছে, তিনি গান্ধীজী, মিঃ জিন্নার কাছে অনুরোধ পাঠালেন—ভারতের সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে তাঁরা যেন জনগণকে আহ্বান জানান। ১৫ই এপ্রিলে গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্নার স্বাক্ষরযুক্ত ইশ্‌তেহার প্রকাশ পেলো :

We denounce for all time the use of force to achieve political ends, and we call upon all the communities of India to whatever persuasion they may belong, not only to refrain from all acts of violence and disorder, but also to avoid, both in speech and writing, any incitement to such acts.[৫২]

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর থেকেই ভাইসরয় নিয়ম করেই স্টাফ মিটিং করে যাচ্ছিলেন এবং এই মিটিংগুলির সারবস্তুকে গ্রহণ করে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হন, এভাবে দেখা যাবে কি ভারতীয় কি ব্রিটিশ আমলা কেউ-ই তাঁর কর্মকাণ্ডে সামান্য বাধা হয়ে দাঁড়াননি। এপ্রিলের ১৫ ও ১৬ তারিখে গভর্ণবদের সভায় পাঞ্জাব এবং বাংলা বিষয়ে তাঁর বক্তব্যকে ঘিরে বিবেচনার প্রশ্ন তোলেন পাঞ্জাবের গভর্ণর জেনকিনস্ ও অসুস্থ বাংলার গভর্ণর বারোজ-এর পরিবর্তে আগত প্রতিনিধি জে. এফ. টাইসন। জেনকিনস্-এর বক্তব্য ছিলো পাঞ্জাবকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাগ করা যুক্তিসঙ্গত বা বিবেচনাপ্রসূত হবে না, কেননা পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখদের বসবাস এমন যে, কোনো এলাকাকে কোনো একটি সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করলে অন্য দুটি সম্প্রদায়ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমন কী অনেক ক্ষেত্রে জেলা শহরগুলিতে কোনো এক সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশী হলেও তার পার্শ্ববর্তী

অঞ্চলগুলি ঘিরে রেখেছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরা—অর্থাৎ ভাগ যে নিয়ম মেনে যেভাবেই হোক অনেক মানুষের অসন্তুষ্টি ও স্বার্থহানি ঘটাবে ; সমস্যার সমাধানে অন্য পথ আবিষ্কার হবে তাই বাস্তবানুগ এবং জ্ঞানোচিত। জে. এফ. টাইসন জানালেন, বাংলা ভাগের বিষয়ে গভর্ণর বারোজের দৃষ্টিভঙ্গি পক্ষে নয়, কিন্তু কেন বঙ্গবিভাজন বারোজ চাননি সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনাতে যাননি টাইসন। ভাইসবয় বাংলা ও পাঞ্জাবকে এই সন্ধিক্ষণে আলোচনা থেকে সরিয়ে অন্যান্য প্রদেশ নিয়ে ভাবতে শুরু করেন।

সোহরাওয়ার্দী ২৬শে এপ্রিলে (১৯৪৭) বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে যুক্ত বাংলা বা অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে এক 'স্বর্ণচিত্র' তুলে ধরেন। ২৭শে এপ্রিলে তিনি দুটো কাজ করেন, মহম্মদ ইসমাইল খানকে নিয়ে তিনি মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, অমলেন্দু দে মনে করেন, হয়তো এ সময়ে তিনি মিঃ জিন্নাকে স্বাধীন বাংলা গঠন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল করেন।[৩৩] দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, তিনি দিল্লীতে এক প্রেস কনফারেন্সে স্বাধীন বাংলার বিষয়টি তুলে ধরেন। অবশ্য ২৬শে এপ্রিলেই তাঁর সাফল্য ছিলো সবাধিক, লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন—কলকাতা-কেন্দ্রিক এই স্বাধীন বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বা যদি অন্য দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ও তাদের থেকে সম্পদ ও প্রাচুর্যে স্বাতন্ত্র্য দাবী করবে ; দারিদ্র্যমুক্ত হবে এই বাংলা। অন্যদিকে কলকাতাকে তার স্বীয় ঐতিহ্যে স্থিতিশীল রাখতে স্বাধীন বাংলার সবকার সচেষ্ট থাকবে এই কারণে যে, বিদেশী মূলধন পুঁজি বর্তমানের মতোই স্বাধীন বাংলাতেও গুরুত্ব লাভ করবে ; কমনওয়েলথে যোগদানের মাধ্যমেই ব্রিটেনের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ককে অধিকতব মজবুত ও সুদৃঢ় করার অঙ্গীকারে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার সরকার আবদ্ধ থাকবে। সোহরাওয়ার্দীর এবংবিধ বক্তব্যে মাউন্টব্যাটেন অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা লাভে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠন একটি বিবেচ্য বিষয় হিসেবে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়।

সোহরাওয়ার্দী কলকাতা ফিরে দেখলেন লীগ কার্যত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, স্বাধীন বাংলা আর পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর বাংলাকে সামনে রেখে। মওলানা আকরাম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন ও ইস্পাহানি-রা মিলে বাংলায় তাঁদের (সোহরাওয়ার্দী-হাশিম) বিরুদ্ধে ছোটোখাটো একটা জেহাদ ঘোষণা করে বসে আছেন। সোহরাওয়ার্দী-হাশিম মিলিত হলেন শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে, যদিও শরৎচন্দ্র বসু স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠন আন্দোলনে অগ্রণী; কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা সোহরাওয়ার্দী থেকে স্বতন্ত্র—ব্যতিক্রমধর্মী।

৯ই মে গান্ধীজী কলকাতায় এসে সোদপুরের খাদি আশ্রমে থাকেন। বাংলার নেতৃবৃন্দের পক্ষে একটা সুবিধে হলো এই সময়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মত বিনিময়ের, বিশেষত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠন প্রয়াসী নেতৃবৃন্দ তাঁর সাহায্য ও সহানুভূতির পাশাপাশি ভবিষ্যত সর্ম্পকে পরামর্শের আবেদন জানানোর। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও এ সময় গান্ধীজীকে কাছে পেয়ে যান। ৯ই মে শরৎ বসু, ১০ই মে আবুল হাশিম, ১১ই মে সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুর রহমান গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এঁরা প্রত্যেকেই গান্ধীজীকে স্বাধীন বাংলা গঠনের পক্ষে চেষ্টা চালাতে ও মতামত দিতে আবেদন জানান। গান্ধীজী স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেককেই উপলব্ধি করতে বললেন হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সৌহার্দ্যের কথা, তবে সোহরাওয়ার্দীর দায়িত্বটাও যে মুখ্য

সেকথা তিনি গোপন রাখেননি :

> If he were the Prime Minister of Bengal, he would plead with his Hindu brethren to forget the past He would tell then he was as much a Bengali as they were. Difference in religion could not part the two.[২৪]

'দ্য স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় আরো প্রকাশ পেলো, বাংলার প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) যদি আন্তরিক হন তবে অবশ্যই কার্যসিদ্ধি ঘটবে।[২৫] অর্থাৎ তিনি যদি প্রচেষ্টার মূলে রাখেন বাংলা-বাঙ্গালী এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানের ঐকান্তিকতা তবে তাঁর ভালোবাসা ও উদ্যম অবশ্যই জয়ী হতে পারবে।

বস্তুত, স্বাধীন বঙ্গভূমির বিষয়টি ইতিপূর্বে প্রচারিত হলেও ততোধিক গুরুত্ব লাভ করেনি যা গান্ধীজীর বাংলায় আসায় হলো, ১০ই মে আবুল হাশিম যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন সে সময় শরৎচন্দ্র বসুও সেখানে উপস্থিত থাকেন, ১২ তারিখে পুনরায় সোহরাওয়ার্দী দীর্ঘ সময় নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে স্বাধীন বঙ্গভূমির রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেন, এর পরে গান্ধীজীও এই প্রয়াসের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। আলোচনায় সোহরাওয়ার্দীকে সাহায্য করেন অর্থমন্ত্রী মহম্মদ আলী এবং আবুল হাশিম। বাংলার এই নেতৃবৃন্দ পরপর গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে স্বাধীন বাংলার ভবিষ্যৎ কী হতে পারে সে সর্ম্পকে গান্ধীজীকে ওয়াকিবহাল করতে সচেষ্ট হন, পাশাপাশি তাঁরা নিজেরা আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী রূপায়ণ ও পদ্ধতি প্রয়োগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন ; বাংলা প্রদেশের কংগ্রেসের নেতা কিরণশঙ্কর রায় বসু-সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছান। শরৎচন্দ্র বসুর বাড়িতে বসেই সিদ্ধান্ত হলো স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অতঃপর তাঁরা দিল্লিতে কংগ্রেস এবং লীগের হাইকমাণ্ডের অনুমোদনের জন্য চেষ্টা করবেন।[২৬] প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন, গান্ধীজীর সঙ্গে বাংলার নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে যতোবার উপস্থিত হয়েছেন গান্ধীজী প্রতিবারেই তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি কলকাতা-নোয়াখালিতে যেভাবে নষ্ট হয়েছে তা যতোই বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক হোক না কেন তাকে স্বীকার করে নিয়েই ভবিষ্যতের জন্য হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব, কেননা যা ইতোপূর্বে আগস্ট-অক্টোবরে (১৯৪৬) ঘটে গেছে তা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো এক হঠকারিতার ফলমাত্র না হলেও বাংলার দুই সম্প্রদায়-ই নিশ্চিত এ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভে আগ্রহী এবং সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরী করতে প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) সোহরাওয়ার্দীকেই এগিয়ে আসতে হবে। লক্ষণীয় এই সময় সোহরাওয়ার্দীর চেতনারও পরিবর্তন ঘটে, 'Direct Action Day' পালন করতে গিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো তা পাকিস্তান সৃষ্টিতে সাহায্য করলেও বাংলার সার্বিক উন্নতি না ঘটিয়ে এক বিপর্যস্ত জীবনযাত্রা উপহার দেয় ; এই পরিস্থিতিকে সামাল দেয়া বর্তমানে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে প্রায় ক্ষমতার অতীত—কেননা লীগের অভ্যন্তরেই দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য বর্তমান। এতদ্ব্যতীত যে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এতো রক্তক্ষরণ সে তো খোদ সোহরাওয়ার্দীর ক্ষমতাকে খর্ব করতে তৎপর। তাঁর নিজের রাজনৈতিক পরিচিতি ও গুরুত্ব যখন প্রশ্নের সম্মুখীন—পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক আলখেল্লায় লীগের একাংশ যখন বৃহত্তর বাংলাকে

ঢোকাতে তৎপর ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তখন সোহরাওয়ার্দী দেখলেন এই মওলানা আকরম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দীন, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানি প্রতিযোগিতাব দৌড়ে মিঃ জিন্নার অনেক কাছে পৌঁছে গেছেন। বাংলা ভাগ হলে সোহরাওযার্দীর হাতে থাকলো কী! নিজের অস্তিত্ব (নেতৃত্ব) যে সঙ্কটের মুখে!

১২ই মে (১৯৪৭) শরৎচন্দ্র বসু স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছয় দফা প্রকাশ করে আপাত গ্রহণযোগ্য একটি সূত্রে পৌঁছাতে ও ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির এক রূপবেখা প্রণয়নে উদ্যোগী হলেন.

> (I) Bengal to be a socialist republic , (2) The Bengal Legislature to be elected after the Constitution of the republic is framed, should be elected on the basis of adult franchise and joint electorate , (3) The Bengal Legislature so elected should decide the relations of Bengal with the rest of India, (4) The present Muslim League Ministry should be dissolved and a representative interim cabinet formed without delay; (5) The public services in Bengal should be manned by Bengalis, and Hindus and Muslims should have an equal share in it, and (6) An ad hoc Constitution-making body consisting of 30 or 31 members should be set up by the Congress and the Muslim League in Bengal It should frame the Constitution of the republic of Bengal as soon as possible [79]

কিন্তু ইতোপূর্বেই ৩০শে এপ্রিলে কনস্টিটুয়েন্টি এসেমব্লির সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক দীর্ঘ বিবৃতি দিযে পাঞ্জাব ও বাংলার বিভাজনকে গ্রহণ করাব পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি বিবৃতিতে বলেন, পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হতে পারে লীগের লাহোর প্রস্তাবকে অনুসরণ করেই।[৮০] অবশ্য ইতোপূর্বেই আর. এন. সরকাবও কলকাতায় বাংলা ভাগের পক্ষে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্সের ভবনে শিল্পপতিদেব কাছে ওকালতি কবেন। ৭ই মে বাংলার পাঁচজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ—স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডাঃ শিশির মিত্র এবং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শিক্ষা ও শিল্পের নিরাপত্তা রক্ষার্থে লিস্টওয়েলের নিকট এক তারবার্তা পাঠান ; মূল উদ্দেশ্য বঙ্গ-বিভাজন।

> Education, trade and industry in Bengal have almost collapsed owing to recurrent riots causing insecurity of life and property The present Communal Ministry is totally incapable of maintaining law and order We strongly support the immediate formation of a separate West Bengal Province guranteeing under a non-communal Ministry safety of life and unhindered progress in education, industry and commerce, with the continuance and development of Calcutta a vital part of West Bengal, as a moral, intellectual social and economic centre [81]

শরৎচন্দ্র বসুর ছয় দফা প্রকাশের পরদিনেই কলকাতা করপোরেশন বাংলাদেশ ভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ কবে। ১৫ই মে-তে কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের

মতামত জানায় যা স্বাধীন বঙ্গভূমিকে স্বীকার না করে বরং বাংলার বিভাজনকে সুস্পষ্ট করে তোলে। ১১ই মে-র শ্যামাপ্রসাদের বিতর্কিত চিঠির ১৭ই মে-তে উত্তর দিলেন প্যাটেল। তিনি শ্যামাপ্রসাদকে ভরসা দেন এই বলে যে তাঁর উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই, পরিস্থিতি নিশ্চিত নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ২০শে মে বসু-হাশিম স্বাক্ষরিত স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের লক্ষ্যে দলিল প্রকাশিত হলেই সর্দার প্যাটেল ২১শে মে কিরণশঙ্করকে চিঠিতে অভিযুক্ত করেন, তাঁর ধারণা বসু-রায় যা করেছেন তা কংগ্রেসের ক্ষতি করছে। প্যাটেলের চিঠি পেয়ে কিরণশঙ্কর রায় কংগ্রেসের মূল অংশের বা কেন্দ্রীয় চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা করেন, ফলত বসু-সোহরাওয়ার্দী-হাশিম শক্তির দিক দিয়ে আরো হীনবল হয়ে পড়েন। ২৩শে শরৎচন্দ্র বসু পাটনা অবস্থানরত গান্ধীজীকে চিঠি লিখলেন ২০শে মে-র বিষয়টিকে উপস্থিত করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সহযোগিতা কামনা করে। চিঠির একটি অংশে আমরা দেখতে পাই:

> I am most anxious to have your reactions and also your help, advice and guidance in giving final shape to the tentative agreement arrived at. I need not repeat what I told you at Sodepur. I still feel that if with your help, advice and guidance the two organizations can arrive at a final agreement on the lines of the tentative agreement, we shall solve Bengal's problems and, at the same Assam's. It may also have a very healthy reaction on the rest of India. If you want me to come to Delhi to discuss matters further with you, I need hardly say that I shall come as soon as I get your message
>
> Things are moving very rapidly and, speaking for myself, I feel that further discussions with you are most necessary[৬০]

২৪ তারিখেই গান্ধীজী শরৎচন্দ্র বসুর চিঠির যে উত্তর দিলেন তার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই যদি সব সিদ্ধান্ত বাংলায় গৃহীত হয় তবে সেটা যে একতরফা হবে, তাতে সার্থকতা আসবে কেমন করে। অতএব, উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থই যাতে রক্ষিত হয় তার নিশ্চয়তা খসড়া পরিকল্পনায় না থাকলেও প্রয়োজন হবে।

> Every act of Governtment must carry with it the co-operation of at least two-thirds of the Hindu members in the executive and legislature. There should be an admission that Bengal has common culture and common mother tongue–Bengali Make sure that the Central Muslim League approves of the proposal notwithstanding reports to the contrary.[৬১]

গান্ধীজী তাঁর চিঠিতে ২০ তারিখে প্রকাশিত দলিলের দু-একটি সংশোধনী তুলে ধরেন, কিন্তু বৃহত্তর বাংলার স্বার্থে সেগুলি কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো? অস্বীকার করার উপায় নেই সোহরাওয়ার্দী-হাশিম ক্রমশ লীগের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন, পক্ষান্তরে মওলানা আকরম খাঁ-খাজা নাজিমুদ্দীন-ইস্পাহানি বাংলার মুসলমানদের বোঝাতে সক্ষম হচ্ছিলেন সোহরাওয়ার্দী-হাশিম-রা যা করছেন বা ভাবছেন তার সঙ্গে বাংলার লীগ

বা কেন্দ্রীয় লীগের কোনো-ই সংস্রব নেই—এমন কি সমর্থনও নেই। গান্ধীজী বাংলায় লীগের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কতদূর পৌঁছে গিয়েছে বোধ করি তা তিনি জানতেন না, আর ২৫শে এপ্রিলে ভাইসরয়ের স্টাফ মিটিংয়ে Sir Eric Mieville, Mr. Scott, Mr Abell, Mr. W H.J. Christie, Lord Ismay ও অন্যান্য সহ ভাইসরয় ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতখানি অগ্রসর হয়েছেন[৬২] (ভারত ও পাকিস্তান দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা), অথবা ইতোমধ্যে কোন্ পরিকল্পনার কথা ভাইসরয় নেহরু-প্যাটেল-বলদেবকে জানিয়েছেন। সম্ভবত, গান্ধীজী জানতেও পারেননি ভাইসরয় কেন তাঁর ব্যক্তিগত রিপোর্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন:

> I very much hope that the cabinet will be able to give me the necessary authority to go ahead and will be able to release Ismay after a week, for we all feel that every day now counts out here if we are to prevent the communal conflict from spreading to unmanageable proportions[৬৩]

গান্ধীজীর জানার কথাও নয়—ভাইসরয় তাঁর গোপন রিপোর্টে কী লিখেছিলেন, কিন্তু প্রশ্ন হলো কংগ্রেস রাজনীতিতে—ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে ১৯৪২-এর মতোই তাঁর নেতৃত্ব থাকলে বা রাজনীতিতে বহমানতা অব্যাহত থাকলে গান্ধীজীর পক্ষে অনেক কিছুই অনুমান করা এবং ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব হতো। যাহোক, শরৎচন্দ্র বসুর উত্তর দিলেন তিনি, কিন্তু পক্ষে কোনো মতামত দিতে পারলেন না, এমন কী সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিতেও তিনি অপারগ ছিলেন ; শুধু জানালেন যে দিল্লিতে এ খবর পৌঁছে দেবেন তিনি। বস্তুত এর বেশী গান্ধীজীর পক্ষে বলাও সম্ভব ছিলো না, ১৯৪২ আর ১৯৪৭ ভারতের রাজনীতিতে যে আসমান জমিন ফারাক!

২৬শে মে বাংলার বাইরে বিহারে বাঙ্গালী অ্যাসোসিয়েশনের পাটনা শাখার সভায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন পত্রিকার সম্পাদক ডঃ শচীন সেন বাংলা ভাগের দাবী সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। ২৮শে মে লীগের প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মিঃ জিন্নার নেতৃত্বের প্রতি এবং পাকিস্তান গঠনের পক্ষে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হলে অবশ্যই সোহরাওয়ার্দী-হাশিম লীগের মধ্যে অনেকটা একঘরে হয়ে পড়েন, বলা চলে বাংলার মুসলমান সমাজ থেকে তাঁরা যেন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর্যায়ে এসে পৌঁছান। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কার্যকরী ক্ষমতা এবং মুসলমানদের ওপর প্রভাব প্রতিদ্বন্দ্বী মওলানা আকরাম খাঁ-নাজিমুদ্দীন-ইস্পাহানি খর্ব করতে সক্ষম হন। শরৎচন্দ্র বসু-ও অনেকটা ডানাছাঁটা জটায়ু,— কিরণশঙ্করও পাশে নেই, কিন্তু প্রচেষ্টা তিনি অব্যাহত রাখেন। ৩১শে মে দিল্লিতে কথা বললেন গান্ধীজীর সঙ্গে, কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারেননি ; স্বজন হারানো ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত কোনো প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে যেন দুই পিতামহ!

কৃষক-প্রজা পার্টি ২৮শে মে (১৯৪৭) তারিখে কর্মী ও নেতাদের মিলিত এক আবেদনে ভারতীয় জনগণকে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ বন্ধে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানায়।[৬৪] মূলত কৃষক-প্রজা পার্টি বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাংলা বা বিভক্ত ভারতে বিভক্ত বাংলা এর কোনোটার ওপরেই গুরুত্ব আরোপ করেনি, তাদের দলীয় বক্তব্য ছিলো প্রথমত, ব্রিটিশ এবং পরবর্তীতে

ভারতীয়রা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। দ্বিতীয়ত, ভারত বিভক্ত হলে বা বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হলে—অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের মধ্য থেকে যে অবস্থায়-ই পাকিস্তান গঠিত হোক না কেন তা ভারতকে দুর্বল করবে, এমন কী পাকিস্তান তৈরী হলে তাও হবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিকলাঙ্গ, তার ভবিষ্যৎ হবে দারিদ্র্য আর অনাহার, পাকিস্তানের অন্তর্গত মুসলমানরা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই। অবশ্য ইতোপূর্বে ১৯৪১-এ আমরা দেখেছি কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক পাকিস্তান পরিকল্পনার (লাহোর প্রস্তাব) বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য কতোটা গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয় বিরূপ মন্তব্য করেন। মোদ্দা কথা হলো, এই মুহূর্তে ১৬ই মে-র (১৯৪৬) ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা সকল রাজনৈতিক দলগুলির গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে তিনি দলীয় মতামত ব্যক্ত করেন। লীগ যদি ভারত বিভাগ সর্ম্পকে গোঁ ধরে থাকে তবে বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাংলা বা বিভক্ত ভারতে বিভক্ত বাংলা এই বিষয়টিকে নিয়ে পুনরায় নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়া আবিশ্যিক ; তাঁর মতামত হলো জনগণই শেষ কথা বলবে—তাদের রায়-ই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তবে তাঁদের কাম্য হলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বলিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র—যা অনেকটা শরৎচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক চেতনার কাছাকাছি।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর (কৃষক-প্রজা পার্টির প্রাক্তন সম্পাদক) আর ফজলুল হক—এঁদের চেতনায় ছিলো লীগের দুঃশাসনের প্রতীক নেতৃবর্গের দ্বারা শাসিত অঞ্চলে না ধর্ম না অর্থনীতি না সামাজিক-মানবিক বিকাশ কোনোটা-ই সুষ্ঠুভাবে উপস্থিত হতে পারে না। বিশেষত বাংলার ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য রাখার তাঁরা পক্ষপাতি ছিলেন। বিভাগ মানেই দেশের সর্বনাশ, বিভাগ মানেই ভারতে চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি। অতএব, বিভাজনকে এড়িয়ে স্বাধীনতা কাম্য ; অবিভক্ত ভারতকেই তিনি বা তাঁর দল যেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি এর কাছাকাছি চিন্তা-ভাবনা করলেও বাস্তবতার দিক দিয়ে সেটা সমস্যামুক্ত ছিলো সে কথা বলা চলে না। তবে কৃষক-প্রজা পার্টি তার অতীতের গৌরব ধরে রাখতে পারেনি বাংলায় লীগের তৎপরতা বৃদ্ধিতে, কিন্তু সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি আদর্শগতভাবে ক্রমশ জনগণের একাংশের আস্থা অর্জনের পথে চলছিলো, বলা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থা তারা সামলে নিয়ে জনগণের কাছাকাছি সংগঠনকে পৌঁছে দিতে অনেকটাই সক্ষম হয়েছিলো।

কমিউনিস্ট পার্টির এই সময়কার চিন্তা-ভাবনা কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। লীগ ধর্মীয় দৃষ্টিতে দ্বি-জাতিতত্ত্ব প্রকাশ করে, তাদের কাছে হিন্দু অথবা মুসলমান এই পরিচয়টাই মুখ্য, কিন্তু কমিউনিস্ট ধর্মীয় পরিচয়কে উপেক্ষা করে ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে ভারতে সতেরোটি জাতি,[৬৮] এবং এই জাতিসত্তাকে সমভাবে মর্যাদা দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা কর্তব্য বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। এই সতেরোটি জাতিকে যদি একটি পরিবার কল্পনা করা যায় তবেই ভারত স্বাধীনতার সার্থকতায় পৌছবে।[৬৯] মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী এবং বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন এক দীর্ঘ যুক্ত বিবৃতি দেন, এখানে দেশ ভাগ এবং

বাংলা ভাগ হলে কী হবে আর কী হবে না তা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত করা হয়। তাঁদের বিশ্বাস ব্রিটেন এক ভেদনীতির মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা দিতে তৎপর, ক্ষমতা হস্তান্তরের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে বৃহত্তর ভারতেব অবলুপ্তি এবং সাম্প্রদায়িক চেতনাব ক্রমবিকাশের পাশাপাশি ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজির আধিপত্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা।

এপ্রিলের ১৫-১৬ তাবিখে ভাইসরয গভর্ণরদেব সভায পাঞ্জাব, বাংলা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজনৈতিক অবস্থাব পর্যালোচনার আহ্বান জানান। পাঞ্জাব, বাংলার বিভাজন আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নির্বাচন বিষয়টি নিয়ে সভায় মতপার্থক্য দেখা দিলেও ভাইসরয় কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে সক্ষম হলেন, মিঃ জিন্নাকে কোনো অবস্থায়-ই ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করানো যাবে না।

> Consultation with the Governors certainly gave Lord Mountbatten a good idea of the colossal administrative difficulties involved in a transfer of power based on partition But the problem that actually confronted him was, if it became inevitable to divide the country–and Lord Mountbatten was sure that no other solution would be acceptable to Jinnah–how was this to be brought about with the willing concurrence of the parties concerned? The greater the insistence by Jinnah on his province-wise Pakistan, the stronger was the Congress demand that he should not be allowed to carry unwilling minorities with him [৬৬]

ভারতের সর্বত্র নতুন করে স্বাতন্ত্র্যের দাবী উচ্চারিত হচ্ছে, জোরদার হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতার নতুন রূপ প্রকাশ পাচ্ছে ; এ অবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরদের সঙ্গে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বৈঠক ছিলো অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যেতে পারে এটা তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ—Plan Balkan-এর উৎসভূমি, যার অন্তর্নিহিত সত্য হলো সংবিধান রচনার পূর্বে ক্ষমতা হস্তান্তর, প্রদেশগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দেয়ার পক্ষে তাদের হাতেই স্বাধীনতার (ভারতকে নানা ভাগে বিভক্ত করারও বটে) প্রাথমিক পর্বটি তুলে দেয়া যাতে দেশীয় রাজ্যগুলিও প্রয়োজনে নিজেদের অধিকার রক্ষায় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। মিঃ জিন্না যে লীগের পক্ষে ইতোমধ্যে অনেকটা পথ পরিক্রমণ করে বসে আছেন।

> He suggested that an exchange of population would sooner or later have to take place and that this could be effectively carried out by the respective Governments in Pakistan and Hindustan. He finally demanded the division of the Defence forces and stressed that the States of Pakistan and Hindustan should be made absolutely free, independent and sovereign [৬৭]

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব নেয়ার প্রায় দেড় মাসের মধ্যেই বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর এবং বিশ্বস্ত আমলাদের সহাযতায় ২রা মে ইজমের হাতে

ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা প্রদানের এক পরিকল্পনা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় পৌঁছানোর জন্য তুলে দেন। জওহরলাল নেহরুকে এই পরিকল্পনা (১ তারিখে) দেখার জন্য দেয়া হয়, কিন্তু অনেকের মতে তিনি পুরো পরিকল্পনাটি দেখার সুযোগ পাননি, হয়তো আংশিক দেখে থাকবেন। এই পরিকল্পনাটি ১০ই মে অ্যাটলি সরকারের অনুমোদনের ছাপ নিয়ে ফিরে এলে মাউন্টব্যাটেন সে রাত্রেই নেহরুকে দেখতে দেন। পাশ হওয়া এই পরিকল্পনা দেখে নেহরুর তো আক্কেল- গুড়ুম—ভদ্রলোক করেছেন কী। অথচ ভাইসরয় আজকেই সিভিল মেননের উপস্থিতিতে মেননের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে বলেন এবং নিজেও অংশ নেন। কথা হয়েছিলো দুটো ডোমিনিয়নের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে এবং দুই ডোমিনিয়নের দুই গণপরিষদ নিজ নিজ সংবিধান রচনা করবে। কিন্তু কী দুর্দৈব, ব্রিটেন থেকে ফিরে আসা পরিকল্পনাতে সব যে ভেস্তে দিয়ে দু' একটা প্রদেশের (বাংলা বা পাঞ্জাব) অংশবিশেষ পৃথকীকরণের বন্দোবস্ত না করে সবগুলো প্রদেশকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা ফেঁদে বসে আছে। আরো আশ্চর্যের কথা হলো—প্রদেশগুলোই প্রথমে ক্ষমতা লাভ করবে, অতঃপর তারা ঠিক করবে কে কোন ডোমিনিয়নে যোগ দেবে বা যোগ দিতে পারে, অর্থাৎ তারা মিলিত হয়ে য়ুনিয়ন গড়বে। কিন্তু প্রশ্ন থাকে যদি তারা সেভাবে য়ুনিয়নে যোগ দিতে না চায় অথবা দেশীয় রাজারা যদি নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে স্বাধীনতা ঘোষণার সমতুল্য কিছু করে বসে? তখন? তখন কি ভারত বা পাকিস্তান দুটি ডোমিনিয়নের পারস্পারিক সর্ম্পক তিক্ততায় পর্যবসিত হবে না, সীমান্ত প্রদেশ কি নতুন করে ভাববে তার অবস্থান কোথায় হবে? পণ্ডিত নেহরু ভোররাত চারটে পর্যন্ত কৃষ্ণমেননের সঙ্গে এই পরিকল্পনার বিষয়বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা শেষে ভাইসরয়কে লিখলেন:

> The whole approach was completely different from what ours had been and the picture of India that emerged frightened me. In fact much that we had done so far was undermined and the Cabinet Mission's scheme and subsequent developments were set aside, and an entirely new picture presented—a picture of fragmentation and conflict and disorder, and unhappily also, of a worsening of relations between India and Britain [৬৮]

জওহরলাল নেহরুর এই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত, এমন কি খোদ বড়লাটও এটাকে সহজভাবে না দেখে নেহরুর খুঁত ধরতে ব্যস্ত ছিলেন। বিভিন্ন মতামতের মধ্যে অমলেশ ত্রিপাঠীর বক্তব্য উপেক্ষা না করে যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা চলে, তিনি মনে করেন বড়লাট পুরো প্লানটি নেহরুকে দেখাননি, না দেখানোর অংশটার সম্মতি তিনি পেয়ে যাবেন এমন একটা ধারণা তাঁর ছিলো। মুর-এর কথা তুলে শ্রী ত্রিপাঠী উল্লেখ করেছেন ১লা মে তারিখেই স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন নাকি কিছু গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করেন, শ্রী ত্রিপাঠী প্রশ্ন তুলেছেন কী সেই রদবদল? বাংলার গভর্ণর বারোজ ১লা মে ভাইসরয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর পূর্বেকার স্বাধীন বঙ্গভূমির দাবী এদিনেও কি উত্থাপন করেন? পাশ হয়ে আশা এই পরিকল্পনায় কিন্তু বারোজের স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায়

যা নেহরু চাননি এবং এই না চাওয়াটা পূবাহ্নে-ই ভাইসরয়কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা একসময় পাকিস্তানে মিশে যাবেই। শ্রী ত্রিপাঠী বলেন:

> অ্যাটলির নির্দেশে এমন এক পদ্ধতির কথা ছিল যাতে (১) ভারতের বিভিন্ন অংশের সংবিধান বর্তমান গণপরিষদের সঙ্গে মিলিত ভাবে অথবা (২) অন্যান্য অংশের সঙ্গে যৌথ ভাবে অথবা (৩) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে রচিত হবে। এই তিনটি বিকল্প দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হতে পারে (বড়লাট, ছোটলাটদের চিঠিপত্র L/P/2, J/10/79), এতদিন নেহরু ভেবেছিলেন বড় জোর দুটো ডোমিনিয়ানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ১০মে সকালেই ভি পি মেননের এরকম প্ল্যান নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখন রাত্রে দেখলেন—এ কি কাণ্ড! ভারতকে সতীদেহের মত খণ্ডবিখণ্ড করা হচ্ছে! পুরো বাল্কানাইজেশন! স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন পাখতুনিস্তান, স্বাধীন ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ এসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় য়ুনিয়ানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে কি? মোটের ওপব মার্চ থেকে মে পর্যন্ত কংগ্রেস যা বলেছে এটা তার বিরোধী।[৬৯]

যাহোক, এটা পরিষ্কার যে 'অতি বুদ্ধিমানের চাল পরে দূর্বা বনে', এবারে মাউন্টব্যাটেন নিজের গুমরে গাড্ডায় পড়েছেন। মে মাসের প্রথম থেকেই গান্ধীজী তো 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়কার মতো তিরিক্ষি হয়ে আছেন, যদিও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যে, রাজনীতিতে তাঁর অনুগামীদের মধ্যেকার প্রধানরা বর্তমানে ভারতের জনগণ, ভারতে অবস্থানরত ব্রিটিশ কর্মচারী ও উচ্চপদস্থ আমলাদের—এমন কি ভাইসরয়ের কাছেও সমস্যার সমাধান দিতে নিজস্ব মতামত ব্যবহার করেন ; এক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি আজ অবাঞ্ছিত না হলেও বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতোই 'জাতির জনক' বা 'মহাত্মাজী' শিরোনামে অভিষিক্ত। বস্তুত, তাঁর সমস্ত ক্ষমতা আজ নেহরু-প্যাটেল গ্রহণ করে বলীয়ান, আর এ কারণেই মাউন্টব্যাটেন তাঁকে সমীহ করলেও গুরুত্বহীন বলে মনে করেন। দেশ বিভাগ হোক—আর বাংলা-পাঞ্জাব ভাগ-ই হোক কোনোটা আজ আর তাঁর মতামতের জন্য অপেক্ষা করবে না। তবু তিনি ক্ষুব্ধ, বৃদ্ধ গান্ধীজীকে মাউন্টব্যাটেন ভয় না করলেও উপেক্ষা করতে পারেন না। কেননা গান্ধীজী যে গান্ধীজী-ই! মিঃ জিন্না ফাসুর-ফুসুর ছেড়ে এবারে প্রকাশ্যে এলেন, তাঁর পিত্ত কুপিত হলো,—পাঞ্জাব আর বাংলা এ দুটো ভাগ করার দরকারটা কিসে হলো। পণ্ডিত নেহরুর চিঠি বড়লাটকে খুবই ভাবিয়ে তুললো। ভাইসরয়ের ঘোষিত ১৭ই মে-র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গের আলোচনাটা পিছিয়ে দিতে হলো, ভাইসরয় ঠিক করলেন এটা ২রা জুনেই হবে। ১১ই মে রাত্রে তিনি স্টাফ মিটিং ডাকেন, নেহরুর প্রতিক্রিয়া সেখানে আলোচিত হলো। মাউন্টব্যাটেন এসময় তাঁর কর্ম-প্রয়াসে আরো গতির সঞ্চার করেন, প্রকৃতপক্ষে ১১-১৪ তারিখের মধ্যেই মাউন্টব্যাটেন ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টিকে নিষ্পত্তিতে নিয়ে যেতে আগ্রহী, ১৪ তারিখে ইংল্যাণ্ডে যে ক্যাবিনেটের ইণ্ডিয়া কমিটির সভা সেখানে তাঁর নিজের উপস্থিতির পাশাপাশি একটা সিদ্ধান্তও থাকবে যা ভারতের স্বাধীনতা প্রদান বিষয়টির জন্য হবে ঐতিহাসিক এক কর্মকাণ্ড!

মেননের ওপর দায়িত্ব বর্তায় একটা খসড়া পরিকল্পনা গঠনের যাতে নেহরু-প্যাটেল-জিন্না কাছাকাছি আসেন ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে এবং ব্রিটেন থেকে আগত ভাইসরয়ের

সাহায্যকারীরাও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে ঝামেলামুক্ত হতে পারেন। আর দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গের বিষয়টিও যেন ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

> After the meeting with Nehru I returned to my hotel. I had only two or three hours in which to prepare an alternative draft plan and I set to work on it at once The Viceroy was anxious to show the draft to Nehru and to ascertain his reactions before he left Simla that evening, and I had barely got the draft into shape when Sir Eric Mieville came and took it away to the Viceroy.[১০]

ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৪ই মে সিমলা থেকে দিল্লি পৌঁছান। আর এদিনেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ইণ্ডিয়া কমিটি ঠিক করে ভারতের স্বাধীনতা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে লণ্ডনে মাউন্টব্যাটেনের উপস্থিতি আবশ্যিক। ১৬ই মে বড়লাটের নির্দেশে ভি. পি. মেনন তৎপর হলেন Heads of Agreement-এর খসড়া তৈরী করতে।

> On 16th May I drew up a draft 'Heads of Agreement' the feature of which were as follows.
>
> (a) That the leaders agree to the procedure laid down for ascertaining the wishes of the people whether there should be a division of India or not,
>
> (b) That in the event of the decision being taken that there should only be one central authority in India, power should be transferred to the existing Constituent Assembly on a Dominion Status basis,
>
> (c) That in the event of a decision that there should be two soverign States in India, the central Government of each State should take over power in responsibility to their respective Constituent Assemblies, again on a Dominion Status basis,
>
> (d) That the transfer of power in either case should be on the basis of the Government of India Act of 1935, modified to conform to the Dominion Status position;
>
> (e) That the Governor-General should be common to both the Dominions and that the present Governor-General should be reappointed,
>
> (f) That a Commission should be appointed for the demarcation of boundaries in the event of a decision in favour of partition,
>
> (g) That the Governors of the provinces should be appointed on the recommendation of the respective central Governments,
>
> (h) In the event of two Dominions coming into being, the Armed Forces in India should be divided between them The units would be allocated according to the territorial basis of recruitment and would be under the control of the respective Governments. In

> the case of mixed units, the separation and redistribution should be entrusted to a Committee consisting of Field Marshal Sir Claude Auchinleck and the Chiefs of the General Staff of the two Dominions, under the supervision of a Council consisting of the Governor-General and the two Defence Ministers This Council would automatically cease to exist as soon as the process of division was completed[৩]

মেননের হাতে খসড়া তৈরী হলো। এবারে ইজমের হাতে বিলেত পাঠানো পরিকল্পনাটির (২রা মে) মতো যাতে না হয় তার জন্যে ভাইসরয় আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হলেন। ভাইসরয়ের নির্দেশে নেহরু-প্যাটেল-বলদেব সিং-কে নয়া পবিকল্পনার খসড়া দেখানোর দায়িত্ব নিলেন মেনন, Sir Eric Mieville সম্মত হলেন মিঃ জিন্না এবং লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বা খসড়া সম্পর্কে তাঁদের মতামত জানতে। কিন্তু ভাইসরয় কোনো ঝুঁকি নিতে চাননি, এবারে তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসেন ; বস্তুত প্রত্যেকের মনোভাব তিনি বুঝে নিতে চান। আলোচনা হলো কংগ্রেসের পক্ষে নেহরু ও প্যাটেল, শিখদের প্রতিনিধি বলদেব সিং, লীগের নেতা মিঃ জিন্না এবং লিয়াকত আলী খানের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এপ্রিল-মে মাস জুড়ে বাংলা ছিলো বাদ-প্রতিবাদে মুখর। বাংলাকে ভাগ করে হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবীতে হিন্দু মহাসভার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজের সংগঠনেব বক্তব্য দিল্লি পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলো। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বসুর রাষ্ট্রচিন্তাকে কাজে লাগিয়ে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গভর্ণব বারোজের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছেন ভাইসরয়ের কাছে। যদিও সোহরাওয়ার্দী নিজে ভাইসরয়কে পৌনঃপুনিক আবেদন জানিয়েছেন স্বর্ণপ্রসবিনী বাংলাকে স্বাধীনতার গৌরবে মহিয়সী কবতে—এ বিষয়ে সরকারী মহলে বারোজ ছিলেন তাঁর প্রধান পুরোহিত। তৃতীয় এক পক্ষকে আমরা দেখি যাঁরা মিঃ জিন্নার আদর্শে অনুপ্রাণিত, মওলানা আকরম খাঁ-খাজা নাজিমুদ্দীন-ইস্পাহানিরা বৃহত্তর বাংলা চাইলেন—অবিভক্ত বাংলা চাইলেন বটে, কিন্তু সে বাংলা স্বাধীন নয়, পাকিস্তান হবে তার নতুন ঠিকানা। মিঃ জিন্না স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাকে হয়তো স্বীকার করতেন। কেননা তখন তো সর্বত্রই পাঞ্জাব আর বাংলার বিভাজন স্বীকৃতি পেতে চলেছে, কিন্তু পাঞ্জাব প্রশ্নে তিনি নিজেই যে একাধিকবার বলেছেন হিন্দু বা শিখদের প্রাধান্য থাকা জেলাগুলো (অঞ্চল) পাকিস্তানের অধীন না হলে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না। পাকিস্তানের অন্তর্গত যুক্তবাংলা না থাকলেও স্বাধীন বাংলা তো বেনামে পাকিস্তানের আদর্শের কাছাকাছি আসতেই পারতো, কিন্তু তাও তিনি আর দাবী আকারে তুলে ধরতে পারেন না—তাহলে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কথা তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়, আর এটা করলে পাকিস্তানের ভিতটা আল্‌গা হয়ে যাবে। স্বাধীন বাংলা হয়তো দূরবর্তী পাকিস্তানে উড়াল দিতে পারে, কিন্তু পাঠানদের মধ্যে মুসলমানরাই যে বেশী—এবং তাদেরই দাবী স্বাধীনতা। মিঃ জিন্না শেষ অবধি অবিভক্ত বাংলাকে

পাকিস্তানের মধ্যে চেয়েছিলেন, কলকাতা ব্যতীত বাংলা—সে কী কল্পনা করা যায়! কিন্তু মিঃ জিন্না ভাল করে জানতেন বাংলায় যে সাম্প্রদায়িকতার মহীরুহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বিনাশ করার সাধ্য কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার নেই ; বিশেষত হিন্দু মহাসভা নিজেই তো সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন দেয়, তাই সে বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতাকেই জিইয়ে রাখবে। সোহরাওয়ার্দী-হাশিমকে বাংলায় শরৎচন্দ্র বসু বিশ্বাস করলেও কলকাতা-নোয়াখালি-ঢাকার বীভৎসতার পরে হিন্দুদের অতি অল্প সংখ্যাই তাঁদের পাশে থাকবে, শরৎচন্দ্র বসু হারিয়ে যেতে বাধ্য কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার যৌথ আক্রমণে। অমৃতবাজার পত্রিকা তো এপ্রিলের শেষে প্রকাশ করেছে শতকরা ৯৭জন হিন্দুরও বেশী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলায় থাকতে আগ্রহী নয়, অনেকে এটাকে 'ধাপ্পা'-ও ভাবেন। অতএব, শেষ পর্যন্ত মিঃ জিন্না বাংলাকে পাকিস্তানে চান, খণ্ডিত হলে আপত্তি থাকবে, কিন্তু তিনি অস্বীকার করবেন না, শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করেনওনি।

স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে এবং ক্যাবিনেটে ইণ্ডিয়া কমিটির মুখোমুখি হতে ১৮ই মে (১৯৪৭) লর্ড মাউন্টব্যাটেন লণ্ডনের উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করেন। তিনি সঙ্গী করে নেন ভি. পি. মেনন এবং ভের্ননকে। ভাইসরয় ভারতের বাইরে গেলে অস্থায়ীভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনের ভার পড়ে কোনো সিনিয়র গভর্ণরের ওপর—এবার নিয়ে চারবার গভর্ণর কলভিল এই দায়িত্ব পালন করেন।

মিঃ জিন্না 'ঝোপ বুঝে কোপ মারা'-র চেষ্টা করলেন ২২শে মে, অর্থাৎ ভারতের ভাগ্য নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন লণ্ডনে যখন গলদঘর্ম ঠিক তখন মিঃ জিন্না পূর্বপরিকল্পিত পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষার্থে প্রায় ৮০০ শত মাইল দীর্ঘ এক করিডর চেয়ে রয়টারের ডুন ক্যাম্বেলকে খবর জানিয়ে দেন। রয়টার ফলাও করে খবরটি প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে করিডর চাওয়ার মাধ্যমে মিঃ জিন্না আলোচনারত মাউন্টব্যাটেনের ওপর এক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন মিঃ জিন্নার এই দাবীর কথা টেলিগ্রাম করে ভাইসরয়ের সঙ্গী আর্স্কিন ক্রামকে (ভের্ননকে) জানিয়ে দেন।[৭২]

মিঃ জিন্নার করিডর দাবীর প্রতিক্রিয়া অল্প হলেও দেখা দিলো—ব্রিটিশের উচ্চপদস্থ আমলাদের বা ভাইসরয়ের অফিস সহযোগীদের ধারণা ছিলো ধুন্ধুমার বাঁধলেও বাঁধতে পারে। আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসকে এক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বললেন যে, মিঃ জিন্না তাঁর এই উদ্ভট ও আজগুবি দাবী প্রকৃতপক্ষে কোনো সমঝোতায় না আসারই উদাহরণ।[৭৩] ২৭শে মে ভাইসরয়হীন ভাইসরয় অফিসে—দিল্লিতে বাংলার গভর্ণর বারোজ এক রিপোর্ট পাঠালেন, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বাংলা যে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছে;ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। ২৯শে মে ব্রিটেন থেকেই বড়লাট বাংলার গভর্ণর বারোজকে জানালেন, সোহরাওয়ার্দী-হাশিমের স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গভূমির যেটুকু আশা ছিলো তা-ও নিভে গেছে, ক্যাবিনেট যে নেহরু আর কংগ্রেসের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছে।[৭৪] প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, মাউন্টব্যাটেনও কি 'ইঙ্গ-মার্কিন' পুঁজির বিকাশকে ভারতে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ দিয়ে?

লণ্ডন পর্বটি জয় করে মাউন্টব্যাটেন ৩১ তারিখে ফিরে এলেন দিল্লীতে কিন্তু দীর্ঘ পথযাত্রার ক্লান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। প্রথমেই তিনি স্টাফদের সঙ্গে বসেন এবং লণ্ডনের হাল-হকিকত জানান। তিনি নাকি মিঃ জিন্নার উদ্দেশ্যে একখানা চিঠি নিয়ে এসেছেন চার্চিলের, যাকে ক্যাম্বেল-জনসন বলেছেন :

> মাউন্টব্যাটেন অবশ্য লণ্ডন থেকেই একটি অস্ত্র নিয়ে এসেছেন, যেটা তিনি জিন্নার বিরোধিতার বিরুদ্ধে সময় বুঝে এবং প্রয়োজন বুঝে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারবেন। অস্ত্রটি হলো জিন্নার কাছে লেখা চার্চিলের একখানি চিঠি। চিঠিতে জিন্নার উদ্দেশ্যে চার্চিলের একটি অত্যন্ত অর্থগূঢ় অনুরোধ-বাণী উল্লিখিত আছে। চার্চিল জিন্নাকে জানিয়েছেন যে, মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব সমর্থন ও গ্রহণ করা জিন্নার পক্ষে এখন বস্তুত জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানের মতোই ব্যাপার।[৭৫]

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে মাউন্টব্যাটেন লীগ সভাপতির জন্য ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর চিঠি বহন করে আনলেন কেন? তবে কি ভাইসরয়ের সন্দেহ ছিলো এতো কিছুর পরেও মিঃ জিন্না বেঁকে বসতে পারেন? নাকি চার্চিলের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন নিজের সম্পর্কের গুরুত্বকে দেখাতে চেয়েছেন? আর বলিহারি, চার্চিলের কি খুব দায় পড়েছিলো মিঃ জিন্নাকে এই সময়ে তাঁর চিঠি লিখতে হবে? আর তাঁর চিঠির বাহক হবেন ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সত্যি মুশকিলের বিষয়!

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ১৭ই মে-র স্থগিত সভাটা ২রা জুনে হবে বলে তারিখটা ঘোষিত হয়েছিলো ১১ই মে-তে, বড়লাট দিল্লিতে পৌঁছেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক লণ্ডনের আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে উপস্থিত করতে প্রস্তুত হলেন; কারণ এটাই তাঁর কাছে ভারতের ভাইসরয় হিসেবে মোক্ষলাভের অগ্নিপরীক্ষা।

> There were to be no more conferences, no more acrid exchanges, or flights of delegates to and fro the Viceroy summoned the leaders to meet him on Monday morning, when he would announce the absolute decision that India was to be divided.' Mohammed Ali Jinnah would have most of the prize he had fought for;and Pakistan and Hindustan would go their separate ways, with full Dominion status, and the right to secede from the Commonwealth if they chose. The day for the final cleavage was to be only three months away–August 15, 1947–almost a year earlier than Mr Attlee had planned when he entrusted the last Viceroy with his task. From this date also, the princely Indian States would no longer owe allegiance to the British Crown ; they would be free to keep their independence, or to accede to either of the new dominions, as they chose.[৭৬]

নিঃসন্দেহে ২রা জুনের সভাতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সামনে ভাইসরয় প্রধান বক্তা, আলোচ্য সূচীও একপ্রকার সবার-ই জানা;শুধু গ্রহণ করার স্বীকারোক্তি প্রয়োজন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আপত্তি যে নেই তা নয়,—জানিয়েও

মোটামুটিভাবে ভাইসরয়ের পরিকল্পনাকে গ্রহণের অঙ্গীকার জানালেন কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী, বলদেব সিং-ও তাঁর মতামত দিলেন শিখদের নেতারূপে, গোল বাঁধালেন মিঃ জিন্না, তিনি পূর্বের মতোই সময় চান কালহরণের অছিলায়, লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অনুমতি ব্যতীত সিদ্ধান্ত নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় জানালেন। কিন্তু ভাইসরয় সময় দিতে সম্মত নন, শেষ পর্যন্ত মৌখিকভাবে তিনি লীগের সিদ্ধান্ত জানাতে সম্মত হলেন এবং ভাইসরয়ের যুক্তির কাছে কার্যত মিঃ জিন্না লণ্ডনে পাশ হওয়া পরিকল্পনা মানতে বাধ্য হলেন। সপ্তরথীর সঙ্গে ঘন্টা দুয়ের যুদ্ধে (নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনী, বলদেব, মিঃ জিন্না, লিয়াকত আলী ও আবদুর রব নিস্তার) বড়লাট জয়ী হয়েও পিতামহ ভীষ্মের অপেক্ষায় উন্মনা হয়ে আছেন; গান্ধীজী একা-ই এলেন বড়লাটের আমন্ত্রণে। কিন্তু তিনি কথা বলবেন না, এ দিনটিতে তিনি মৌন থাকবেন। অবশেষে তাঁকেও জয় করলেন ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন! অথচ মিঃ জিন্না অপেক্ষা অনেক বেশী শঙ্কিত ছিলেন ভাইসরয় গান্ধীজীকে নিয়ে, শুধু ভাইসরয় কেন—লণ্ডনের কর্মকর্তারা-ও। কেননা গান্ধীজী-ই পারেন সামগ্রিক প্রচেষ্টাকে ভণ্ডুল করে দিতে, তাঁদের এই ভয়ের পেছনে যুক্তিও অযৌক্তিক ছিলো না; মে মাসের শুরু থেকেই ক্যাবিনেট মিশনের (১৯৪৬) বক্তব্যকে সামনে রেখে তিনি অ-বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতার পৌনঃপুনিক উচ্চারণ করছিলেন। ভারত বিভাজনের ক্রিয়া-কর্ম যতো-ই এগিয়ে আসছে—সাম্প্রদায়িকতায় রক্ত ঝরিয়ে স্বাধীনতার শ্লোগানে তিনি অধিকতর ব্যথিত হয়েছেন।

তবে একথা অস্বীকার করা চলে না, ব্রিটেন এসময় তাঁকে নিয়ে যতোই চিন্তায় আচ্ছন্ন হোক—ভারতে গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভূমিকা ক্রমশ হারিয়ে যেতে চলছিলো ; তাঁর সম্মান ছিলো অথচ ছিলো না ভূমিকা পালনের কোনো পরিকল্পিত প্রচেষ্টা। তিনি নিজেও তা জানতেন বৈকি! তিনি আরও জানেন :

> কেউ তাঁর কথা শুনবে না। নেতারা নয়, সাধারণ মানুষও নয়। নেতাদের সম্বন্ধে বলেন, "The prospect of power has demoralized us" আর জনসাধারণ তো প্রতিশোধের জন্য উন্মাদ, যা 'sheer negation of humanity.' হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে পশুতে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুভয় ও প্রতিশোধস্পৃহা তার জন্য দায়ী। ব্রিটেনের কাছে তাঁর দাবী—১৬ই মে-র প্রস্তাব মানতেই হবে। "The government of free Indians formed under the constitution worked out by the constituent Assembly can do anything afterwards—keep India one or divide it into two or more parts." মাউন্টব্যাটেনের কাছে মে-র শেষ পর্যন্ত তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করছিলেন, জিন্নার কাছে আবেদন করছিলেন এক সঙ্গে ভারত ঘুরে সর্বনাশা ভ্রাতৃঘাত বন্ধ করতে।[৭৭]

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন, ভাইসরয় হিসেবে মাউন্টব্যাটেন ভারতে এসে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব দেখালেন তাঁর নিজের অফিস পরিচালনায়, গোটা অফিসটা-ই একটা মানবদেহের মতো পরস্পরের সঙ্গে কর্মক্ষমতার উৎকৃষ্ট পরিচয় রেখে সামগ্রিকভাবে ভাইসরয়ের অফিসকে জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল ও কর্মতৎপর

করে তোলে। লর্ড ইজমে, জর্জ এ্যাবেল, ক্যাম্বেল-জনসন প্রমুখ ভাইসরয়ের সাহায্যকারী ব্রিটিশ আমলা ব্যতীত ভারতীয় ভি. পি. মেনন-রা এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন। ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দেব মধ্যে নেহরু, প্যাটেল স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে নিজেদের প্রচেষ্টাকে দৃষ্টান্তের করে তোলেন, এই দুই কংগ্রেস নেতার দুই কন্যাও স্বাধীনতার মন্ত্রোচ্চারণে নিজ নিজ পিতাকে সাহায্যের জন্য তৎপর হন। নেহরু-কন্যা ইন্দিরার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবন এর দ্বারা অনেকখানি আলোকপ্রাপ্ত ছিলো, প্যাটেল-কন্যা মীরাবেন পরবর্তীতে সেভাবে নিজেকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসেননি। আশ্চর্যের হলো এই, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে এসে যে ক্ষিপ্রতায় সমাধানে পৌঁছাতে চেষ্টা কবেন সেখানে লেডী মাউন্টব্যাটেনেরও ভূমিকা থাকে। অনুরূপভাবে মিঃ জিন্নার সহোদরা মিস ফতেমা জিন্নাও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কায়েদ-ই-আজমকে একজন সর্বক্ষণের উপদেষ্টা হিসেবে সাহায্য করেন;পক্ষান্তরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জওহরলাল নেহরুর ভগিনী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের ত্যাগ ও অধ্যবসায় স্মরণযোগ্য।

৩রা জুন মঙ্গলবারে মাউন্টব্যাটেন নিজ সহকর্মীদের জানালেন, ২-রা জুনের মধ্যরাত্রিতে মিঃ জিন্না জানিয়েছেন যে ভারত বিভাজনের বিষয়টিকে তিনি মেনে নিয়েছেন, তবে তাঁর মতামত তিনি লিখিতভাবে দেননি। মিঃ জিন্না যে খুব সহজভাবে এই মতামত দিয়েছেন তা-ও নয়, তিনি মধ্যরাত্রেও গত দিনের মতো-ই দোহাই দেন মুসলিম লীগ কাউন্সিল বৈঠকের। কিন্তু ভাইসরয় তাঁকে জানান পূর্বের কথামতো ৩রা জুন সকালে কংগ্রেস ও শিখ নেতারা তাঁর সমর্থনে বিলম্ব দেখে তাঁরাও সমর্থনের বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেন ; আর তাহলেই সামগ্রিকভাবে এই পরিকল্পনাটি বানচালের উপক্রম হবে এবং ভাইসরয় হিসেবে কোনোপ্রকারেই এটা তিনি হতে দিতে পারেন না। মিঃ জিন্নাকে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেন :

> মাউন্টব্যাটেন বললেন—"শুনুন মিঃ জিন্না, একটা নিষ্পত্তি করবার জন্য এই যে এত চেষ্টা, পরিশ্রম ও কাজ এতদিন ধবে হলো, সেসব আপনার জন্য ব্যর্থ হয়ে যেতে দেব না। ব্যর্থ করবার সুযোগও আপনাকে দিতে ইচ্ছা করি না। আপনি যখন মুসলিম লীগের হয়ে কোন কথাই দিতে রাজি হচ্ছেন না, তখন আমি নিজেই মুসলিম লীগের পক্ষ নিয়ে কথা বলব। আমি এইবার ঘোষণা করব যে, আপনার কাছ থেকে আমি প্রতিশ্রুতি পেয়েছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এই কথা বলার ফলাফলের সব ঝুঁকি ও দায়িত্ব আমি নিজের উপরেই নিলাম। যদি লীগ কাউন্সিল আপনার ব্যক্তিগত সম্মতির কথা সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তবে আপনি সমস্ত দোষ আমার উপর চাপিয়ে আমাকেই এ ব্যাপারের জন্য দায়ী করতে পারবেন।"
>
> এরপর মাউন্টব্যাটেন বললেন—"কিন্তু আমার একটি সর্তে আপনাকে এখুনি রাজি হতে হবে মিঃ জিন্না। কাল নেতৃ-বৈঠকে আমি সকলের সমক্ষে এই কথা ঘোষণা করব যে, মিঃ জিন্না আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমি সেই প্রতিশ্রুতি মেনে নিয়েছি এবং প্রতিশ্রিুতি আমার ইচ্ছা ও কাজের পক্ষে সন্তোষজনক হয়েছে। আপনি আমার এই উক্তির কোনরকম প্রতিবাদ করতে পারবেন না। আমি এই উক্তি ক'রেই আপনার দিকে একবার তাকাব এবং আপনি সমর্থন জানাবার ভঙ্গীতে শুধু একবার ঘাড় নাড়বেন।"

এই প্রস্তাবেও মুখ খুলে কথা বলে কোন স্বীকৃতি জানালেন না জিন্না। মাউন্টব্যাটেনের সর্তের কথা শুনে নীরবে একবার শুধু ঘাড় নাড়লেন।

মাউন্টব্যাটেন এইবার তাঁর শেষ প্রশ্নটির উত্তর জিন্নার কাছে জানতে চাইলেন : "মিঃ জিন্না কি মনে করেন, এইবার এটলিকে আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, আগামীকালই যেন এটলি সরকারীভাবে প্রস্তাব ঘোষণা করেন?"

জিন্না উত্তরে বললেন—হ্যাঁ।[৭৮]

৩রা জুন (১৯৪৭) সকালে পূর্ব ঘোষিত নেতাদের বৈঠকে ভাইসরয় সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস, শিখ উভয়ের নেতারা ভারত বিভাজন এবং স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত দেন। মাউন্টব্যাটেন লীগের পক্ষে সম্মতির কথা উত্থাপন করলে মিঃ জিন্না অঙ্গীকার মতোই সম্মতির ভঙ্গীতে নীরবে ঘাড় নাড়েন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাইসরয় তাঁর পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সক্ষম হলেন, কিন্তু তিনি জানেন একবার বিতর্কের সূচনা হলে কোনো পক্ষ-ই সহনশীলতার বা যুক্তির পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন না, তাই তিনি কৌশলে সেগুলিকে এড়িয়ে যান। কাজকে ত্বরান্বিত করতে অপ্রত্যাশিতভাবেই তিনি উপস্থিত করেন 'দেশখণ্ডনে প্রশাসন ব্যবস্থার পরিণাম'[৭৯] নামক দলিলটি, যা নেতৃবৃন্দের ধারণার মধ্যেই ছিলো না—এতোটা দ্রুত এটা তৈরী হতে পারে! মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই এ পর্বের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই দলিলটি নেতৃবৃন্দকে বাদানুবাদে ঠেলে দিক এটা ভাইসরয়ের কাম্য ছিলো না বলে তিনি আলোচনার পর্বটি পাশ কাটিয়ে সবাইকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, বিভাগ কমিটির সিদ্ধান্তের সময় ভোটের গুরুত্ব বড় হয়ে দেখা দেবে না, বরং দৃষ্টি থাকবে যাতে 'প্রত্যেক ব্যবস্থা যেন সঙ্গত ব্যবস্থা হয়'।[৮০] প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে তিনি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর গুরুত্ব দিয়ে লীগকে অমূলক ভয় পাওয়া থেকে রেহাই দিতে চেয়েছেন ; বিতর্ককে এড়িয়ে যেতেও উদ্যোগী হলেন।

ক্যাম্বেল-জনসনের ধারণা বড়লাট চাইছেন দেশবিভাগের মতো মূল বিষয়টি যখন প্রত্যেকে মেনে নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছেন তখন আলোচনা এমন হওয়া দরকার যাতে নতুন কাজে প্রত্যেকেই উৎসাহ উদ্দীপনা লাভে সক্ষম হন। কিন্তু নেতৃবৃন্দের গত দিনের এবং আজকের সভা এবং এই সভাকে ঘিরে ভাইসরয়ের প্রচেষ্টা ও কৌশলকে সামনে রেখে—বিশেষত গত মধ্যরাত্রিতে মিঃ জিন্নার প্রতি ভাইসরয়ের বক্তব্য এবং অনমনীয় মনোভাবকে যাতে মিঃ জিন্না কিছুটা সময়ের জন্যও ভুলে গিয়ে শান্ত হন, এটা তার এক বিচক্ষণ পদ্ধতি ব্যতীত আর কিছু নয়। এরপরেই সিদ্ধান্ত হলো দুটি রাষ্ট্রের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী বিভাজনের মূল নীতি সৈনিকদের বাসভূমির ভৌগোলিক পরিচয় এক্ষেত্রে প্রধান একটি অবলম্বন হবে ; অর্থাৎ সৈন্যদের প্রত্যেকের জন্মভূমির স্থান যে রাষ্ট্রে পড়বে তিনি সেখানকার বাহিনীর জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হবেন।

এবারে শুরু ভারত বিভাগের বিজ্ঞপ্তি বা প্রচার পর্বের। 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'-তে ভাইসরয় শুধু যে তাঁর কৃতিত্বের আবরণ উন্মোচন করবেন তা-ই নয়, আভরণীয় সাক্ষীগোপাল হিসেবে কথা বলিয়ে নিতে চলেছেন কংগ্রেসের পক্ষে জওহরলাল নেহরু, লীগের তরফে মিঃ জিন্না এবং শিখ সম্প্রদায়ের নেতারূপে বলদেব সিং-কে দিয়ে। ভাইসরয় সংক্ষিপ্ত এবং বাহুল্যবর্জিত ভাষণ দিলেন, নিজের কৃতিত্বকে কোনো প্রকারেই উপস্থিতির চেষ্টা

করেননি ; ইতিহাসের এক প্রলম্বিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিতে নতুন দুটি রাষ্ট্রের স্থপতির আবেগহীন ঘোষণা। অতঃপর জওহরলাল নেহরু, মিঃ জিন্না, বলদেব সিং প্রত্যেকেই বক্তব্য রাখেন। নেহরু তাঁর বক্তব্যে দেশ ভাগের আর পাঞ্জাব, বাংলা ভাগের বেদনার্ত উপলব্ধি বক্তব্যে তুলে ধরেন, তাঁর আবেগ-মথিত বক্তব্য শ্রোতাদের মনকে আলোড়িত করার মতো, কিন্তু নিজের সার্থকতা বা ব্যর্থতা—কোনোটা-ই তিনি তুলে ধরেননি ; দল নয়—নেতৃত্ব নয়,—শিল্পী নেহরু আর তত্ত্বনিষ্ঠ বিদ্বান নেহরু এক হয়ে মিশে গেলো ইথারে। মিঃ জিন্নাও বক্তব্য রাখেন। কিন্তু তা যেন কেবলমাত্র নিয়মসর্বস্ব। তবে ভাইসরয় সম্পর্কে তাঁর উক্তি গোটা বক্তব্যকে বিশিষ্ট করে তোলে।

> আমি একথা অবশ্যই বলব যে, ভাইসরয়কে বহু বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়েছে, এবং তিনি সাহসের সঙ্গেই লড়েছেন। ভাইসরয়ের আচরণে আমার মনে এই ধারণাই হয়েছে যে, তিনি নিরপেক্ষতা রক্ষার এবং ন্যায়সঙ্গত বিচারের জন্য উচ্চতম বোধ ও নিষ্ঠা নিয়েই কাজ করেছেন। এখন তাঁর কাজকে একটু কম কঠিন ক'রে তোলাই আমাদের কাজ। যতদূর সাধ্য আমরা তাঁকে সাহায্য করব, যাতে তিনি ভারতের জনসাধারণের কাছে শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের বৃহৎ দায়িত্ব পালন করতে পারেন।[৮১]

বলদেব সিং তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিষয়টিকে টেনে আনেন, তাঁদের যে এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে তা-ও তিনি উল্লেখ করেন। অবশেষে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের এই প্রস্তাবটিকে একটি চূড়ান্ত 'নিষ্পত্তি' বলে উল্লেখ করেন। বক্তব্য শেষে নেহরুর মুখে উচ্চারিত হলো 'জয় হিন্দ', মিঃ জিন্না বললেন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'।

ভাইসরয়ের ঘোষণায় এলো ভারত ভাগ হচ্ছে, ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে আর বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হবে কিনা তা নিরূপণ করবে ঐ দুটো প্রদেশের আইনসভার সদস্যরা। পদ্ধতি হবে, দুটো প্রদেশের-ই আইনসভার সদস্যরা পৃথক হয়ে বসবেন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে (ধর্মীয় বলা চলে) স্বীকার করেই, অর্থাৎ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির সদস্যরা একটি অংশে বসবেন এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার সদস্যরাও আলাদা হয়ে বসবেন ; এবারে এভাবে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ হবে,—তাঁরা প্রদেশ ভাগের পক্ষে কী বিপক্ষে! কোনো প্রদেশের কোনো একটি অংশের সংখ্যাধিক সদস্য প্রদেশ ভাগ চাইলে বর্তমান ভারত সরকার তাই মেনে নেবেন। অর্থাৎ বাংলা আর পাঞ্জাব যে ভাগ হবে সে কথা পূর্বেই স্বীকার করে নেয়া হলেও সেই প্রদেশের আইনসভার সদস্যদের দ্বারা এই কর্মটি সমাধানের ব্যবস্থা হলো; মূলত লর্ড মাউন্টব্যাটেনের চাতুর্য এ ক্ষেত্রেও ঝিলিক দিয়ে যায়।

নীল রক্তের মাউন্টব্যাটেন বস্তুত মে মাসের শেষে লণ্ডন থেকে ফিরে এসে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর—ইংল্যাণ্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হলেন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁর এই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে অসহায় হয়ে ওঠেন, নেহরু-জিন্না উভয়েই আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। প্রাক্তন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার c.in.c জানতেন যে সৈনিকদের অলসভাবে থাকতে দিলে তাদের মধ্যে যেভাবে শৃঙ্খলা ও কর্মপ্রচেষ্টার অভাব ঘটে—পাশাপাশি দুঁদে রাজনীতিবিদ ও ব্যারিস্টারদের চিন্তার ফুরসুত দিলেই তারা ফ্যাঁচাং বাঁধিয়ে যে যার কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ; অতএব, তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা রূপায়ণে সর্বাপেক্ষা বেশী সহায়ক হবে বাস্তবভাবেই যতোটা দ্রুত সমস্যাগুলো নেতাদের সামনে উপস্থিত করা যাবে

এবং অবশ্যই সঙ্গে থাকবে তার সমাধানের সিদ্ধান্ত—পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রয়োগ করা-ই হবে সার্থকতার মূল চাবিকাঠি।

৪ঠা জুনে ভাইসরয় এ্যাসেম্বলী ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে বসে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেন। সাংবাদিকরা অবশ্যই বুঝলেন ভাইসরয় যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ১৫ই আগস্ট বলে জানিয়েছেন, হয়তো অবশ্যই তা পালিত হবে। এদিনেই তিনি গান্ধীজীর সাক্ষাৎ চেয়ে পাঠালেন যাতে তিনি প্রার্থনাসভার পূর্বে ভাইসরয় ভবনে আসতে পারেন। গান্ধীজী এলেন, মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীর নীতি ও আদর্শের উল্লেখ করে দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়টিকে সেখানে রেখে গান্ধীজীকে পক্ষে আনতে সক্ষম হলেন। মূলত, গান্ধীজীও বুঝলেন (যদিও মেনে নিতে যথেষ্ট দ্বিধা তাঁর) এর চেয়ে বেশী কিছু ভালো এই মুহূর্তে আশা করা সম্ভব নয়।

৩রা জুনের ঘোষণা বাংলার শরৎচন্দ্র বসুকে অধিকতর উৎকণ্ঠায় জড়িয়ে ধরে, তিনি দেখলেন এমন যে গান্ধীজী তিনিও যেন দেশ বিভাগ আর পাঞ্জাব-বাংলা বিভাগকে মেনে নিয়েছেন। ৯ই জুনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল বৈঠক হবে, পূর্বে মিঃ জিন্না পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় যা যা করেছেন সে ব্যতীত বর্তমানে মিঃ জিন্নাকে কতোখানি অধিকার ও ক্ষমতা দেয়া যায় সে বিষয়টি আলোচিত হয়ে সিদ্ধান্ত পৌঁছাবে এবং এই সভার বৃহত্তম অংশ জুড়ে থাকবে বাংলা ও পাঞ্জাবের ভবিষ্যৎ। শরৎচন্দ্র বসু এদিনে ব্যক্তিগত উদ্যোগে লোক মারফত মিঃ জিন্নার কাছে চিঠি পাঠালেন, এই চিঠির বক্তব্যে প্রাধান্য পায় :

> The request I am making to you is in accordance with the views you expressed to me when we met. But it seems to me that if you merely express your views to your members and not give them specific instructions as to how to vote, the situation cannot be saved. I hope you will do all in your power to enable Bengal to remain united and to make her a free and independent state[৮২]

৯ই জুনের লীগ কাউন্সিল সভায় যোগ দিতে পালাম বিমান বন্দরে আবুল হাশিম নোয়াখালির লীগ কর্মী ও নেতা আব্দুল জব্বার খদ্দরের কাছ থেকে যে আভাস পান তার বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত হলেন সম্মেলন কক্ষে প্রবেশের পূর্বেই। স্বাধীন বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার শিরোমণি স্বয়ং সোহরাওয়ার্দী সংক্ষেপে তাঁকে জানালেন, মূল প্রস্তাবের বিকল্প কোনো প্রস্তাব এখানে তোলা হবে 'এক ভয়ানক ব্যাপার'।[৮৩] মূল প্রস্তাব বলতে যে মিঃ জিন্না ও লিয়াকত আলী খানের প্রস্তাব একথা বোঝা গেলেও বিকল্প প্রস্তাব তুললে 'ভয়ানক' ব্যাপারটা যে কী এবং কতদূর তা কিন্তু খোলসা করে বলেননি সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু বিপক্ষে '১১টি ভোট' পড়লে সেকথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি যে ভাব এবং মিঃ জিন্নার প্রতি আনুগত্য দেখালেন সেখানেই বোঝা গেল গতকাল রাত্রে নিশ্চিত কিছু ঘটনা ঘটে গেছে—এটা তার ফলশ্রুতি মাত্র ; এবং স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ যে বিশবাও জলের তলে তা হাশিমের বোধগম্য হলো। মিঃ জিন্না তাঁর নিজস্ব ক্ষমতাবলে (যেহেতু তিনি লীগের সভাপতি) আবুল হাশিমকে কোনো বক্তব্য রাখতে দেননি, কেননা তা হলে হাশিমের বক্তব্য

খণ্ডনের জন্য তাঁকে 'দশজন প্রথম শ্রেণীর বক্তাকে দাঁড় করাতে হবে'। ঢাকা যে পাকিস্তানে থাকবে এখানেই তা নিশ্চিত হয়ে গেল, এখন শুধু নির্বাচিত আইনসভার প্রতিনিধিদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে এর কায়িক উপস্থিতিটা তুলে ধরতে বাকি। অবশ্য সে বিষযটাও চুকে-বুকে গেলো হট্টগোল ব্যতীতই ২০শে জুনে, বাংলাদেশটাকে দুটো অংশে ভাগ করার পক্ষে প্রতিনিধিরা সম্মতি জানালেন, আবির্ভাব ঘটলো সরকারীভাবেই পূর্ব বাংলার (ভবিষ্যতের পূর্ব পাকিস্তান) এবং পশ্চিম বাংলা প্রদেশের। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে (২০শে জুন, ১৯৪৭) লীগ প্রস্তাব পাশ করাতে সক্ষম হলো—বাংলা অবিভক্ত থাকলেই পাকিস্তান গণ-পরিষদে যোগ দেবে। কিন্তু পৃথক সভায় হিন্দুপ্রধান অঞ্চলের সদস্যগণ বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হলেন এবং হিন্দুপ্রধান অংশ ভাবতীয় গণ-পরিষদে যোগ দেবে এই সিদ্ধান্তও লিপিবদ্ধ হলো। অবশ্য শ্রীহট্ট জেলাকে পূর্ববাংলার সঙ্গে গ্রথিত করার বিষয়ে মুসলিম প্রধান অঞ্চল ভোটে জয়ী হয় (১০৭/৩৪) ; এই ভোটদান পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ (কমবেড জ্যোতি বসু, কমরেড রতনলাল ব্রাহ্মণ, কমরেড রূপনারায়ণ রায়) নিরপেক্ষ থাকেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটি আর কেন্দ্রীয লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মিলে সাম্প্রদায়িকতার করাতকলে বাংলাকে চেরাই করে, শরৎ-সোহরাওয়ার্দী হাশিম ব্যর্থ হলেন স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ গঠনে।

১৩ই জুনে বিভাগ কমিটির প্রথম সভাতেই ঠিক হলো দুজন সদস্য (১জন লীগ ও অন্যজন কংগ্রেস) নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হবে। এই স্টিয়ারিং কমিটিতে এলেন লীগের পক্ষে মিলিটারী ফাইন্যান্স বিভাগের অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের উপদেষ্টা মহম্মদ আলী এবং অন্যপক্ষ কংগ্রেস থেকে এসেছেন এইচ. এম. প্যাটেল যিনি বর্তমান মন্ত্রিসভার সেক্রেটারী ; তবে উভয়েই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসেব দুই কৃতি। কিন্তু খুব শীঘ্রই এই কমিটির নাম বদলে দেয়া হলো এবং এর সঙ্গে যুক্ত হলেন মিঃ জিন্নাও, নামটা নতুন করে হলো 'দেশবিভাগ পরিষদ'। মোদ্দা কথা হলো মাউন্টব্যাটেন যখন-ই প্রযোজন বোধ করেছেন কাজের সুবিধের জন্য কমিটি গঠন—তিনি কমিটি গঠন করেছেন। আর এই কমিটিগুলির বৃদ্ধি বা সংকোচন বা বিলুপ্তি ভাইসরয়ের ইচ্ছে অনুসারেই হয়েছে। ২৭শে জুনে 'দেশবিভাগ পরিষদে'র প্রথম বৈঠকে-ই সভাপতি মাউন্টব্যাটেনকে লীগের পক্ষ থেকে মিঃ জিন্না প্রস্তাব দিলেন—বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিবিল র‍্যাডক্লিফকে আমন্ত্রণের। নেহরু থেকে এই সভার সব সদস্যই মিঃ জিন্নার প্রস্তাবকে সমর্থন করায় মিঃ জিন্নার প্রস্তাব গৃহীত হলো। মিঃ জিন্না আরো বলেন, দুই সীমানা কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে র‍্যাডক্লিফের চেয়ারম্যান হিসেবে 'কাস্টিং ভোট' দেয়ার অধিকার দেয়া হোক, আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্যি, এই বিষয়টিও তর্কহীনভাবেই সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হলো। র‍্যাডক্লিফের সহযোগী হিসেবে দুই কমিশনে ৪ জন করে নির্বাচিত হবেন (কংগ্রেস ও লীগ উভযের ২ জন করে সদস্য), তবে অবশ্যই তাদের হাইকোর্টের বিচারপতি হতে হবে। ৩০শে জুনে 'দেশবিভাগ পরিষদ' সম্মত হলো সৈন্যবাহিনীকে অতি দ্রুত ভাগ করার ব্যবস্থা নিতে। বস্তুত, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এভাবেই পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে, এবং মুখ্য অংশ এতোদিনে চিহ্নিত হলো কার্যে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে। প্রসঙ্গত, একটি বিষয়ের অবতারণা এক্ষেত্রে প্রয়োজন

বোধ করছি, ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের (সিপাহী বিদ্রোহের) পরে ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ নিজেদের প্রতিষ্ঠার স্বার্থে যে সাম্প্রদায়িকতা বিকাশের ইন্ধন জুগিয়েছিলো তাকে লালন-পালনের মাধ্যমে পুষ্টিলাভে সাহায্য করেছিলো গত প্রায় একশত বছর ধরে তার ধারাবাহিকতা পরবর্তীতে বজায় থাকেলও ১৯৪৬-এর শুরু থেকেই নিজেদের স্বার্থে এই প্রক্রিয়া কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের পথে অগ্রসর হলো।

> স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেদের রণনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইংরেজরা ১৯৪৬-এ যে ভূমিকা নিলেন তা তাদের আগেকার সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোকে উৎসাহিত করার এবং জাতীয়তাবাদের ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রে বৈধতা অস্বীকার করার দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে একেবারে আলাদা। শাসন বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন ছিল এক দৃষ্টিভঙ্গির, আর সাম্রাজ্য ছেড়ে দেওয়ার পর সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে প্রয়োজন হল বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির।[৮৪]

১৯৪৭-এর জুন-জুলাইতে ভারতকে বিভক্ত করে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টা যখন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দ্রুততর হচ্ছিলো তখন ব্রিটিশের মনোনীত ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের অফিসে তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীদের মধ্যে লীগ বিরোধী এক মনোভাব বা মিঃ জিন্নার আচরণে এবং ঔদ্ধত্য ক্ষুব্ধ ইজমে-অ্যালেন-জনসন ক্যাম্বেলরা না পারছিলেন মিঃ জিন্নাকে প্রতিহত করতে, না পারছিলেন মিঃ জিন্নার প্রস্তাবগুলোকে পুনর্বিবেচনার জন্য বলতে। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস নিয়ে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করবে, ভারতের তরফে কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী ও নেহরু ভাইসরয়কে অনুরোধ জানালেন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসেবে—নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের, প্রথম দিকে ভাইসরয়েরও ধারণা ছিলো হয়তো লীগের তরফে মিঃ জিন্নাও অনুরূপ অনুরোধ তাঁকে জানাবেন। কিন্তু দীর্ঘ কালহরণের পরে মিঃ জিন্না জানালেন তিনি নিজেই পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্বভার সম্পর্কে সমাধানসূত্রে হয়তো পৌঁছানো সম্ভব হলো, কিন্তু একই গভর্ণর জেনারেলের অধীনে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুটি দেশ থাকলে ক্ষমতা ও সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত নানাবিধ জটিল সমস্যা যা ইতিপূর্বে সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি, তাকে সহজেই নিষ্পত্তিতে নেয়া সম্ভব হতো ; কিন্তু এখন ভাইসরয়কে অনেকগুলি বিষয় এড়িয়ে গিয়েই স্বাধীনতা প্রদান বিষয়টি তুলে ধরতে হবে। ইজমে ও অ্যাবেল বহুবার মিঃ জিন্নার সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও বাস্তবতার দিক বিচার করে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কিছুই হাতে ছিলো না, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর উত্থানে ব্রিটিশ নেতৃত্বের ইন্ধন আজ যে মিঃ জিন্নাকে কায়েদ-ই-আজমের সম্মানে ভূষিত করেছে। স্বয়ং মাউন্টব্যাটেনও এখন পরিস্থিতির শিকার মাত্র। তাই হলফ করে একথা বলা চলে ১৯৩৪-এ লিয়াকত আলীর অনুরোধে লণ্ডন ছেড়ে পুনরায় ভারতে এসে মিঃ জিন্নাকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, যদিও তিনি দেওয়ান চমনলালকে বলেছিলেন :

> Jinnah returned to India, to prove to himself that he was needed At first, he was reluctant : one evening, at the Willingdon Club, in Bombay, he said to Diwan Chaman Lall,

"Politics ! I am finished," Then–"But if you could only get six people like yourself to support me, I would come back"[৮৫]

কিন্তু এপ্রিলেই তাঁকে আমরা দেখি মুসলিম লীগের সভায়:

In April 1934 he was back in India, denying his own belief that there was 'no hope' of unity At a meeting of the Muslim League Council, in April, he said, "Nothing will give me greater happiness than to bring about complete co-operation and friendship between Hindus and Muslims." He returned to London, still caught up in the strange conflict between his old ideal and his reason. . The news, that he was needed by his own people, reached him within the untroubled comfort of a London hotel. In January 1935 he sailed for India once more, to attend the first session of the new Assembly[৮৬]

আমরা এভাবে দেখতে পাই ১৯৩৫-এর পরে ভারতের রাজনীতিতে ইসলামিক চিন্তা-ভাবনাকে স্বাতন্ত্র্য দিতে এবং মুসলমানদের জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি তিনি নিজেকে উপন্যাসের এক কাল্পনিক চরিত্রের মতো ইতিহাসে তুলে ধরেন ; সেখানে নিশ্চিতভাবেই পিছনে পড়ে থাকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অতীত ঐতিহ্য আর সংগ্রামমুখর আত্মবিসর্জনের আদর্শ।

অতীতের কয়েকটি বছরের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখবো ব্রিটেনের রাজনীতির শীর্ণ ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের মনোনীত ভারতের ভাইসরয়দের ভারত সম্পর্কিত আলোচনায় মিঃ জিন্না বরাবরই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থেকেছেন। স্বীকার্য, মিঃ জিন্না ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শেষ প্রহরে ঘটনার শিকার না হয়ে ঘটন-অঘটনের সৃষ্টিকর্তা, তাঁর উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ভারতের অন্যান্য সংগঠন থেকে শুরু করে ভাইসরয় মারফত ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে গেছে।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১-তে তাকে রদ করা এর কোনোটা-ই যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে করা হয়নি, অথচ ব্রিটিশ শাসকবর্গ মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থকে এর অন্যতম মুখ্য কারণ হিসেবে উপস্থিত করেছিলেন, তখন মুসলিম লীগ গঠিত না হলেও (১৯০৬-এ লীগ গঠিত হয়) ওই সম্প্রদায়ের নেতাদের প্রশাসকরা বোঝাতে সক্ষম হলেন হিন্দু-মুসলমান সহাবস্থানে মুসলমানদের স্বার্থ স্বাভাবিকভাবেই বিঘ্নিত হচ্ছে ; এবং ভবিষ্যৎ যে ব্যতিক্রমী হবে তা আশা করা দুরাশা মাত্র। ১৯২০-২১-এর খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্বের নয়া প্রচেষ্টা ১৯২৬-এ এসে পঙ্গু হয়ে পড়ে, এ বছরেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক বীভৎসতা ছড়িয়ে দেয় ; ধ্বংস আর মৃত্যু অবিশ্বাসকে মূলধন করে ছড়িয়ে পড়ে। কাজী নজরুল ইসলাম মানবিক মূল্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ নিয়ে সহাবস্থানের ভিত্তিতে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' ; এখানে তিনি হিন্দু আর মুসলমানকে এক-ই মায়ের সন্তানরূপে তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারত এবং ভারতের নেতৃবৃন্দ (অবশ্যই কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি) এক আপাত সংকল্প গ্রহণের দ্বিধায় জড়িয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর হলো। খোদ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভারতের

শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় একে একে ভাইসরয় নিয়োগ হয়েছেন এবং তাঁরা ভারতে এসে ব্রিটিশ স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে তৎপর হয়েছেন, যদিও এটা-ই তাঁদের পক্ষে ছিলো স্বাভাবিক ও নিয়মতান্ত্রিক।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীদের (১৯২৯ থেকে) সময়কাল ঃ

1929 : Ramsay MacDonald : Labour party

1937 : Neville Chamberlain . Conservative Party

1940 Winstan Churchill :

1945 : Clement Attlee : Labour Party

ভারতের জন্য ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ

1926 . Lord Irwin.

1931 Lord Willingdon.

1936 Lord Linlithgow

1943 · Lord Wavell

1947 · Lord Mountbatten.

লেবর পার্টি কর্তৃক লর্ড লিনলিথগো ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল হিসেবে নিয়োগপত্র পেলেও তিনি তাঁর কার্যকালের মুখ্য সময় অতিবাহিত করেন রক্ষণশীল দলের মনোনীত প্রধানমন্ত্রীর অধীনে, ভারত শাসনের এক সমঝোতার ওপরে নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে এ পর্যন্ত ব্যক্তিবিশেষ নয়, ব্রিটিশের গৃহীত নীতি অনুসারেই ভারত শাসিত হচ্ছিলো।

ভারতে নিযুক্ত দুজন ভাইসরয় এবং দুজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে আমরা এভাবে দেখতে পারি :

দুজন ভাইসরয়ের কার্যকাল

Lord Linlithgow 1936-1943 : Labour Party.

Lord Wavell · 1943-1947 : Conservative Party.

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম :

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Winstan Charchill

লর্ড ওয়াভেল এবং উচ্চপদস্থ আমলা ও ভাইসরয় অফিসের লর্ড ওয়াভেলের সাহায্যকারীদের নিয়োগ। অবশ্য লর্ড লিনলিথগো থেকেই রক্ষণশীল দল নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বিশেষত, ভাইসরয়ের সচিব ও সহকারীদের নিয়োগ করেন।

মিঃ জিন্নাব সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন, কেননা গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে নিয়ে ভারত বিষয়ক সচিব থেকে খোদ চার্চিল বিব্রত হন। ইতোপূর্বে রক্ষণশীল দলের সঙ্গে লর্ড লিনলিথগোর মাধ্যমে মিঃ জিন্নার যোগাযোগ সূচিত হয়, যার উন্নতি ঘটে চার্চিলের আমলে। কেননা ব্রিটিশদের কাছে 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' কার্যকরী করতে এটাই ছিলো সর্বোত্তম পন্থা।

প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মাউন্টব্যাটেনকে ১৯৪৩-এ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামরিক বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ (c.in.c) নিয়োগ করেন।

পরবর্তীতে যা হলো :
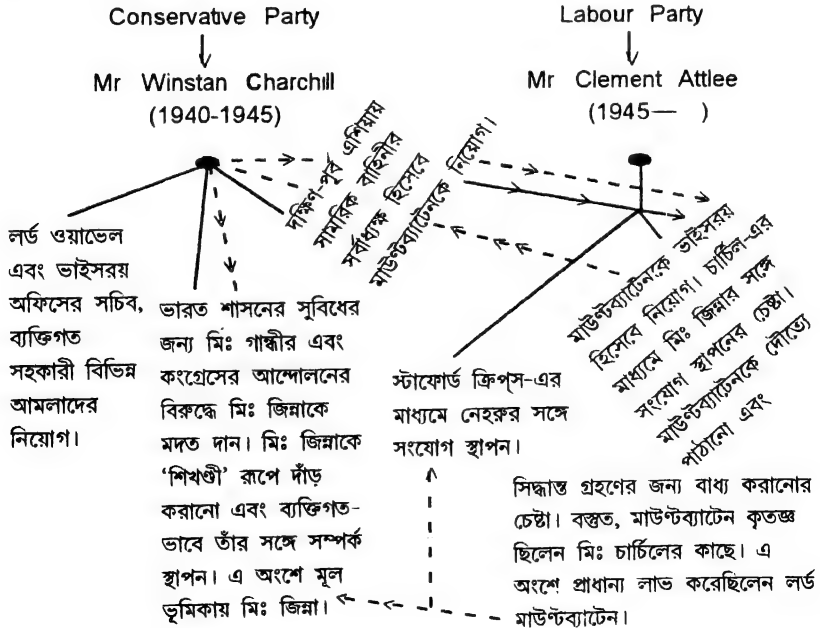
মিঃ চার্চিল ১৯৪৫-এ প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি হারালেও মাউন্টব্যাটেনের ওপর নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাব ধরে রাখতে সক্ষম ছিলেন। তাই ১৯৪৭-এ এসেও দেখি পরোক্ষভাবে তিনি মিঃ জিন্না ও মাউন্টব্যাটেন উভয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন, মিঃ জিন্নার টিউবারকোলোসিসে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি মাউন্টব্যাটেন জানতেন না, জানলে তিনি নাকি ভারত ভাগের (স্বাধীনতা প্রাপ্তির) সময়সীমা আরও পিছিয়ে দিতেন। সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'প্রতিদিন' পত্রিকায় শ্রী কমল ভট্টাচার্য দোমিনিক লাপিয়ের নতুন বই 'আ ফাউজেণ্ড সানস্' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শিরোনাম দিয়েছেন 'সাতচল্লিশের ভারত ভাগ নিয়ে আরও কিছু তথ্য', ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

> ইতিহাস পাল্টে যেত সেদিন তিনি আগে জানলে, সেই ঘটনা। অকপটে তাঁর এই স্বীকার। তাঁর কথায়, দুরারোগ্য যক্ষ্মায় মহম্মদ আলি জিন্না আক্রান্ত, এই দুঃসংবাদ আগে জানলে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, ভারত খণ্ডিত কিংবা এই চির বিচ্ছেদের কোন ঘটনাই ঘটত না। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের মোড় ঘোরানো এই ঐতিহাসিক স্বীকারোক্তি 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইটের' দোমিনিক লাপিয়ের এবং ল্যারি কলিন্সের কাছে। .... মাউন্টব্যাটেন রিপোর্ট পাড়ে বলতে থাকেন, ইতিহাসের গতিপথ ভিন্ন হয়ে যেত যদি জানতাম, জিন্না যক্ষ্মায় আক্রান্ত। ভারত-পাকিস্তান কখনও তৈরি হত না। এই ভূখণ্ডে ভারত থাকত ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ উপমহাদেশ। এড়ানো যেত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। হত না এই ভূখণ্ডে তিনটে যুদ্ধ।[৮৭]

মাউণ্ডব্যাটেন জানতেন না এটা এখন বিশ্বাস করা না করায় ঘটনার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না, তবে মিঃ জিন্না যে ফুসফুস সংক্রান্ত অসুখে ভুগছিলেন তা ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরেই ধরা পড়ে, এক পার্শী ডাক্তার তাঁর চিকিৎসাও করেন।[৮৮] অবশ্য সেপ্টেম্বরে মিঃ জিন্না প্রথম যে ডাক্তারকে দেখান তিনি একই সময় গান্ধীজীরও চিকিৎসক ছিলেন, তিনিও তাঁর '**Lungs**'-এর সমস্যার কথা উচ্চারণ করেছিলেন।[৮৯] অন্যত্র ডাঃ প্যাটেল আরো একধাপ এগিয়ে তাঁর অসুস্থতার কথা বলেছিলেন।[৯০]

বস্তুত, মিঃ জিন্না যে ভুগছিলেন তা যেমন সত্য তেমনিভাবে সত্য হলো তাঁর সামান্য পরিশ্রমে আরো কাহিল হয়ে পড়া। তিনি শৈলাবাসে গিয়ে '১৮ পাউণ্ড' ওজন বাড়ালেও সমতলে এলেই এবং সামান্য পরিশ্রমেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন। প্রকৃতপক্ষে তখনো টিউবারকোলোসিস বা যক্ষ্মার ওষুধ বাজারে আসেনি—তাই এ রোগটা ছিলো মৃত্যুর প্রতীক।[৯১] তবে এ মৃত্যু আসবে আক্রান্তকে নিশ্চিত জানিয়ে ধীরে ধীরে, তাই হয়তো ব্যক্তিগতভাবে মিঃ জিন্নার চরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে যা হেক্টর বলিথোর বক্তব্যে সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রশ্ন হলো লর্ড মাউন্টব্যাটেন জানতেন কি না? ভারত সচিব মিঃ জিন্নার সঙ্গে সিমলাতে যে ব্যবহার করেছিলেন এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা গ্রহণ করে যে দ্রুততার সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়টিকে এগিয়ে আনেন তাতে কি না জানার চেয়ে তাঁর জানার কথাটাই বেশী মনে হয় না? পাকিস্তান বাদীকে মেনে নিতে ব্রিটিশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মিঃ জিন্নার প্রতি উক্তি কি আমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে না। অন্যত্র, বড়লাট মে মাসের শেষে মিঃ জিন্নার জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে চার্চিলের যে চিঠি[৯২] বয়ে আনেন তার মধ্যে কী কোনো সঙ্কেত ছিলো মিঃ জিন্নাকে নির্দেশ বা অনুরোধের? বড়লাট ২রা জুন মধ্যরাত্রে শুধু কি ভয় দেখানোর জনোই

বলেছিলেন :

> সমর্থনের প্রস্তাব তাঁরাও (কংগ্রেস ও শিখ নেতারা) প্রত্যাখ্যান করবেন। এর ফল এই দাঁড়াবে যে, সারা দেশে অরাজক অবস্থা ও অশান্তি দেখা দেবে এবং সম্ভবত চিরকালের মতো আপনার পাকিস্তানকে আপনি হারাবেন।[১৩]

বড়লাটের এই হুমকির অর্থ কি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, অনেকে হয়তো বলবেন এর অন্য অর্থ করা হলো ইতিহাসের তথ্যকে বিকৃত করা বা যুক্তি কষ্টকল্পিত, কিন্তু মিঃ জিন্না যদি মাউন্টব্যাটেনের দাবী বা অনুরোধ মেনে না নেন—তাঁর জন্যে যদি কংগ্রেস পিছিয়ে যায় অর্থাৎ পূর্বের দেয়া সিদ্ধান্ত (ভারত বিভাজনের পক্ষে, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তি সহ) পুনর্বিবেচনার জন্য কালহরণ করে বা কোনো প্রকারে এই প্রস্তাব ভেঙ্গে গেলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না-ও গঠিত হতে পারে। কেননা মিঃ জিন্না হলেন লীগের মধ্যকার সেই ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি—যাঁর অবর্তমানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হবে কষ্টকর ; পরিকল্পনাটি যেভাবে গুটিয়ে আনা হয়েছে তা বরবাদ হলে নতুন কোনো পরিকল্পনার জন্য যে সময় তার মধ্যে ভারতীয় রাজনীতি ও খোদ লণ্ডনের চিন্তা-চেতনার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই তাই দামিনিকের দেয়া লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বক্তব্যকে স্বীকার না করে বলা যেতে পারে, ভারত বিভাজনের প্রশ্ন উঠলেই পরবর্তীতে তিনি বিচলিত বোধ করতেন। কেননা তিনি যা করেছেন তা জেনে-শুনেই করেছেন, পরোক্ষভাবে ব্রিটিশের নিয়ন্ত্রণকে বজায় রাখতেই—পরিকল্পিত পাকিস্তান-হিন্দুস্তানের মধ্যে অনৈক্যের বাতাবরণকে কাজে লাগিয়ে মূল উদ্দেশ্য হাশিল করতে হয়তো তিনি চেয়েছিলেন ; উইনস্টন চার্চিল এ সময়ে ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত ছিলেন না, ভারত বিভাজনের পরিকল্পনাতেই তিনি নিমরাজি হয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটা উল্লেখ করা প্রয়োজন, মিঃ জিন্না ৭ই আগস্টে হবু পাকিস্তানের হবু রাজধানী করাচীর উদ্দেশ্য হবু গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব নিতে পালাম বিমান বন্দরে 'As he stepped into the aircraft', একবার পিছনে ফিরে দিল্লীকে দেখলেন :

> . . he said, "I suppose this is the last time I'll be looking at Delhi." As the aircraft taxied out he said, "that's the end of that."[১৪]

কিন্তু করাচী পৌঁছে :

> Quaid-i-Azim arrived at Government House, and as he walked up the steps he made a statement that was remarkable he said to Lieutenant Ahsan, "Do you know, I never expected to see Pakistan in my lifetime We have to be very grateful to God for what we have achieved."

যাহোক, একথা সুস্পষ্ট যে, ১৯৪৭-এর অনেক পূর্ব থেকেই—অন্তত ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর থেকেই এই যক্ষ্মা রোগে ভুগছিলেন এবং তিনি যে রীতিমত ডাক্তার দেখাতেন তার প্রমাণও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো লর্ড মাউন্টব্যাটেন জানতেন কিনা?

প্রথম পর্যায় কারোর মনেই কোনো সন্দেহ বা মাথাব্যথা ছিলো না লর্ড মাউন্টব্যাটেন মিঃ জিন্নার এই অসুখের কথা জানতেন কিনা, কিন্তু মাউন্টব্যাটেন স্বদেশে ফিরে গিয়ে একাধিকবার বিষয়টি উত্থাপন করে সত্যিই কি নিজেকে এক চমক সৃষ্টির পুরুষ বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, অথবা কোনো অপরাধ বোধের শিকার হয়ে তিনি একাধিকবার অস্বীকার করেছেন—বলেছেন, তিনি জানতেন না মিঃ জিন্নার এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা। কিন্তু

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভারতে ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের পদে নিয়োগের পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতার কথা সেসময়ে বলা হয়েছিলো, তিনি ভারতে গিয়ে তাঁর নিজস্ব গুণাবলীর দ্বারা ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ব্যক্তিগতভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন, অনেক বিতর্ক হলেও ভাইসরয় পদে তাঁর নিয়োগ নিয়ে অ্যাটলি-চার্চিল কোনো মতভেদ হয়নি এবং ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় হিসেবে উভয়ে কাছ থেকে তিনি অযাচিতভাবে সাহায্য পেয়েছেন।

১৫-ই আগস্টের পরে ভাইসরয় হাতে আসা বাটোয়ারা সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যদিও তার পূর্বেই স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ নথিপত্র তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। ভাইসরয়ের তরফে ঘোষণা না হওয়ার মুখ্য কারণ ছিলো যে, স্বাধীনতা প্রদানের পরে এটি ঘোষিত হলে মিঃ জিন্নার আর বেঁকে বসার উপায় থাকবে না।[৯৬] পাঞ্জাব আর বাংলা যে অশান্ত হয়েই আছে, ১৯৪৮-এর জুন পর্যন্ত অপেক্ষা না করে অঘটন-ঘটন পারদর্শী মাউন্টব্যাটেন দায়িত্ব নেয়ার পাঁচ মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ণাহুতি দিলেন ; নিশ্চিত এর পরের ইতিহাসের জন্য তিনি নিজেকে দায়ী না করে দুটি স্বাধীন দেশের সরকারকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ ব্রিটিশের কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে দেয়া তো গেল, কিন্তু ঝোলার মধ্যে কী থাকলো সেটা মাউন্টব্যাটেনের বিবেচ্য বিষয় নয়।

তবু এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না, কেননা ইতিহাসে সেই গোপন নথির হদিস এখনো মেলেনি ; আর সাধ করে মাউন্টব্যাটেন তো পাঞ্জব-বাংলার রক্তস্রোত ও হাজার হাজার হত্যা-ধর্ষণের (আগস্ট থেকে পরবর্তী সময়ের) দায়িত্বভার নিজের কাঁধে টেনে নেয়ার আগ্রহ দেখাতে পারেন না যা নাকি তারই হঠকারিতামূলক তৎপরতার ফলশ্রুতি!

যাহোক, ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত-অতিদ্রুত এগিয়ে চলে। অশান্ত বাংলা আর পাঞ্জাবকে রেখে ৭ই আগস্টে দিল্লির পালাম ছাড়লেন মিঃ জিন্না, গন্তব্যস্থল করাচী। ইতিমধ্যে ছোট-বড়ো মিলিয়ে ভারতের প্রায় ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যের অনুগত্য আদায় করতে সক্ষম হলেন সর্দার প্যাটেল। ব্রিটিশ ভারতের শেষ সেনাপতি অকিনলেকের তত্ত্বাবধানে সৈন্যবাহিনীর বিভাজন কর্মটিও পাশাপাশি চলতে থাকে। ৯ই আগস্টে বড়লাটের অফিসে পাঞ্জাবের গভর্ণর জেংকিন্‌স খবর পাঠিয়েছেন—পাঞ্জাব গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন, শিখেরা শুনতে পেয়েছে র‍্যাডক্লিফ নাকি পাঞ্জাব বিভক্তিকরণে অস্ত্রোপচার না করে কসাই-এর ভূমিকা নিয়েছে ; অতএব, আরো সৈন্য চাই জেংকিন্‌স-এর—নয়তো পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে না।

১১ই আগস্টে করাচীতে পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যাদরে প্রথম সভা হলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঊষালগ্নে মিঃ জিন্না যেন ফিরে তাকালেন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনাপর্বের দিনগুলির দিকে, কায়েদ-ই-আজম ঘোষণা করলেন :

You are free , you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed–that has nothing to do with the fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one State ... Now, I think we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in course of time, Hindus would cease to be Hindus, and Muslims would cease

to be Muslims, not in the religious sense, because that is the personal faith of each individual, but in the political sense as citizens of the State.[৩৭]

১৪ই আগস্টে ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কায়েদ-ই-আজমের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং ১৪ তারিখ অপরাহ্ণতেই দিল্লির উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করেন। এই বিমানযাত্রায় ভাইসরয়ের সঙ্গী প্রেস অ্যাটাচী অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, পাঞ্জাবের আকাশ থেকে তিনি দেখেছেন দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে একের পর এক আগুনের লেলিহান শিখা, কোথাও বা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন—তিনি এর মধ্যে ভয়ঙ্কর এক অমঙ্গলের ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। কিন্তু ভাইসরয় কিছু দেখেছেন কিনা তা তিনি উল্লেখ করেননি।

দিল্লিতে ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেলের ভবন কর্মব্যস্ত। শুধু শতাব্দীর নয়, অনাগত কালের জন্য নতুন ইতিহাসের সূচনা হতে চলেছে, মাত্র কয়েক ঘন্টা পরেই ইউনিয়ন জ্যাকের পরিবর্তে ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হবে।

১৪ই আগস্টের দিন শেষে মধ্যরাত্রিতে গণ-পরিষদের সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আবেগমথিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন :

> Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity[৩৮]

অতঃপর মধ্যরাত্রিতেই মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পথেই আবেদন জানাতে যান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে। আয়েষা জালাল তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তিতে বলেন:

> The fact that power was transferred to two governments, neither of which knew the exact geographical boundaries of their respective states, adds yet another curious twist to Mountbatten's handling of the partition of India Certainly the Viceroy's tactic of postponing the award did nothing to prevent an eruption in the Punjab. Everything that was 'humanly possible', so we are told, was done to control the situation The Joint Boundary Force was reinforced by two more brigades,but the situation was 'long past mere military action and require [d] political leadership of a high order'

(Mountbatten's Report, No. 17. 16 August 1947, L/PO/433, I.O L.) If anything it was a complete failure of responsible political leadership which had brought anarchy to the Punjab. While Punjab writhed and turned under the impact of decisions taken in distant places, Mountbatten boldly claimed credit for having accomplished, in less than two and a half months, one of the 'greatest administrative operations in history'. (Mountbatten's address to the Indian Continent (Sic) Assembly at New Delhi, 15 August 1947, in Time Only to Look Forward, Speeches of Rear Admiral The Earl Mountbatten of Burma (London, 1949), p.64.) On behalf of the Hindus, Sikhs and Muslims who were slaughtered in their hundreds of thousands, and the refugees who in their millions stumbled fearfully across the frontiers of the two states, the historian has a duty to challenge Mountbatten's contention and ask whether this 'great operation' was not in fact an ignominious scuttle enabling the British to extricate themselves from the awkward responsibility of presiding over India's communal madness.[১১]

১৫ই আগস্টের সকাল সাড়ে আটটায় তিনি এলেন দরবার কক্ষে, শপথ নিলেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ডঃ কনিয়ার পৌরোহিত্যে ; এখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় নন—স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। অতঃপর তিনি যান কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠানে, সেখানে স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেলিত কয়েক লক্ষ অপেক্ষমান মানুষ। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অভিনন্দন বাণী একে একে পাঠ করেন ; উত্তোলিত হলো ভারতীয় জাতীয় পতাকা—জাতির স্বাধীনতা ঘোষণায় স্বগর্বে তোপধ্বনি হলো একত্রিশবার। কিন্তু গান্ধীজী কোথায়? —অমৃতসর অথবা লাহোর, অথবা পূর্ব আর পশ্চিম পাঞ্জাব—সমগ্র পাঞ্জাব, ঢাকা অথবা নোয়াখালি অথবা কলকাতা, অথবা পূর্ব আর পশ্চিম বাংলা—কেমন আছে স্বাধীনতার এই ঊষার আলোয়!

এই তো সেদিন স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে অভিনীত হলো ফেলে আসা ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট দিন শেষের মধ্যরাত্রির গণ-পরিষদ ভবনের অত্যুজ্জ্বল কাহিনী। আমরা কেউ কেউ সমবেত কণ্ঠে গেয়েছি 'জনগণমন অধিনায়ক ...', হয়তো সে দিনের প্রধান প্রধান পাত্র-পাত্রীরা—কুশীলবেরা আজ আর বেঁচে-বর্তে নেই, তবু প্রশ্ন একটা, আজ ভারতের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারসী, তফসিলী, তফসিলী উপজাতি—আমরা ভালো আছি তো!

১. H V. Hodson : The Great Divide : Hutchinson of London · P-171-72.
২. H.V Hodons : Ibid . P-175.
৩. Hector Bolitho : Jinnah · P-168-69.
৪. H V. Hodson : Ibid P-175-76.
৫. ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ; ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস : পৃঃ ২২৮
(তিনি অংশটি গ্রহণ করেছেন Gwyer, II, P-606 থেকে)
৬. সুমিত সরকার : আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭) : পৃঃ ৪৪২
৭. V. P Menon . The Transfer of Power in India : Orient Longmans : 1957 . P-338.
৮. Leonard Mosley : The Last Days of the British Raj Jaico Books (Indias own pocket Edtions) : 1966 P. 46-47
৯. V.P Menon : Ibid . P-342
১০. Khalid B. Sayeed. Pakistan · 1968 · P-217.
১১. Ibid : P-218 : Quoted by 'Dawn' · Karachi, 22 October 1949 .
১২. সুমিত সরকার : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৪৩
১৩. C H Philips : India . Hutchinsons University Library, London · P-145.
১৪. V.P Menon : Ibid : P-343
১৫. Kanji Dwarkadas : Ten Years to Freedom Popular Prakashan Bombay . 1968 · P-190-91
১৬. মুহাম্মদ আসাদ : ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূল নীতি : শাহেদ আলী অনূদিত : ইসলামিক ফাউন্ডেশন : বাংলাদেশ :
১৭. C. H. Philips : Ibid . P-142
১৮. ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত : পৃঃ ২৯১
১৯. ই. এম. এস নাম্বুদিরিপাদ : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রমের ইতিহাস . প্রাগুক্ত পৃঃ ৮১৩
২০. ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : প্রাগুক্ত : পৃঃ ২৭৪
২১. আবুল হাশিম : আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি : ঢাকা : পৃঃ ১২৫—২৬।
২২. অমলেশ ত্রিপাঠী : স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস : প্রাগুক্ত . পৃঃ ৪৫৭
২৩. Leonard Mosley : ibd . P-54.
২৪. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ : ভারত স্বাধীন হল . প্রাগুক্ত · পৃঃ ১৭৭
২৫. V.P. Menon . Ibid · P-350.
২৬. Leonard Mosley : Ibid : P-96.
২৭. এ. কে এম. রফিকউল্লাহ্ চৌধুরী : ভারত বিভক্তি ও বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ : চট্টগ্রাম—ঢাকা : পৃঃ ২৫
২৮. Kamala Sarkar : Bengal Politics 1937-1947 . P-204 Quoted in Azad · March, 1947.
২৯. অমলেন্দু দে : স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা : প্রয়াস ও পরিণতি : রত্না প্রকাশন : কলকাতা : পৃঃ ৫
৩০. সিরাজউদ্দীন আহমেদ : হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী : ভাস্কর প্রকাশনী : ঢাকা : পৃঃ ১২৩

৩১. প্রাগুক্ত : পৃঃ ১২৩
৩২. প্রাগুক্ত : পৃঃ ১২৪—২৫
৩৩. Sailesh Kumar Bandopadhaya : Quaid-I-Azam Mohammad Ali Jinnah and the creation of Pakistan . Sterling Publishers Private Limited : 1991 : p. 280
৩৪. Kamala Sarkar Ibid P.- 267
৩৫. সিরাজউদ্দীন আহমেদ : প্রাগুক্ত : পৃঃ ১২৩
৩৬. অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত : পৃ ২২
৩৭. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৮
৩৮. প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৯। শ্রী দে গ্রহণ করেছেন, 'Statement by Suhrawardy, in Statesman, Tuesday, 26th April 1947, P. 5 থেকে।
৩৯. আবুল হাশিম : প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৪৪
৪০. প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৪৫
৪১. প্রাগুক্ত : পৃঃ ১৪৬
৪২. Larry Collins and Deomnique Lapierre : Freedom at Midnight : First Bell Books edition-1978 (Vikas Publishing House Pvt. Ltd.) P-62.
৪৩. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৬২
৪৪. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৬৪
৪৫. Kanji Dwarkadas . Ibid P-196
৪৬. Ibid P-216.
৪৭. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৬৫
৪৮. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৬৫
৪৯. Dr Sachin Sen : The Birth of Pakistan : Calcutta P-168.
৫০. Philip Zilgler : Mountbatten - The officila Biography : Collins (London, 1985), PP 373-74, Also please see T P ; Vol. X ; P 192. Ouoted by Sailesh Kumar Bandopadyaya Ibid : P-318
৫১. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৬৫-৬৬
৫২. Dr Sachin Sen : Ibid P-169.
৫৩. অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৪
৫৪. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুপ্ত : পৃঃ ৪৬৭
৫৫. অমলেশ ত্রিপাঠী 'দ্য স্টেট্সম্যান' (৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৭) পত্রিকা থেকে মূলকে গ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্রন্থের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।
৫৬. অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৫
৫৭. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৩৭—৩৮
৫৮. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৫৭
৫৯. The Stateman, 8 May, 1947 . P-8 : অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৫৯
৬০. The Nation, 30 January, 1949; P-8 অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪২—৪৩
৬১. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৩—৪৪
৬২. Minutes of Veceroys Staff Meetings . Twenty-Second Meeting April 25, 1947 [Item 7, Proposals for a meeting with Indian Leaders (VCP 33)] : Larry Collins & Dominique Lapierre Mountbatten and the Partition of India Tarang Paperbacks

৬৩. Viceroy's Personal Reports, Reports No 5, May 1, 1947, Larry Collines & Dominique Lapierre, Mountbatten and The Partition of India Ibid P-141
৬৪. অমলেন্দু দে . প্রাগুক্ত . পৃঃ ৮২
৬৫. প্রাগুক্ত . পৃঃ ৮৩
৬৬. V P Menon · Ibid P-354
৬৭. Ibid. , P-355
৬৮ ভারত সচিবকে ভাইসরয় : ১১ই মে ১৯৪৭, ম্যানসারগ ইত্যাদি (সং) ট্রানসফার অব পাওয়ার, ১০ খণ্ড, পৃঃ ৪০২ · মুর : এসকেপ ফ্রম এম্পায়ার পৃঃ ২৭৫—৭৬ অমলেশ ত্রিপাঠী প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৭৯
৬৯. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৭৯—৮০
৭০. V. P Menon Ibid . P-365
৭১. Ibid P-366
৭২. অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন : ভারতে মাউন্টব্যাটেন-এর বাংলা অনুবাদ · পৃঃ ৫২
৭৩. প্রাগুক্ত · পৃঃ ৫৪
৭৪. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৪৮৭
৭৫ অ্যালান ক্যাম্বেল জনসন : প্রাগুক্ত · পৃঃ ৫৬
৭৬. Hector Bolitho Ibid P-184
৭৭. অমলেশ ত্রিপাঠী : প্রাগুক্ত · পৃঃ ৪৮৯
৭৮. অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন : প্রগুক্ত : পৃঃ ৬৬
৭৯ প্রাগুক্ত : পৃঃ ৬৮
৮০. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৬৯
৮১ প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪
৮২ Sarat Boses Letter to Jinnah In the Nation, Monday, 13 September, 1948 · P-1 : এই অংশটি গৃহীত হয়েছে অমলেন্দু দে . প্রাগুক্ত · পৃঃ ৯৪ থেকে।
৮৩ আবুল হাশিম : প্রাগুক্ত · পৃঃ ১৬২
৮৪. বিপান চন্দ্র · ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭—১৯৪৭ : কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী · প্রথম অনুবাদ সংস্করণ ১৯৯৪ : পৃঃ ৪২৩
৮৫. Hector Bolitho Ibid · P-106
৮৬. Ibid P-109
৮৭. কমল ভট্টাচার্য : সংবাদ প্রতিদিন : ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ : পৃঃ ৪
৮৮. Hector Bolitho · Ibid P-148
৮৯. Ibid P-147.
৯০. Ibid : P-161
৯১. যক্ষ্মা রোগের ওষুধ বাজরে আসে ১৯৪৯-এর মধ্যবর্তী সময়ে, তার পূর্বে সাধারণত এই বোগ থেকে রক্ষা পেতে ডাক্তাররা হাওয়া পরবর্তন করে স্বাস্থ্যকর স্থানে যেতে উপদেশ দিতেন। পাশাপাশি ডাক্তারের উপদেশ থাকতো পূর্ণ বিশ্রামের ও প্রোটিনযুক্ত খাবারের। রোগীর শরীরের বোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করতো তার বেঁচে থাকার সময়কাল।
৯২. অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন : প্রাগুক্ত : পৃঃ ৫৬
৯৩. প্রাগুক্ত : পৃঃ ৬৬
৯৪. Hector Bolitho Ibid P-194

৯৫. Ibid . P-195

৯৬. অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন বলেছেন, স্যার র‍্যাডক্লিফ পাঞ্জাব ও বাংলোর বিভাজনের সব কগজপত্র তৈরী করলেও কেবলমাত্র সিলেটের বিষয়টি সম্পূর্ণ না হওয়ায় মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীনতা প্রদানের পরেই র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত জানাতে হয়। বস্তুত মিঃ জিন্নার প্রতি এই সময়ে ভাইসরয় বিশ্বাস হারিয়ে বসেন।

৯৭. Hector Bolitho : Ibid · P-197.

৯৮. V P Menon : Ibid : P-413.

৯৯. Ayesha Jalal . The Sole Spokesman · Cambridge University Press · P 293.

নির্ঘন্ট

---o---